ইউরোপা
খুঁজে
ফেরে
ড. জয়দেব মুখোপাধ্যায়

ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে

ড. জয়দেব মুখোপাধ্যায়

ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশ
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
শুভ ১লা বৈশাখ, ১৩৯৬
১৪ই এপ্রিল, ১৯৮৯

পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
জানুয়ারী—২০১৩

প্রচ্ছদ ঃ বিন্দুভূষণ পাল

লেজার সেটিং ঃ
মাইতি ডিটিপি
৫১বি, ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর ঃ
প্রীন্ট পাব
১৩ পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ISBN-978-81-922452-4-9

মূল্য ঃ ২০০ টাকা

উৎসর্গ

অগ্রজ সমতুল্য পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী জয়ন্তী পট্টনায়ক এম. পি. (ওড়িষার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজানকী বল্লভ পট্টনায়কের সহধর্মিনী এবং সবর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী)-র বিস্ময় উদ্রেককারী কর্মপ্রতিভা এবং নীতি-নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে এই গ্রন্থ তাঁরই উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।

সংশয়

বিরাট এই বিশ্বসংসারে যে অভাগারা কেবল সৃষ্টি রহস্যের নানাদিক দিয়ে অনুসন্ধানেই মত্ত হয়ে রইল সারা জীবন, নিজেদের স্বার্থ-সুখ-সম্ভোগের দিকে তাকালো না, ঘর-বাঁধার স্বপ্নে বিভোর হ'ল না, তাদেরকে মানুষ 'বাউণ্ডুলে, ছন্নছাড়া' আর কি বলেই বা ডাকবে। বড়জোর ডাকবে একটিমাত্র শব্দের সংক্ষিপ্ত প্রয়োগে—'ক্ষ্যাপা' বলে। এতে ক্ষ্যাপার কিন্তু আসে যায় না কিছুই।

মহানন্দে এই ক্ষ্যাপারা যুগে যুগে খুঁজে ফিরছে—অজানা রহস্যের দুর্ভেদ্য জালকে ছিন্নভিন্ন করার দুরন্ত আবেগ বুকে নিয়ে।

খোঁজারও যেমন শেষ হয়না তাদের, ক্ষ্যাপা নামটাও ঘোচে না তাদের তেমনি কোনদিন।

তবু, এই অনুসন্ধানের পথের বাঁকে, যদি কখনও কানে ভেসে আসে একটু সহানুভূতির কথা, সামান্য সমবেদনার আভাস, ধন্য হয় ক্ষ্যাপার হৃদয়। অনন্য বলে তখন নিজেকে ভেবে নিয়ে, পরমাহ্লাদে ডগমগ হয়ে ওঠে ক্ষ্যাপার মন।

সেই ক্ষ্যাপাদেরই একজনার 'খুঁজে ফেরার' কাহিনী লিখতে বসেছে এই অধম তার অক্ষম লেখনী দিয়ে।

চিরনিন্দিত, অবহেলিত, সৃষ্টি ছাড়া ক্ষ্যাপার হৃদয়ের কথা ঠিক মত প্রকাশ করা সম্ভব হবে কি তার পক্ষে?

পুরী (ওড়িষা) লেখক
১৯৮৭

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে কিছু কথা

ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় একজন উদার চরিত্রের সাধক মানুষ ছিলেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ ও বিস্ময়কর গবেষণামূলক রচনাগুলো পাঠক সমাজকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করে। বহুদিন থেকে আমার প্রিয় পাঠকদের আগ্রহের কথা মাথায় রেখে আমি তাঁর বহু চিত্তাকর্ষক লেখাগুলো নানা পত্র-পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে পুস্তকাকারে আমার ও তাঁর প্রিয় পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার। তিনি যখন জীবিত ছিলেন তখনই বার বার আমাকে এই অনুরোধ করতেন তাঁর মূল্যবান লেখাগুলো নিয়ে একটি রচনা সমগ্র তৈরী করতে। নানান পারিপার্শিক অসুবিধের জন্য তখন আমি তা করে উঠতে পারিনি। সময়াভাব তার প্রধান অন্তরায় ছিল। কিন্তু এতদিন পরেও তাঁর পাঠকদের আগ্রহ ও প্রবল অনুরোধ আর উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। এর জন্য আমিও মানসিক ভাবে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলাম। তাই জয়দেববাবুর ও তাঁর প্রিয় পাঠকদের কথা মাথায় রেখে পুনরায় একাজে ব্রতী হলাম। বর্তমানে তাঁর যত মূল্যবান লেখা রয়েছে তা সংগ্রহ করার কাজ শুরু হয়ে গেছে। ইতি মধ্যে তাঁর বেশ কিছু মূল্যবান লেখা আমার হাতে এসে গেছে। তবুও আমি তাঁর প্রিয় পাঠকদের কাছে অনুরোধ করছি বর্তমান খণ্ডগুলোতে প্রকাশিত রচনাগুলো বাদে অন্য নতুন কোন রচনা যদি তাঁদের সংগ্রহে থেকে থাকে তাঁরা সেই রচনা গুলোর জেরক্স কপি আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন তাহলে পরবর্তী খণ্ডে সেগুলো সংযোজিত করা হবে। বর্তমানে বই প্রকাশ করতে বহু খরচ পড়ে যাচ্ছে। তাই যদি পাঠক সাধারণ সরকারী ও বেসরকারী গ্রন্থগারের কর্তৃপক্ষ তাদের গ্রন্থাগারের জন্য এই মূল্যবান বইগুলো সংগ্রহ করেন তাহলে আমি সব দিক দিয়ে উপকৃত হব। এবং পরবর্তী খণ্ডগুলো যথা সময়ে প্রকাশ করতে পারব। 'ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে' তাঁরই দেওয়া নাম। সেই কারণে তাঁর দেওয়া নামটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাঁর রচনা সম্ভার নিয়ে ১ম খণ্ড প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাকী খণ্ডগুলোর কাজও শুরু হয়ে গেল।

'ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে বইটি প্রথম সংস্করণ ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে সব মুদ্রিত বইগুলো নিঃসেশিত হয়ে যায়, পরে অন্যান্য বই প্রকাশ করতে গিয়ে আর এই বইটির প্রতি নজর দেওয়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু পাঠক মহল থেকে বার বার জোরাল তাগাদা আশায় প্রকাশক হিসাবে আমি আর স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না, অনেক ঝুঁকি নিয়ে এই কাজে পুনরায় ব্রতী হলাম। তাঁর লেখা সেই বিখ্যাত গবেষণা মূলক রচনা 'কাঁহা গেলে তোমা পাই'। এর দ্বিতীয় খণ্ড লেখা শেষ করার আগেই নির্মম-নিষ্ঠুর নিয়তি তাঁর এই মূল্যবান জীবন কেড়ে নিল। কতিপয় হিংস্র মানব-দানব। যারা সত্যকে ভয় পায় তারা তাঁকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল। আর প্রিয় পাঠকরা হারালো একজন গুণিব্যক্তিকে।

দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে কাঁহা গেলে তোমা পাই, বাসুকীর সন্ধানে, সঙ্গম, হিন্দু মরি সাসের চোখে কেন বিন্দু বিন্দু জল।

এই বই-এর কাজে সহযোগিতা করার জন্য ঝাড়গ্রাম বার্তার সম্পাদকের কাছে আমি গভীর ভাবে ঋণী। তাঁদের সহযোহিতা ছাড়া একাজ কিছুতেই শুরু করা সম্ভব হত না। এর জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

কলকাতা
২০১২

প্রকাশক

প্রকাশকের কথা

পরম করুনাময়ের অপরিসীম কৃপায় "ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে" প্রকাশ করতে সক্ষম হলাম শেষ পর্যন্ত অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে। জয়দেববাবু সাধক ও উদার চরিত্রের মানুষ। তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাগুলি পাঠকদের কৌতূহল নিবারণের জন্য প্রকাশ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর্ধান রহস্যের উপর তাঁর গবেষণা মূলক গ্রন্থ "**কাঁহা গেলে তোমা পাই**" প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৮ সালে একটি মফঃস্বলে (ঝাড়গ্রাম) প্রকাশনী থেকে। শ্রীচৈতন্যদেবের দেহাবসানের রহস্য ভেদের এত বড় প্রয়াস এর আগে আর কোন গ্রন্থে হয়নি কোন ভাষায়। গ্রন্থটি প্রথম যখন হাতে এলো বড়ো স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এত বড় একটি কঠিন ঐতিহাসিক বিষয় এমন হৃদয়গ্রাহী ভাবে লেখা কি সম্ভব? মনে হলো একটি রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা উপন্যাস পড়লাম। যেমন ভাষা তেমনি অন্তস্পর্শী অভিব্যক্তি। ১৯৭৮ সালে "কাঁহা গেলে তোমা পাই" প্রকাশিত হওয়ার পর এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে আরও কিছু বই রচিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যুরহস্য সম্বন্ধে। কিন্তু সেগুলির কোনটাই "**কাঁহা গেলে তোমা পাই**" হয়ে উঠতে পারেনি।

প্রয়াত কথা সাহিত্যিক সমরেশ বসু, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী ডঃ শান্তি কুমার দাশগুপ্ত, দিনের পরদিন জয়দেব বাবুর কাছে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছেন শ্রীমহাপ্রভুর জীবনের ঘটনাগুলি নিয়ে, তারপর তাঁরা তাঁদের গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন শ্রীচৈতন্যের উপর।

এখন দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্তির পথে। বাঙ্গলা এবং ওড়িষার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেশ কিছু প্রাচীন তাল পাতার পুঁথি সংগ্রহ করেছেন জয়দেববাবু। সবগুলি পুঁথিই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রায় সমসাময়িক। এই পুঁথিগুলি থেকেই, রচিত হচ্ছে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধ্যানের চিত্রটি। অনেক প্রমাণ ও তথ্য উপস্থিত করেছেন জয়দেববাবু "**কাঁহা গেলে তোমা পাই**" এর দ্বিতীয় খণ্ডে।

এরই মধ্যে জয়দেববাবুর রচিত আরও কয়েকটি গ্রন্থ হাতে পেলাম। প্রতিটি গ্রন্থই যেন চুম্বক, পাঠককে আকর্ষণ করে পাগল করে রাখে যতক্ষণ না পড়া শেষ হয়। কত কঠিন গবেষণা লব্ধ সব বিষয়, কিন্তু লিখেছেন এমন অনুকরণীয় শৈলীতে যা এক অসাধারণ গবেষণা গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। বাংলা কথাসাহিত্যে এমন অতুলনীয় গ্রন্থ পূর্বে আর প্রকাশিত হয়নি। এমন রত্নগর্ভ বিষয়গুলি পাঠক- সাধারণের গোচরে

আসুক,—এই বাসনা নিয়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট লোক পাঠিয়ে, অনেক উপরোধ অনুরোধ জানিয়ে "ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে" এর প্রকাশের দায়িত্ব আমি স্বেচ্ছায় ও স্বাগ্রহে গ্রহণ করেছি।

বর্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের "সেক্স আর ক্রাইম" সর্ব্বস্ব বদ্ধ অচলায়তনে এক ঝলক নতুন বিশুদ্ধ বাতাস প্রবেশের পথ করে দিলাম আমি এই গ্রন্থের মাধ্যমে। মনে হয় এই জীবন সম্পদবাহী নির্মল বাতাস বিপ্লব ঘটাতে পারে আগামী দিনের সাহিত্য স্রষ্টাদের মনোজগতে।

কলকাতা
১৯৮৯

সুরেশ দাশ

তন্ত্রের শিকড় সন্ধানে

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ, শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ সংস্কৃত প্রজ্ঞা মহাবিহারের কুলপতি, বিশ্বহিন্দু পরিষদের সভাপতি আচার্য ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী এম-এ, পি-এইচ, ডি, শাস্ত্রী, বাচস্পতি,

প্রজ্ঞাভারতী মহোদয়ের—

শুভাশংসন

ওঁ

বিশাল-বিশ্বস্য বিধানবীজম্
বরং বরেণ্যং বিধিবিষ্ণু-শর্বৈঃ।
বসুন্ধরা-বারি-বিমান-বহ্নি—
বায়ুস্বরূপং প্রণবং বিবন্দে।।
ওঙ্কারনাথদেবায় গুরবে পরমাত্মনে।
সীতারামস্বরূপায় নামপ্রেমাত্মনে নমঃ।।

ভারতীয় সংস্কৃতির দুটি ধারা—বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিক উৎসানুসন্ধানে বেদের মতো তন্ত্রেরও অনুসরণ সমুচিত। গুরুগম্য এই গুহ্য বিদ্যা নানা ঐতিহাসিক কারণে লোকলোচনের অন্তরালে থাকলেও ফল্গুধারার ন্যায় আমাদের জীবনে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কৌল আচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, তদীয় শিষ্য স্যার জন উড্রফ, প্রমুখ মনীষীর সাধনায় তন্ত্রতত্ত্ব আজ জনপ্রিয় বিষয়। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, পরম রাধ্য শ্রীমৎ সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব, ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এবং আরো বহু মনীষী তন্ত্রসাধনার অন্তর্নিহিত মাধুর্য নানা রচনায় পরিবেশন করেছেন।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন, তত্ত্বজ্ঞ ও তথ্যনিষ্ঠ পণ্ডিত, মাতা আনন্দময়ীর মানস-পুত্র ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় সরস ভঙ্গীতে কাহিনীর মাধ্যমে তন্ত্রের শিকড়ের সন্ধান করছেন। তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধের মতোই এই প্রবন্ধও জ্ঞানের গবেষণা হলেও মাধুর্যের চমৎকারিত্বে মানস ভোজ্যের হৃদ্যতায় ঋদ্ধ মনে পড়ে বাঙ্গালী নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির রচনাটি—

"কাব্যেহপি কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে
তর্কেহপি কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে।
তন্ত্রেহপি যন্ত্রিতধিয়ো বয়মেব নান্যে
কৃষ্ণেহপি সংযতধিয়ো বয়মেব নান্যে।।"

সুপণ্ডিত মনীষী মুক্তমনা সাধক সারস্বতপ্রবর ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের এই প্রবন্ধটি সেই কথাকেই সার্থক করে তুলেছে। এই সংক্ষিপ্ত, সরস অথচ তত্ত্বালোকিত প্রবন্ধ পড়ে সহৃদয় পাঠকবৃন্দ।

"আনন্দে করুন পান সুধা নিরবধি।"

১৩৯৬ বঙ্গাব্দ — ইতি—
১লা বৈশাখ — মন্ত্রতন্ত্রমুগ্ধ
ঋষিধাম— — **শ্রীধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী**
পোঃ—দত্তপুকুর, জে—উত্তর ২৪ পরগণা

দারুব্রহ্ম রহস্য

ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় লিখিত দারুব্রহ্ম রহস্য নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। উপন্যাসের অভিনব আঙ্গিকে লেখা এই প্রবন্ধে লেখক দারুব্রহ্ম বা পুরীর জগন্নাথ দেবের রহস্য উদঘাটনে প্রয়াসী হইয়াছেন।

এই প্রয়াসে বিভিন্ন বিদেশী পরিব্রাজকের ভ্রমণ কাহিনী বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণামূলক রচনা, অথর্ববেদ, ঋগ্বেদ, স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মসংহিতা, কপিলসংহিতা, নারদপুরাণ, উৎকল খণ্ড প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ বিষয়ে লেখকের যে গভীর জ্ঞান এই প্রবন্ধে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

লেখক তাঁহার গবেষণা লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে দেখাইয়াছেন যে, বর্তমানের জগন্নাথের ত্রয়ীমূর্তি প্রথম হইতে ছিল না। প্রথমে একটি মূর্তিই ছিল। আদিবাসীদের আরাধ্য দারু-দেবতা আর্যদের সংস্পর্শে আসিয়া প্রথমে হইলেন দারুব্রহ্ম, ক্রমে এই দারুব্রহ্ম পরিবর্তিত হইলেন পুরুষোত্তম রূপে এবং সর্বশেষে জগন্নাথরূপে। পরবর্তীকালে তাঁর পাশে প্রতিষ্ঠিত হইলেন শাক্তদেবী স্তম্ভেশ্বরী, যিনি পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হইলেন শুভদ্রারূপে। তারও বহু পরে জগন্নাথের পাশে সংকর্ষণ বলরামের আবির্ভাব। নারদপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ ও উৎকল খণ্ড অনুসারে জগন্নাথ ও বলরাম ছিলেন নয়নাভিরাম চতুর্ভূজ মূর্তি এবং সুভদ্রা দ্বিভূজা। এমনকি শ্রীচৈতন্যদেবও জগন্নাথকে চতুর্ভূজরূপেই দর্শন করিয়াছিলেন।

নীলাচলে শ্রীচৈতন্যর লীলা শেষ হয় ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে, আর দেবদ্বেষী কালা পাহাড় পুরী আক্রমণ করে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে। লেখকের মতে কালা পাহাড়ের অত্যাচারেই জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের দারুমূর্তি অগ্নিদগ্ধ হয় এবং বেসর মহান্তি নামক এক ভক্তের তৎপরতায় চতুর্ভূজ জগন্নাথ ও বলরামের এবং দ্বিভূজা সুভদ্রার মূর্তির দগ্ধাবশেষের উদ্ধার হয়। সেই দগ্ধাবশিষ্ট মূর্তিগুলির সংস্কৃত রূপই আমরা দেখি জগন্নাথের রত্ন বেদীতে।

জগন্নাথ প্রথম হইতেই হিন্দুদেবতা এবং রথযাত্রা ও বুদ্ধের জন্মের বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। অবশ্য এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য যে পঞ্চম শতাব্দীর কাছাকাছি কিছু কালের জন্য এই মন্দিরে বৌদ্ধ প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু জগন্নাথ বৌদ্ধ দেবতা এবং রত্ন বেদীতে তিন মূর্তি। বুদ্ধ, ধর্ম ও শঙ্খের প্রতীক এবং হিন্দুরা জোর করিয়া বৌদ্ধদের নিকট হইতে এই মন্দির ছিনাইয়া লইয়া ছিলেন— এই ধরণের মতবাদকে লেখক তাঁহার তথ্যনিষ্ঠ যুক্তিজালে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছেন।

লেখক জগন্নাথের পূজার মন্ত্র, পূজা ও ভোগের পদ্ধতি প্রভৃতিরও নিপুণ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জগন্নাথ শুধু বৈষ্ণবদেরই দেবতা নন,—তিনি বিষ্ণু, শিব ও শক্তির মিলিত বিগ্রহ, সর্ব সম্প্রদায়ের আরাধ্য।

এই অভিনব প্রবন্ধে 'দারুব্রহ্ম রহস্য' বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের ঔৎসুক্যের সমাধান মিলিবে।

শ্রীশ্রীমহানাম অঙ্গন
রঘুনাথপুর, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, ১লা বৈশাখ

শ্রীমৎ প্রভু মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

।। প্রথম অধ্যায় ।।

তন্ত্রের শিকড় সন্ধানে

যে গিরি-শীর্ষ তুষার রেখেছে ঘিরে
সেই খানে ক্ষ্যাপা কী যে খুঁজে খুঁজে ফিরে।

।। এক।।

একটা শিশুর অশক্ত নড়বড়ে বুকের ওপর দিয়ে উদ্ধত উল্লাসে গর্জন করতে করতে অসুরের মত ছুটে চলেছিল বাস-টা। শিশু বৈ আর কি? ভূতাত্ত্বিকরা বলেন—ভারতের এই হিমগিরি অঞ্চলটাই সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন। এর মৃত্তিকার ভিৎ এখনও যৌবনের লৌহকাঠিন্য লাভ করতে পারে নি। এর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আসেনি আজও প্রাবীণ্যের সুদৃঢ় স্থিতিশীলতা। তাই, প্রায় প্রতিদিনই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ এই পার্ব্বত্য প্রদেশের কোন না কোন অংশে ওঠে প্রচণ্ড ভূকম্পের আলোড়ন। ফলে, নিত্য ধ্বসে পড়ে, খসে পড়ে বিরাট বিরাট পর্ব্বতগাত্রস্থিত প্রস্থরখণ্ড; নামে বিধ্বংসী ধস, সৃষ্টি হয় অতলস্পর্শী গিরিগহ্বর আর খাদের।

ভূতাত্ত্বিকরা আরও বলেন—আজ যেখানে পর্ব্বত হিমবাণ (হিমালয়), কয়েক কোটি বছর আগে সেখানেই নাকি বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা বুকে নিয়ে অবস্থান করতো 'টেথিস্' নামক সমুদ্র।

শিশু হিমালয়ের শৈশব রূপের অনুপম লালিত্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অপালার স্মৃতিসমুদ্র তোলপাড় করে জেগে ওঠে আর এক শিশু চরিত্রের চিত্র। যে শিশু তার দেহের বাইশ বছর বয়সেও মনের শৈশবকে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। সুঠাম সবল লাবণ্যোজ্জ্বল জয়ন্ত। সারল্য, চাপল্য, তারল্য তার শিশুর মতই। কন্‌ফুসিয়াসের মুখ্য শিষ্য এবং চীনা দার্শনিক Mencius ৩৬৯ খৃষ্ট পূর্বাব্দে লিখেছিলেন—মহাপুরুষ—মহাপুরুষ কেবলমাত্র তিনিই যিনি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিশু অন্তঃকরণকে হারিয়ে বসেন নি। দুরন্ত অশান্ত প্রাণবন্ত জয়ন্ত অনাগত দিনে কোন মহাপুরুষ হতে পারবে কি না—অপালার তা জানা না, থাকলেও একটা আশ্চর্য প্রত্যয় কিন্তু বদ্ধমূল হয়ে বিরাজ করছে তার মনে চিরদিনই। জয়ন্ত ছিন্নং ছিন্নং পুনরপি পুনঃ স্বাদচৈবেক্ষুকাণ্ডম্। যতই আঘাত কর তাকে, যতই ব্যথা-জর্জর হোক না কেন তার হৃদয়, তার চরিত্রের শিশু সুলভ মিষ্টতা তবু হারাবে না কখনও। অথচ সেই জয়ন্তই আবার কী সাংঘাতিক জেদী আর একরোখা! যে কাজ ভাল বলে ভেবেছে সে একবার তা থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না তাকে কেউ কোনদিন! ছেলেবেলায় তাকে যখনই কেউ জিজ্ঞাসা করতো—বড় হয়ে তুই কি হবি, জয়? সঙ্গে সঙ্গে বুকের ওপর বিবেকানন্দের ঢংএ দুই হাত মুড়িয়ে রেখে, ছাতি চেতিয়ে গম্ভীরভাবে জবাব দিত সে—'আমি? আমি রামমোহন রায় হবো'। রামমোহনের নির্ভীক বিদ্রোহী জীবনের অনেক কাহিনী শুনিয়েছিলেন জয়ন্তের গৃহশিক্ষক। গৃহশিক্ষক বর্ধমান টাউন স্কুলের সামাদ্ সাহেব। পাঠ পর্ব সমাধা করে মাত্র ঊনিশ বছর বয়সে জয়ন্ত চাক্‌রী পেয়েছিল এক সরকারী অফিসে। সে চাকরীতে পদমর্য্যাদা এবং অর্থাগম কোনটাই কম ছিল না। কিন্তু ঐ যে মাথায় ঢুকে বসে আছে রাজা রামমোহন সামাদ সাহেবের জিভের আগুনে রাঙা হয়ে, তিনিই বোধহয় ঘটালেন বিপর্যয়। মাস সাতেক কাজ করে জয়ন্ত একদিন

ধরাসু ছাড়িয়ে পুরাণো ঝরঝরে বাস টপগিয়ারে গোঁ গোঁ শব্দ তুলে চড়াই পথে এগিয়ে চলেছে উত্তরকাশী অভিমুখে। গাড়ীর মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে পোস্ট্যাল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের অনূঢ়া তনয়া অপালা গঙ্গোপাধ্যায়। হাতে তার জয়ন্তের আঠেরো বছর বয়সের লেখা কবিতার খাতাখানা। এ-খাতাখানি জয়ন্তের মা মেহাঙ্গিনী দেবীই তাকে দিয়েছিলেন আট বছর আগে জয়ন্তের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার কিছুদিন পরেই। অশ্রুরুদ্ধ স্বরে তিনি বলেছিলেন—তোর মনের অবস্থা যে কি, তা আর কেউ না বুঝুক, আমি তো বুঝি, অপু। তোর কাছে রেখে দে জয়ের এই কবিতার খাতাটা। মন যখন আকুলি-বিকুলি করবে খুব, ওর আঠারো বছর বয়সে লেখা এই কবিতাগুলোর উপর দিয়ে চোখ বুলোবি। তাতে হয় তো, কয়েক মুহূর্তের জন্যেও অন্ততঃ জয়ের উপস্থিতি অনুভব করতে পারবি অন্তরে। বলতে বলতে নিদারুণ ক্রন্দনোচ্ছ্বাসে সহসা নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন হেমাঙ্গিনী। উনিশ বছরে চাকরী ছেড়ে দেবার পরে তিন বছর যে ছেলেটা ইউরোপে কাটিয়ে এলো উচ্চতর বিদ্যার্জনের দুর্দমনীয় নেশায়, সে ছেলে যে গৃহে প্রত্যাবৃত হবার ছয় মাসের মধ্যেই এমনভাবে হঠাৎ উধাও হয়ে যাবে কাউকে কিছু না জানিয়ে, এমনটি কল্পনাও করতে পারেন নি কোনদিন জয়ন্তের জননী। তাই, জয় চলে যাবার পর যখনই পুত্রের কথা বলতে গেছেন তিনি, উদগত রোদন-বাষ্পে তখনই অবরুদ্ধ হয়েছে তাঁর কণ্ঠস্বর, নেত্ররেখা ছাপিয়ে নেমেছে অনর্গল অশ্রুর প্লাবন।

সত্যি, ছেলেটা চলে গেল কোথায়? অমন সম্ভাবনাপূর্ণ তারুণ্যদীপ্ত একটা প্রাণ—তা কি এমনিভাবেই অকালে হারিয়ে যাবে পৃথিবীর কোটী কোটী অখ্যাত অজ্ঞাতের ভীড়ে তাকে কেউ জানবে না, বুঝবে না, চিনবে না? প্রথম কয়েক বছর তবু বিজয়া দশমীর পর প্রতিবারই একখানা করে পত্র আসতো তার হেমাঙ্গিনীর নামে। ঠিকানাহীন পত্র। পোষ্ট অফিসের সীল দেখে বোঝা যেত—কোথা থেকে প্রেরিত হয়েছে পত্র। কখনও খামের উপর ছাপ থাকতো পিথোরাগড়ের, কখনও ধারচুলার, কখনও কামাখ্যার, আবার কখনও বা হরশিলের। এই জায়গাতেই গত কয়েক বছরে একাধিকবার ঘুরে এসেছে অপালা তার মাতা-পিতার সঙ্গে—কিন্তু কোথায় জয়ন্ত? শত প্রকারে চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত তার সম্বন্ধে কোন খবরই সংগ্রহ করে উঠতে পারে নি অপালা। গত তিন বছর তো বিজয়া-দশমী পরেও আর পত্র আসে নি কোন। ফলে মেহাঙ্গিনীর মানসিক ভারসাম্য এখন প্রায় চুরমার হতে চলেছে। এই তো সেদিন বাথরুমে স্নান করতে গিয়ে আচমকা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। পুত্র-বিরহকাতর মাতৃঅন্তর সুদীর্ঘ আটটি বছর পুত্র-মুখ অদর্শনে গুমরে গুমরে কাঁদছে অনুক্ষণ—কে তাকে সান্ত্বনা দেবে? কে তার দুঃসহ বেদন-দাহের জ্বালায় দেবে প্রবোধ বাণীর প্রলেপ? 'এ ব্যাহেনজী, হাত অন্দর লে লেও'! কণ্ডাক্টারের হুঁশিয়ারীতে সজাগ হয়ে বাঁ-হাতের কনুইটা ভেতরে ঢুকিয়ে নিল অপালা। এবার একটানা উৎরাই এ-র পথ শুরু হবে। ডান ধারে বহু নীচে দেখা যাচ্ছে ভাগীরথীর দুরন্ত জলস্রোত শ্রাবণের অবিরাম বর্ষণ দাক্ষিণ্যে দেমাকে

বাড়ী ফিরে এলো চোখমুখ লাল করে। মা এই অস্থির-মনা খেয়ালী পুত্রটির দৃষ্টির দিকে দৃষ্টি ফেলেই বুঝতে পেরেছিলেন—ভীষণ কিছু একটা কাণ্ড নিশ্চয়ই ঘটিয়ে এসেছে আজ। উৎকণ্ঠিত সুরে তিনি শুধিয়েছিলেন,—চোখমুখ তোর অমন কেন রে, জয়? কী হয়েছে তোর?' উত্তরে—হো হো করে বেশ কিছুক্ষণ উচ্চগ্রামে হেসে জয়ন্ত সুর করে আবৃত্তি করেছিল কেবল একটি ফরাসী কবিতাংশ।

আব্রু কি-বু-সুদ খুন-ই জিগার দাস্তদিহাদ্।
বু-উমেদ-ই কুরাম এ খাজা বু-দারবান মু-ফারস্।।

(যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত কোনও অনুগ্রহলাভের আশায় তাকে দ্বারপালের কাছে বিক্রয় কোরো না) আবৃত্তির শেষে উত্তপ্তকণ্ঠে বলেছিল মাকে—'জানো মা, এই দুটি মাত্র ছত্র ছেপে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল, শুক্রবার, রামমোহন তাঁর সম্পাদিত মিরাট-উল্-আখবর পত্রিকাটির প্রকাশ চিরদিনের মত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কারণ কি জানো? তৎকালীন গর্ভনর জেনারেল দেশীয় সংবাদপত্রগুলিকে দমন করবার মৎলবে আট রকমের বিধি নিষেধ প্রয়োগ করে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেছিলেন এবং আদেশ দিয়েছিলেন যে, প্রত্যেকটি পত্রিকার সম্পাদককে পুলিশ কোর্টে শপথ গ্রহণান্তে যথারীতি আর্দালী-চাপরাসীর অনুমতি নিয়ে চীফ সেক্রেটারীর দপ্তরে প্রবেশ করে কাগজ প্রকাশনের লাইসেন্স স্বহস্তে গ্রহণ করতে হবে। অপমানজনক এই নির্দেশের প্রতিবাদেই রামমোহন মিরাট-উল-আখবরের শেষ সংখ্যায় ঐ ফরাসী কবিতাংশটি প্রকাশ করেছিলেন নিজের ক্ষুব্ধ মনের জ্বালা মেটাতে।'

বাস, এইটুকুই কেবল বলে মুখ বন্ধ করেছিল সেদিন জয়ন্ত। পরে, অফিসের এক সহকর্মী এসে জানিয়েছিল জয়ন্তের বাড়ীতে—সেদিনকার সেই চোখমুখ লাল করে অফিস থেকে ফিরে আসার কারণ। কোন এক অফিসার নাকি জয়ন্তকে অনুরোধ করেছিলেন রোজ সন্ধ্যায় তাঁর ইন্টারমিডিয়েট ছাত্রী কন্যাকে পড়াতে। দশ বারো দিন অনেক রকম অনুরোধ উপরোধেও জয়ন্তকে নিজ প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী করাতে না পেরে, শেষে, সেই অফিসার নাকি তাকে এই বলে শাসিয়েছিলেন যে, তাঁর কথা রক্ষা না করলে জয়ন্তের চাকরী জীবনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এবং ঠিক এর পরেই, ঐ অফিসারের সামনেই খস্ খস্ করে ছয় লাইনের এক পদত্যাগপত্র লিখে ফেলে, বিমূঢ় অফিসারের হাতে সেটা গুঁজে দিয়ে সে নাকি বলে এসেছিল—আমি কেন কোন মেয়েকে পড়াতে ভয় পাই জানেন? কারণ, পশ্চিম জার্মানীর প্রয়াত চ্যান্সেলারের সেই কথাটিকে আমি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করি।

Adenauer বলেছিলেন—God limited the intelligence of women ; but he forgot to limit her stupidity at the same time.

বাইরে সদাই হাসি খুশি, একটুতেই আনন্দে উত্তাল ঠিক শিশুর মতই। অথচ ভেতরে এমনি একগুঁয়ে, এমনি মারাত্মক রকমের আত্মমর্য্যাদা সচেতন জয়ন্ত। কিন্তু আজ সে কোথায়।

ফুলে-ফেঁপে আত্মশ্লাঘায় গর্জন করতে করতে ধেয়ে চলেছে সমতলের টানে দয়িত-সাগরের উত্তুঙ্গ তরঙ্গের পুরুষ-ভূজে ধরা দেবার আকুল আগ্রহে। বাঁ দিকে অরণ্য সঙ্কুল খাড়াই পর্বতগাত্র। রাস্তা একেবারেই চওড়া নয়। বাঁকের মুখে বাস যখন মোড় ঘোরে, তখন ভয় হয় এই বুঝি কাৎ হয়ে পড়লো ডান দিকের ঐ দুই হাজার ফুট নীচে—খাদের মধ্যে-তুহিন শীতল ঐ খরস্রোতা গঙ্গার বুকে।

হাতের কবিতার খাতাটার পৃষ্ঠা উলটাতে উলটাতে একটি কবিতার উপর দৃষ্টি পড়তেই বুকের মধ্যেটায় কেমন যেন করে উঠল অপালার। জীবনের মাত্র সতেরোটা বছর উত্তীর্ণ হয়ে আঠেরোয় পা দিয়ে এমন বৈরাগ্যের কবিতা জয়ন্ত লিখল কি করে? 'নিরুত্তর' নাম দিয়েছে কবিতার। লিখেছে—

এত ভালবেসেছি—সে কাকে?
আয়ত আঁখির আর্শিতে
চটুল সবাক দু'টি তারা—তাকে?
নয়তো কি, বুকে
সজ্জিত লজ্জিত-রাগে
যে-নবযৌবন-বিল্ব দু'টি—তাকে?
তাও নয়?
তবে? তবে কাকে?
দু'নিতম্ব মধ্যচারী
শততাপসের দর্পহারী
যুগে যুগে পুরুষ-বন্দিত
যে অনঙ্গ-মন্দির শোভে
অনাদি অনন্ত লালসার
হোমাগ্নি আভায়—
তাকে?
অথবা, এ-প্রেম
সহস্র কামনা-ক্ষুব্ধ মহাম্বুধি তলে
শুচি তীব্র-সমুজ্জল হেম
অশুক্তা যাহা হতে থাকে বহুদূরে?
এ-প্রশ্ন প্রথম জেগেছিল
প্রথম বসন্ত দিনে
মানসীর দৃঢ় আলিঙ্গনে
আবদ্ধ করার ক্ষণে
উদ্দাম উন্মত্ত শিহরণে।

সেই প্রশ্ন আজও আবির্ভূত
শ্মশানভূমির ভস্মে আকীর্ণ অন্তরে—
পশ্চিম দিগন্তে যবে বেলা যায় যায় ;
কিন্তু হায়,
উত্তর কোথায়?

পড়তে পড়তে চোখের দৃষ্টি ছাপসা হয়ে এলো অপালার। যে ছেলেটাকে চিরদিন দেখে এসেছে সে—মেয়েদের সঙ্গ পরিহার করে চলতে—কি স্কুলে, কি কলেজে, কি বাড়ীর সব অনুষ্ঠান পর্ব্বে, সেই লিখছে—এ প্রশ্ন প্রথম জেগেছিল/প্রথম বসন্ত দিনে/মানসীর দৃঢ় আলিঙ্গনে/আবদ্ধ করার ক্ষণে/উদ্দাম শিহরণে! ভণ্ড কোথাকার! তোমার কি মন বলে কোন পদার্থ আছে যে তোমার আবার মানসী থাকবে? মনটাকে তো পাথর বানিয়ে রেখেছ সেই আতুর ঘর থেকেই, মনে হয়। আবার আঠেরো বছর বয়সেই নাকি ওর বেলা যায় যায়। পড়লেও হাড়পিত্তি জ্বলে ওঠে যেন। হঠাৎ ফিক্ করে একটু হাসিও এসে গেল অপালার ঠোঁটের রেখায়। শেষে, পাকা প্রেমিকের মতন কেমন প্রশ্ন করেছে দ্যাখো—অথবা, এ প্রেম/সহস্র কামনা-ক্ষুব্ধ মহাম্বুধি তলে/শুচি—তীব্র সমুজ্জ্বল হেম/অশুদ্ধতা যাহা হতে থাকে বহুদূরে? যেন প্রেমের অ থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত ওর মুখস্থ! আচ্ছা সব কবি আর লেখকই কি এই জয়ন্তের মতই ভণ্ড? যে জিনিসের অভিজ্ঞতা নেই এক রতিও, সেই জিনিস নিয়েই বুঝি তারা এমনি ইনিয়ে বিনিয়ে লিখে ভরে তোলে পাতার পর পাতা? ঝড়ের বেগে নামতে আরম্ভ করেছে এবার উৎরাই-এর পথ বেয়ে—পুরাণো ঝরঝরে মোটর-বাসটা। বাঁকের মুখে সশব্দে ব্রেক কষছে এক একবার, কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার দ্বিগুণ উৎসাহে ধেয়ে চলেছে গন্তব্যের উদ্দেশে।

বিদেশে তিনটি বছর কাটিয়ে জয়ন্ত যখন ফিরে এলো বাবা মা'র কাছে, তখনই তাকে যেন কেমন অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর বলে মনে হয়েছিল অপালার। দিন সাতেক পরে, একদিন হেমাঙ্গিনী বলেছিলেন অপালার মা-কে—'জানেন দিদি, এক জার্মান পাগল, ছেলেটাকে আরও বেশী পাগল করে ছেড়ে দিয়েছে।'

অপালার মা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন—তার মানে?

জবাব দিয়েছিলেন মেহাঙ্গিনী দেবী—মার্লোর যে নিভৃত কাননে বসে ইংরেজী কবি শেলী একদিন রচনা করেছিলেন তাঁর 'রিভল্ট্ অফ ইসলাম', সেইখানেই দেখা হয়েছিল নাকি জয়ের সেই পাগলা জার্মানের সঙ্গে। সেই জার্মানই ওর কানে ঢুকিয়ে দিয়েছে যত সব উৎকট উদ্ভট কথা।' 'কি কথা দিদি?' জানতে চেয়েছিলেন অপালা-জননী।

সেই জার্মান নাকি বলেছে—তোমরা ভারতীয়রা, শিবের দেওয়া সব কিছুই আজ হারিয়ে বসে আছ। কেবল শিবলিঙ্গে দুটো ফুল ছেটালেই কি আর দুনিয়ার সর্ব্বপ্রথম

সাম্যবাদী মহাপুরুষটাকে বুঝতে পারা যায়? তিনি যে তোমার দেশকে, সমস্ত পৃথিবীকে কী দিয়ে গেছেন—তার সন্ধান কি কখনও নিয়েছ? অমন ভার্সাটাইল জিনিয়াসই কি আজ পর্যন্ত এ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি জন্মেছে? একাধারে এতগুলি গুণের বিকাশ কেমন করে সম্ভব হয়েছিল—আমরা পাশ্চাত্যবাসীরা তা ভেবে অবাক হয়ে যাই। একই মানুষের মধ্যে দেখি চিকিৎসা বিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, যোগ-সিদ্ধি, অস্ত্রসিদ্ধি, আবার নৃত্যগীতে পারদর্শিতা। সর্ব্বত্যাগী সেই দিগম্বর মহাপুরুষটি আজ থেকে কয়েক হাজার বছক আগে তাঁর ভবিষ্যৎ পুরুষের জন্য রেখে গেছেন যে প্রধান দু'টি বস্তু, তন্ত্র আর বৈদ্যবিদ্যা তার আসল রূপটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা পর্যন্ত করতে দেখিনি কখনও কোন ভারতীয়কে আজ অবধি। অথচ, সেই আশ্চর্য্য তন্ত্র এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের মূল-রূপটাকে যদি হিমালয়ে কোন গোপন গহ্বর থেকে উদ্ধার করে আনতে পারতো কোন শ্রমসহিষ্ণু ধৈর্য্যশীল গবেষক, তাহলে, আমার মনে হয়, আজকের অনেক শ্রেষ্ঠ সমাজ বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসা-পণ্ডিতকেও স্তম্ভিত হয়ে যেতে হত বিপুল বিস্ময়ে।

অপালার মা জিভ কেটে তখনই বলে উঠেছিলেন—সে কি দিদি, মহাদেব তো দেবতা তাঁকে অমন মহাপুরুষ করেছে কেন সাহেবটা? শিবকে মানুষ বলে ভাবে বুঝি ওদেশের লোক? ছি ছি ছি, কী ঘেন্নার কথা! এমন কথা কানে ঢোকাও পাপ।

'তাহলেই ভাবুন তো দিদি, এইসব উদ্ভট উৎকট কথা অমন অল্পবয়সী খামখেয়ালী ছেলের মগজে যদি একবার ঢোকে, তাহলে সে ছেলের মাথা কি আর ঠিক থাকে? এতদিন পরে ঘরের ছেলে ফিরে এলি একটু আমোদ-আহ্লাদ কর, তোর ছেলেবেলাকার সঙ্গী বুলটু, সমর, অরুণ, মঞ্জু—ওদের নিয়ে ক'টা দিন হৈ-হুল্লা গল্পগুজবে কাটা, তা নয়, বাইশ বছরের ছেলে বিদেশ থেকে ফিরে এলেন পঞ্চাশ বছরের ভারিক্কি মুখ নিয়ে। হাসি নেই, ঠাট্টা নেই এর ওর কাছে বিদেশের গল্প বলা নেই। অপুটা সেই কচি বেলা থেকে জয়কে এত ভালবাসে এত মানে এত শ্রদ্ধা করে—তার সঙ্গে পর্য্যন্ত জয় হেসে কথা বলল না একবারও ফিরে আসার পরে। এসব লক্ষ্য করে, একদিন রাতে ওর শোবার ঘরে গিয়ে দেখি টেবিলের ওপর একরাশ মোটা মোটা বই-এর পাহাড়। শিব পুরাণ, কালিকা পুরাণ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, কৈবল্য উপনিষদ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, সারদাতিলক তন্ত্র, যজুর্বেদ-এই রকম সব বই-এ ভরা ওর টেবিল, টিপয়, চেয়ার, বিছানা। দশ পনেরো মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম চেয়ারের পাশটায়, বই থেকে মুখ তুলে তাকালো না পর্যন্ত একবার আমার দিকে, এমনই ডুবে আছে সে পড়ার মধ্যে। শেষে, একসময়, ওর চুলের মধ্যে দিয়ে বার দুই হাত বুলোতেই হঠাৎ মুখ তুলে চেয়ে আমাকে দেখতে পেয়ে একটু হেসে ওর মাথায় রাখা আমার হাতখানিকে নিজের হাত দিয়ে মাথার ওপরেই চেপে ধরে, কেমন যেন অদ্ভুৎ এক স্বরে বলে উঠল—আশীর্বাদ কর মা, আমি যেন যোগীশ্বর মহেশের আসল তন্ত্রপুঁথি উদ্ধার করে আজকের পৃথিবীর হাতে তুলে দিতে পারি একদিন। আমি শুধালাম, সে কি রে? এসব কী বলছিস তুই

পাগলের মত? মুহূর্তে জয়ের কান-মুখ রাঙা হয়ে উঠল উত্তেজনায়, দেখতে পেলাম। চিরদিনের হাসিখুশি ছেলেটার সে কী গুরু গম্ভীর গলা, যেন মেঘ ডাকছে। বলল— পাগল আমি নই মা, পাগল তারা—যাঁরা শিবের বহুদিনের সাধনায় অর্জিত মহাজ্ঞানের ভিত্তিতে তৈরী সর্ব্বজীবে সমদর্শী এক শাস্ত্রকে হারিয়ে বসে, আজ কতকগুলো শুকনো মন্ত্র আর কামাচারী কর্ম্মকাণ্ডকে তুলে ধরে সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করছে। এটাই হচ্ছে শিবতন্ত্র। সেই হৃত বিস্মৃত উদ্দেশ্যমূলকভাবে অপসৃত শিবসৃষ্ট আসল তন্ত্রশাস্ত্রকে আমি খুঁজে বের করবই হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশের কন্দরে কন্দরে ঘুরে, তুষারাচ্ছাদিত তিব্বত-ভুটান-নেপাল-লাদাকের প্রতিটি মঠ-মন্দিরে অনুসন্ধান করে! এটাই হবে এবার আমার জীবনের প্রধান এবং একমাত্র ব্রত। বলো মা, আমি সফল হতে পারবো তো? হেমাঙ্গিনী দেবী এর পরে আরও কি কথা বলেছিলেন তার মাকে, অপালার তা জানা নেই। কারণ, তাঁর মুখে জয়ন্তের ঐ অদ্ভুৎ ব্রতগ্রহণের শপথের কথা শোনার পর— অপালার দুই চোখে জল না এসে পারে নি সেদিন। তাই, পাছে দুই মা তার নয়নে অশ্রুর সমাবেশ ধরে ফেলেন, সেই ভয়ে অপালা ছুটে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল জয়ন্তদের বাড়ীর পূর্ব দিককার চন্দ্র মল্লিকার বাগানে।

প্রবল হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির ঝাট এসে গায়ে লাগতেই চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল অপালার। অপালা দেখল বৃষ্টির ঝাপটে আর দাপটে চতুর্দিক যেন কেমন ধোঁয়াটে ঝাপসা হয়ে গেছে, দূরের দৃশ্য আর নজরে আসছে না। তবু তারই মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ড বেগে গাড়ী চালিয়ে চলেছে পাহাড়ী পথ বাসচালনায় দক্ষ গড়বালী ড্রাইভার নিঃশঙ্কচিত্তে। উত্তরকাশীতে এ বাসকে পৌঁছে দিতেই হবে যে তাকে সন্ধ্যা নেমে আসার আগেই। ধীরে চললে তা সম্ভব হবে কেমন করে!

অপালাকে কিন্তু কোনদিনই অপালা বলে ডাকে নি জয়ন্ত শৈশবের সেই প্রথম চেনার মুহূর্ত থেকেই। বেলগাছ তলায় বেলের আঠা দিয়ে ঘুড়ি মেরামত করছিল সাবজজনন্দন জয়ন্ত। আর, জয়ন্তদেরই বিরাট কম্পাউণ্ডের প্রান্তবর্তী মস্ত কৃষ্ণচূড়া গাছটির নীচে পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের আদুরী দুলালী অপালা সপরিচারিকা খেলা করছিল তার আদরের ফক্সটেরিয়াটার সঙ্গে। দূর থেকে হঠাৎ বুঝি নজর পড়ে গিয়েছিল বাবুর স্বাস্থ্য-ঝলমল কুকুরটার দিকে। কাঁচা বেল আর ঘুড়ি বেলতলাতেই ফেলে রেখে সে দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করেছিল—কুকুরটা কার রে?

'কার আবার, আমার। দেখছ না আমার সঙ্গে খেলা করছে ও?

'আমি একটা শ্লেজ গাড়ী বানাবো, তোর কুকুরটা সেটা টানতে পারবে?

'শ্লেজ গাড়ী'? অবাক হয়ে গিয়েছিল অপালা। অনেক রকম গাড়ীর নাম সে শুনেছিল অনেকের মুখেই, কিন্তু ছয় বছরের মেয়ে 'শ্লেজ' এর নাম জানবে কেমন করে?

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শ্লেজগাড়ী জানিস নে? চাকা ছাড়া গাড়ী, বরফের উপর দিয়ে চালাতে হয়। কোথাকার মুখ্যু মেয়ে রে?'

'কি বললে?' পোষ্টাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট দুহিতা ফোঁস করে উঠেছিল, 'আমায় মুখ্যু বললে? আমি লেখা-পড়া কিছু জানি নে?

'যে লেখা-পড়া করে, সে শ্লেজ বোঝে না?'

'আমি ইংরেজী ফাষ্ট বুক শেষ করেছি—জানো? নিজের বুদ্ধিমত্তা এবং পড়াশোনায় দ্রুত অগ্রগতির প্রশংসা শুনতেই কেবল অভ্যস্ত যে কর্ণদ্বয়—সেই কর্ণকুহরেই অর্ব্বাচীন একটা হাফপ্যান্ট পরিহিত দশ বছরের ছেলের মুখনিঃসৃত 'মুখ্যু' শব্দের শলাকা প্রবেশ করে অপালাকে প্রথমে বিস্মিত, ও পরে ক্ষুণ্ণ, ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল এক মুহূর্তেই। কিন্তু এত বড় পাণ্ডিত্যের কথা ঘোষণা করার পরেও যখন জয়ন্তের মুখে সামান্যতম বিস্ময় বা প্রশস্তির একটি রেখাও ফুটে উঠতে দেখতে পেলো না অপালা, যখন তার পরেও ছেলেটা অনুত্তেজিত স্বরেই আবার বলে বসল—'মুখ্যু না হলে ফাষ্ট বুক শেষ করেই কেউ দেমাক করে এমন', তখন ক্রোধাধিক্যে একেবারে কেঁদে ফেলেছিল সে, বেশ মনে আছে। আর ঠিক তখনই, এগিয়ে এসে, ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিল জয়ন্ত—'ছিঁচকাদুনেদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনে—জানিস? আমার সঙ্গে খেলতে গেলে আমার মত হাসতে হবে। সব সময় হাসতে হবে। এই বলে একটু থেমে, পুনশ্চ প্রশ্ন করেছিল—'কি নাম রে তোর?'

'অপালা।'

অপালা? অত্রির মেয়ে অপালা? সে যে বেদ লিখেছিল রে! তবে তুই একদিন নিশ্চয়ই লেখাপড়ায় খুব ভাল মেয়ে হবি।' 'তবে কেন তুমি একটু আগে আমায় মুখ্যু বলছিলে?'

'আচ্ছা, আর বলবো না! কিন্তু আমি তোকে অপালা বলে ডাকতেও পারবো না কখনও।'

'কেন?'

'মেজমাসিমার কাছে ঋদ্বেগের কত কথা শুনেছি। অত্রির মেয়ে বিশ্বধারা আর অপালা—দু'জনেই ঋগ্বেদের সূত্র রচনা করেছিল যে। তাই তাদের ঋষি বলে। ঋষিদের কি নাম ধরে ডাকতে হয়?' মুখ কাঁচুমাচু করে অপালা জানতে চেয়েছিল—'তবে তুমি আমায় কি বলে ডাকবে?' মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করেই উত্তর দিয়েছিল জয়ন্ত মুখভরা দুষ্টুমির হাসি নিয়ে—'অপয়া বলে।' সেই শুরু অপয়া বলে ডাকার। এরপর কোনদিন অপালাকে অপয়া ছাড়া অপালা নামে ডাকে নি সেই দুরন্ত ছেলেটা। মা মানে নি, বাবা মানে নি, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু মানে নি, সবার সামনেই অম্লান বদনে ঐ অপয়া নামেই ডেকে চলেছে সে বছরের পর বছর। কতবার জয়ন্তের উপর রাগ করেছে সে অমনি অসভ্য নামে ডাকার জন্যে, কত অনুনয় বিনয় সহকারে অনুরোধ উপরোধ জানিয়েছে, মানা করেছে তাকে অপয়া বলে ডাকতে অন্যের সামনে, কিন্তু অপয়া তবু অপালা

হয়ে উচ্চারিত হয় নি একটিবারও জয়ন্তের ঠোঁটে! আজ দীর্ঘ আটটি বছর—অপালাকে অপয়া বলে কেউ ডাকে নি। সমস্ত শ্রবণেন্দ্রিয় তার এখন প্রতিক্ষণে উন্মুখ হয়ে আছে কেবলমাত্র—একজনের মুখের ঐ বিশ্রী অসভ্য নামটি শোনারই ব্যাকুল পিপাসায়। কিন্তু, হায়! সে কোথায়? কামাখ্যা, ধারাচুলা, পিথোরাগড়, হরশিল—সব জায়গায় অপালার দুই নয়ন কেবল খুঁজে ফিরেছে সেই অশান্ত খেয়ালী ছেলেটাকেই—যে একদিন সেই সুদূর শৈশবে প্রথম দর্শনেই তাকে মুখ্যু আখ্যায় আখ্যায়িত করে পরক্ষণেই নির্দ্বিধায় ভবিষ্যবাণীও করেছিল—তবে তো নিশ্চয়ই একদিন তুই লেখাপড়ায় খুব ভাল মেয়ে হবি। আজ সত্যিই তাকে সবাই ভাল মেয়েই বলছে চারিদিকে। সংস্কৃত-তে শাস্ত্রী উপাধি পেয়ে আজ সে অধ্যাপনায় প্রথিতযশা মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সেই। কিন্তু এ যশে তার কোন মোহ নেই, কোন তৃপ্তি নেই। যার বাল্য-চাপল্যজাত ভবিষ্যবাণীকে সত্য বলে প্রমাণিত করার নিশ্চিদ্র প্রয়াসে অপালা নিরলস পরিশ্রম করে এসেছে এতদিন, নিজেকে সমস্ত রকমের আনন্দ-উৎসব সুখ-ব্যসন থেকে দূরে রেখে, তারই দেখা আর যদি সে না পায় কখনও, তা হলে এ সবই যে ব্যর্থ হয়ে যাবে তার জীবনে! এ-বারও এক মাসের ছুটি নিয়ে একাই সে চলেছে উত্তর কাশী অভিমুখে, মনে ক্ষীণ আশা, যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায় জয়ন্তের সেকানকার কারুর কাছ থেকে। মা-বাবা'র সঙ্গে দুই বছর আগে আর একবার যখন এসেছিল অপালা,—তখন উত্তর কাশীর পাঞ্জাব—সিন্ধু ধর্মশালার ম্যানেজারের সঙ্গে বাবার ঘনিষ্ঠতা প্রায় বন্ধুত্বের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই সময়ে, সেই ভদ্রভাষী সৌম্যদর্শন গড়বালী ম্যানেজার বাবার মুখ থেকে জয়ন্তের সব কথা শুনে বলেছিলেন—কোই বাৎ নেহি, আপনি আবার একবার আসুন গাঙ্গুলী-সাব্। আমি চারিদিকে খোঁজখবর করছি। এ পথে আপনাদের ছেলে যদি আসে কখনও, খবর আমার কাছে ঠিকই এসে যাবে। তবে, অন্য জায়গাতেও খোঁজ করতে হবে বৈ কি ছেলেটার, হিমালয় বলতে তো কেবল উত্তরকাশী বা হরশিল বোঝায় না। একা আসতে পেরেছে অপালা কেবল ঐ প্রবীণ ম্যানেজারের আশ্বাসে এবং ভরসাতেই বুক বেঁধে। মাসখানেক আগে উনি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন গাঙ্গুলী মশায়কে—উত্তরকাশীতে পৌঁছে গেলে অপালা-বিটিয়ার পুরা জিম্মাদারী আমার। আপনার পায়ে যখন বাতের দর্দ এত বেশী, তখন, আপনার পক্ষে বিটিয়ার সঙ্গে আশা সম্ভব না হলেও আপ্ বিলকূল বেফিকিরমে রহিয়ে। বিটিয়াকে লিয়ে হর্ ইন্তেজাম মায় করুঙ্গা। কিন্তু কী ইন্তেজাম আর করবেন ঐ সহৃদয় ভব্যাচারী ম্যানেজার! পারবেন কি তিনি অপালার নারী অন্তরের চিরদুর্গমের অভিযাত্রী সেই খেয়ালী পুরুষটির পুনদর্শন লাভের ইন্তেজাম করাতে? যার কণ্ঠের 'অপয়া' ডাকটুকু মাত্র শুনবার জন্যে ওর সারা মন প্রাণ উৎকর্ণ হয়ে আছে তার সদা সর্ব্বদা।

ভয়ঙ্কর আর্তনাদ তুলে, ভীষণ এক ঝাঁকানির সৃষ্টি করে, উৎরাই পথে ভয়ানক বেগে ছুটন্ত মোটর-বাসের ড্রাইভার আমচ্‌কা ব্রেক কষে নিমেষে স্তব্ধ করে দিল

গাড়ীটাকে। বাসযাত্রীদের ভয়ার্ত চীৎকার থিতিয়ে যেতেই দেখা গেল—সামনে ছোট-খাটো একটা ধস্ নেমেছে পাহাড়ের উপর থেকে। রাস্তা প্রায় বন্ধ। আস্‌পাশের গ্রাম থেকে কিছু লোক এসে এরই মধ্যে খোন্তা-কোদাল হাতে নেমে পড়েছে পথ পরিষ্কার করার কাজে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করতে সে জানালো—কম সে কম একটি ঘন্টা। সময় তো লাগবেই সড়ক-সাফাই-এ। অতএব, নিরুপায় অপালা বাসের বন্দীদশা থেকে নিজেকে কিছুক্ষণের জন্যে মুক্ত করে—এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল, পাহাড় আর ভাগীরথীর নয়নভোলানো শোভা দেখতে দেখতে। হাত ঘড়িতে চারটের বুকে ছোট কাঁটাটার পা। থরে থরে মেঘ চেপে বসে আছে নদীর পরপারের পর্বতশ্রেণীর বুকে, মাথায়। বর্ষার গৈরিকাঙ্গী ভাগীরথী বয়ে চলেছে মাত্র কুড়ি বাইশ হাত নীচ দিয়ে—ফেনিল জলোচ্ছ্বাসের অবিরাম দুন্দুভি বাজিয়ে। বাস রাস্তার একদিকে ভাগীরথীর প্রবাহ-পথ পার্ব্বত্য উপত্যকার মধ্যে দিয়ে, অপর পার্শ্বে অভ্রলেহী পর্বতপ্রাচীর চুল্লী, খুবানী, আরু ও আখরোট বৃক্ষে প্রায় আচ্ছাদিত। অন্যমনে হাঁটতে হাঁটতে অপালা কখন যে গঙ্গার দিকের এক খাড়াই পাথরের পাশে এমন এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখান থেকে বাসটি আর দৃষ্টিগোচরে আসে না, বুঝতেও পারে নি। হঠাৎ নজরে পড়লো পাথরের ছোট্ট একটি অদ্ভুৎ নুড়ির প্রতি। লম্বাটে নুড়িটির একদিকে কুচকুচে কালো, ঠিক যেন মাথার চুল। বাকী সবটাই বেলে পাথরের রঙের। কিন্তু কোণাকুণি একটা সুস্পষ্ট সাদা রেখা দেখলে মনে হয় বুঝি যজ্ঞোপবীত ধারণ করে ঐ কৃষ্ণকেশ পীত-দেহী নুড়ি মানুষটা। দেখে ভারী ভাল লাগল অপালার। হেমাঙ্গিনী দেবী অথবা তার মা যদি পান অমন একটি নুড়ি, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা পূজোর ঘরের সিংহাসনে বসিয়ে পরম ভক্তিভরে পুজার্চনা করবেন ঐ নুড়ির। নিজেদের সৌভাগ্যবতী বলে ভেবে নিয়ে পরম কৃতার্থবোধ করবেন মনে মনে। মানুষের ভক্তির ঐকান্তিকতা, এমনিভাবেই তো যুগে যুগে, কত নগণ্য পাথরকে পরিণত করেছে বরেণ্য দেবতায়। অপালা কৃতসংকল্প হ'ল—ঐ অপূর্ব্ব মসৃণ দ্বিজমূর্তিধারী নুড়িটিকে সে যেমন করেই হোক তুলে নিয়ে গিয়ে উপহার দেবে হয় হেমাঙ্গিনী, না হয় তার মাকে। তবে মুস্কিল হচ্ছে এই যে, ভাগীরথীর খাদের দিকে কিছুটা নিম্নে একটা বেরিয়ে আসা চওড়া পাথরের চাঙ্গড়ার উপর পড়ে রয়েছে ঐ নুড়িটা। নিতে গেলে হাত দুই নীচে হয়তো নামতে হবে। তা অবশ্য এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। তাছাড়া লোকজনও এখানে চারপাশে এখন এমন কেউ নেই যার জন্যে মনে তার কোন প্রকার সঙ্কোচ আসতে পারে। তবু চতুর্ধারে একবার উত্তমরূপে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে তবেই সে শাড়ীটাকে এক হাত দিয়ে হাঁটু পর্যন্ত গুঁটিয়ে নিয়ে আস্তে করে একটি পা নামিয়ে দিল নীচের ঐ প্রস্তর চাঙ্গরাটির দিকে। নিরাপদে এবং অতি সহজেই পাথরের উপর একটি পা স্থাপিত করতে সক্ষম হল যখন সে, তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েই অপর পা-টিকেও যেই

এনে রাখতে গিয়েছে ঐ একই চাঙ্গরাটির উপরে, কোথা থেকে কি যে ঘটে গেল—ঝুরঝুর করে ধুলো, মাটী পাথরের কুচি সব খসে খসে পড়তে লাগল—সে চাতাল প্রস্তর পিণ্ডের চার পাশ থেকে—যেটার বুকে প্রথম পা টি রেখে দাঁড়িয়েছিল অপালা।' স্পষ্ট বুঝতে পারলো সে—ধীরে ধীরে আল্গা হয়ে যাচ্ছে ঐ চাঙ্গরাটি খাদ-প্রাচীরের মূল-দেহ থেকে। সশব্দে ধুলো ঝরছে, নুড়ি খস্‌ছে, মাটি পড়ছে—বেশ কয়েক হাত নীচে শ্রাবণের উত্তাল গঙ্গার ক্ষুব্ধ উন্মত্ত জলস্রোত ফোঁস ফোঁস করছে হিংস্র বাঘিনীর মত। অপালা এখন কী করবে? কী করলে বাঁচবে সে?

।। দুই ।।

'ক্যাও হোঈ তোয়েরি'?

প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় প্রায় জমে যাওয়া নেত্রপল্লব উন্মীলন করলো অপালা—পুরুষের ভারী গলার ঐ প্রশ্নটি কানে প্রবেশ করতেই। দেখতে পেলো—এক গাল ভিজে দাড়ি, একমাথা ঝাকড়া জল-সপ্‌সপে চুল নিয়ে তার বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে জনৈক গড়বালী তারই চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে। পলকে আতঙ্কে কন্টকিত হয়ে উঠল অপালার সমস্ত শরীর। মনে পড়ে গেল তার পায়ের নীচেকার সেই পাথর খসে যাওয়ার কথা—বরফ শীতল ভাগীরথীর ভয়াবহ স্রোতের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ার কথা—তারপর, তারপর? তারপর কী যে হয়েছিল আর তো কিছুই মনে নেই তার। কিন্তু সর্বাঙ্গ সিক্ত গড়বালীটা এখনও তার দিকে চেয়ে এমন করে কী দেখছে? কোথা থেকে এলো এ? আর, সেই বা এখন কোথায়? এদিকে ওদিকে চোখ ফেলতেই বুঝতে পারলো—সে শুয়ে আছে এক খড় মাটি দিয়ে তৈরী করা নাতি বৃহৎ ঘরে। প্রথম শাড়ী পরার দিন থেকেই অপালা অভ্যস্ত শাড়ীর নীচে বড় মাপের ইজের পরতে। এ বুদ্ধিটা ধার করেছিল সে তার এক খুড়তুতো বৌদির অভিজ্ঞতার কাছ থেকে। সভয়ে নিজের দেহের দিকে দেখল এখন অপালা—সেখানে কেবল মাত্র জলে ভেজা ব্লাউজ এবং আণ্ডারওয়্যারটি ছাড়া আর কোন কিছুরই চিহ্ন পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই কোথাও। আর এই অবস্থাতেই তার শরীরের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন করছে মুখমাথা ভরা দাড়ি-চুলের জঞ্জালের ভেতর থেকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে এক তাগ্‌ড়া পাহাড়ীয়া। মুহূর্তে লজ্জায় কুকড়ে যেতে চাইল তার সর্বাঙ্গ। ভরা-বর্ষার দুরন্ত গঙ্গাস্রোতের উদ্দাম তাণ্ডবে। তবে কি তার অঙ্গাবরণের শাড়ীটি ভেসে চলে গেছে, নয় তো নিমজ্জিত হয়েছে ঐ গর্জন মুখর গঙ্গার গভীর গর্ভে?

'ইউ মেরু কুরু ছো। তোয়েরিঁ আজো রাতো ইখি রানু পারালু।' (এটা আমার ঘর। এখানে আজ রাতটা তোমাকে থাকতে হবে) অপালাকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতে দেখে, লোকটা পুনরায় কথা বলল। এর আগেরবার যখন বাবা-মা'র

সঙ্গে হরশিলে গিয়ে থেকে ছিল অপালা, গড়বালের বুলি শিখে নিয়েছিল কিছু কিছু অল্পদিনের মধ্যেই। নিজে ভাল বলতে না পারলেও, কেউ বললে—খুব বেশি কষ্ট হয় না তার বুঝতে। তাই, লোকটার বক্তব্যের অর্থটুকু উদ্ধার করতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই হড়মুড় করে উঠে বসবার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু পারলো না। বুঝতে পারল ঘাড়ে মাথায় তার দারুণ ব্যাথা। বাঁ পায়ের হাঁটুর কাছটাতেও অসহ্য যন্ত্রণা। তবু, আধ-বসা অবস্থাতেই অপালা হিন্দিতে বলে উঠল 'নেহি নেহি, ম্যায় ইহা নেহি রহুঙ্গী।'

'খাবরান্ কেঁয়াংক লাগি? ম্যয় তোয়েরি তেরা ডেরা লি যাঁউ দুঁ।' (ঘাবড়াচ্ছ কেন? আমি তোমাকে ঘরে পৌঁছে দেবো)। পাহাড়ীয়া তার ভারী গলাকে যথাসম্ভব কোমল করে অভয়দানে সচেষ্ট হল। কিন্তু যার উদ্দেশ্যে এই অভয়বাণী, সে ততক্ষণ লোকটার বিপরীত দিকে মুখ করে, বোধ করি সিক্ত ইজের ও ব্লাউজের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠা নিজের নারী অঙ্গকে আড়াল করবার স্বাভাবিক প্রয়াসেই, পাশ ফিরে শুয়ে, কাতরকণ্ঠে আবেদন জানালো—মুঝে একঠো কাপড়া দিজীয়ে না পেহন্‌নেকো লিয়ে।

এইবার লোকটা হঠাৎ একটা অদ্ভুৎ প্রশ্ন করে বসলো দুম্ করে,—'তু বেটমান কি চারি ধেদু, তু হাচি তো নি বেটমান? (তোমায় দেখতে তো অনেকটা মেয়েছেলের মতই। আসলে তুমি মেয়েছেলেই তো)? এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে অসহায়া অপালা আর একবার তার পূর্ব প্রশ্নরই পুনরাবৃত্তি করলো কেবল কাপড়ার জায়গায় শাড়ী শব্দটা বসিয়ে। তাতেই ফল পাওয়া গেল। শাড়ী কথাটা মস্তিষ্কে প্রবেশ করতেই পাহাড়ীয়া পুরুষপুঙ্গব হয়তো নিশ্চিত হল ভাগীরথীর ফুলে ফেঁপে ওঠা জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে থেকে বহুশ্রমে সদ্য তুলে আনা ডুবন্ত মরন্ত প্রাণীটির নারীত্ব সম্বন্ধে। সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই পুনঃপ্রত্যাবৃত হল বেশ কিছু কাপড়-জামা হাতে করে। তারপর সেগুলো অপালার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—লা ইউ সায়া, সাদরি, সাঁপু, তিগ্‌বন্ধা। ইউ নি প্যাহরে, ঔর পুরি বেটমান বন্ যা। (এই নাও ঘাঘরা, ব্লাউজ, ওড়না আর কোমরবন্ধনী। এগুলো পরে' খাঁটি মেয়ে ছেলে বনে যাও)। অর্থাৎ শ্মশ্রু-কেনাবৃত পার্বত্য বর্বরটির দৃষ্টিও ইজের পরিহিতা অপালাকে খাঁটি নারী বলে গ্রহণ করতে একেবারেই রাজী নয় বোঝা গেল। লোকটা দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো কয়েক মুহূর্তের জন্যে। ভাবল হয়তো সে সামনে আছে বলেই মেয়েটা ভিজে ব্লাউজ-ইজের ছাড়তে পারছে না। কিন্তু একটু পরেই ঘরে ঢুকে সে দেখলো—নিশ্চিন্ত জলে ডোবা থেকে বাঁচিয়ে আনা তার রূপসী অতিথি যেমন শুয়েছিল তেমনি শুয়েই পড়ে আছে, কেবল ঘাগরা ও কোমরবন্ধনী দিয়ে এরই মধ্যে আবৃত করে ফেলেছে নিজের বক্ষ কটী এবং নিম্নাঙ্গ। উঠে শুকো কাপড়-জামা পরবে তেমন শক্তিই কি এখন আছে বেচারার? এইবার গড়বালী—ঘরের কোণে কুলুঙ্গিতে রাখা পঞ্চাশ-ষাটটা বোতলের মধ্যে থেকে একটি বোতল বেছে এনে, তার ভেতরকার কালো পাউডারজাতীয়

পদার্থের কিছুটা একটি ছোট চামচে করে তুলে, একটা গেলাসে একটু জলের সঙ্গে গুলে, গেলাসটি অপালার মুখের কাছে ধরলো 'বলল—পিয়েন্দু'। অপালা খেয়ে নিল লোকটার হাতের গেলাসের জলমিশ্রিত চূর্ণ টুকু বিনা উচ্চবাচ্যে। কী কটু, কী কষায়, কী তিক্ত তার স্বাদ। কিন্তু একি? একি হচ্ছে তার চারিদিকে। দেওয়াল দরজা, ছাত, মেঝে সব ঘুরছে। পৃথিবী টলমল করছে যেন। আকাশের আলো নিভে আসছে ক্রমে ক্রমে, গলার মধ্যে কেমন এক অস্বস্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে ভীষণভাবে, জিভটা জড়িয়ে যাচ্ছে। বিকৃতস্বরে চিৎকার করে উঠল অপালা—'এ তুমি কী খাওয়ালে? কী খাওয়ালে আমাকে?'

আচ্ছন্ন অনুভূতি আর অপ্রকৃতিস্থ শ্রবণশক্তি নিয়েও অপালা শুনতে পেলে। গড়বালী জিভের স্পষ্ট উচ্চারণ—Extractum cannabis indicae.

।। তিন ।।

অতলস্পর্শী সুপ্তি সাগরের গহন গহ্বর থেকে ধীরে ধীরে যখন চৈতন্যের তটরেখায় আবার ভেসে উঠল অপালা—নিশা অতিক্রান্ত প্রায়। ক্ষুদ্র এই কুটিরের ক্ষুদ্রতর গবাক্ষপথ দিয়ে আকাশের যে প্রান্তটুকু ধরা পড়ে দৃষ্টির আওতায়—সেখানে বৈরাগী উষার আগমনী কীর্তন। সদ্যস্ফুট ঈষৎ আলোকাভাস ভৈরবীরাগিনীতে কম্পমান। ঘাড় এবং পা নাড়াতে গিয়েই বুঝতে পারলো অপালা—ব্যথা-যন্ত্রণা তার কমে গেছে প্রায় বারো আনাই। বেশ তরতাজা মনে হচ্ছে যেন শরীরকে। এই সময় কানে ভেসে এলো দু'টি পুরুষ কন্ঠের উচ্চরব আলোচনা। আলোচনা চলছে অনর্গল বাংলায়—বোধ হয় তাকে নিয়েই। প্রথম কণ্ঠটি যে কোন অশীতিপর বৃদ্ধের, তা তার কম্পিত স্বরের ক্ষীণ সুরটুকু শুনলেই বুঝতে কষ্ট হয় না। দ্বিতীয় কণ্ঠে কিন্তু যথেষ্ট তেজ এবং সাবলীলতা। কিন্তু টিহ্‌রী গড়বালের এই দেহাতি ঝোপড়ির মধ্যে দুই বঙ্গভাষাভাষীর আবির্ভাব সম্ভব হল কেমন করে?

বৃদ্ধ কণ্ঠে আক্ষেপ করেই যেন বলছে—'এটা তুমি একেবারেই ভাল কাজ করোনি নান্দীবাবা। মেয়েটাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে—ভদ্রঘরের শিক্ষিতা খুবই কোমল স্বভাবের কোন কন্যা হবে, আর তাকেই তুমি ধরে খাইয়ে দিলে কি না গাঁজার নির্যাস? আরে আমিও তো একজন আগেকার দিনের বিলিতি ডিগ্রিধারী ডাক্তার হে! তোমার এইসব আসুরিক চিকিৎসার পাগলামি কিন্তু আমি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারি নে। দ্যাখো শেষ পর্যন্ত মেয়েটার জ্ঞান আদৌ ফিরে আসে কি না।' দ্বিতীয় কণ্ঠ সহজ ভাবেই তার প্রত্যয় জ্ঞাপন করলো—ফিরবে, নিশ্চয়ই ফিরবে। Extractum Cannabis indicae দেবার পরে ওকে ঘুমন্ত অবস্থাতেই জোর করে এক গেলাস গরম গরুর দুধ খাইয়েছিলাম। সারা রাত আমি আর মাতাজী বসেছিলাম ওর পাশে।

একটু আগে নাড়ীও পরীক্ষা করেছি। বেশ সুস্থ আর সবল হয়ে উঠেছে ওর নাড়ীর গতি।'

'ওসব কোন কথাই আমি কথা বলে ধরবো না ততক্ষণ, যতক্ষণ না মেয়েটাকে উঠে বসতে দেখছি নিজের চোখে। তোমাকে এই গাঁজাতেই খাবে আমি বেশ বুঝতে পারছি। নিজে তো বিড়ি-সিগরেট দূরের কথা, এক কাপ চায়েরও স্বাদ নিয়ে দেখলে না জীবনে। অথচ এর ওর অসুখ শুনলেই কথায় কথায় প্রেসক্রাইব করে বসছো হয় Extractum Cannabis indicae, নয়তো Tinctura Cannabis indicae—কী বিপদের কথা বল তো? দেখবে, একবার এমন ফাঁপরে পড়বে—

'না, না ডাক্তার রায় ফাঁপরে আমি পড়বো না কখনও, পড়তে পারি নে। গাঁজাকে আপনি যা তা একটা কিছু বলে ভাবছেন কেন? গাঁজাকে পীযুষরূপে বর্ণনা করে বলা হয়েছে—এ সেবন করলে আতঙ্ক বিনাশ হয় এবং হর্ষের ভাব জেগে ওঠে। সুশ্রুত স্বয়ং বিভিন্ন রোগে গাঁজা সেবনের বিধান দিয়েছেন (সুশ্রুত, উত্তর ২৪ অঃ)। আপনি তো জানেন সংস্কৃতে গাঁজাকে অনেক স্থানেই ভঙ্গা, গঞ্জিকা, ভরিতা, গজাশন, গঞ্জাকিনী, মৎকুনারি, শক্রাশন, জয়া (শব্দচন্দ্রিকা), বীরপত্রা, চপলা, আনন্দা, প্রকাশিনী, হর্ষিণী ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। পাণিণির ৫/২/২৯ সূত্রের বাক্তিকে এবং পাণিণির ৫/৫/৪ সূত্রে দেখতে পাবেন গাঁজার পর্য্যায়ান্তর ঐ ভঙ্গা শব্দটির উল্লেখ আছে। গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাসের গ্রন্থে ঐ ক্যানাবিস নামটি খুঁজে পাওয়া যাবে। হাসানের আরবী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সেখ জাফর সিবানী নামে একজন ফকির মিসাবার পর্ব্বতে নির্জ্জনে উপাসনা করতে গিয়ে একদিন জঙ্গলের মধ্যে গাঁজার পাতা খেয়ে ফেলে এতই আনন্দবোধ করেছিলেন যে, পরে তিনি তাঁর সমস্ত শিষ্যদের ডেকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন ঐ বিস্ময়কর গুণাবলীসম্পন্ন গাছগুলিকে। মিশরে গোজে নামক একপ্রকার নল দিয়ে মিশরীয়রা হাসিসের (গাঁজার পত্র ঝুরি) ধূমপান করতে অভ্যস্ত। অবশ্য নেশাখোররা নেশা করার জন্য যেমন ছিলিমের পর ছিলিম গাঁজার ধোঁয়া দেহের মধ্যে ঢোকায়—সেটাতে সাধারণতঃ দেহের ক্ষতিই হয়ে থাকে বেশি।'

'তাই নাকি?' ডাক্তার রায় যেন একটু শ্লেষের সুরেই বলে উঠলেন, 'তা হলে গাঁজাতে যে শরীরের ক্ষতিও হয় যথেষ্ট সেটা মেনে নিচ্ছ তুমি?'

'মেনে নিচ্ছি বৈকি। ভেষজ বিজ্ঞানের প্রথম কথাই তো হচ্ছে পরিমিতি! যতটুকু পরিমাণে ভেষজ গ্রহণ করলে দেহ সুস্থ, সতেজ ও নীরোগ হয়ে উঠবে—তার চেয়ে বেশি শরীরের মঙ্গল করবে কেমন করে? এই ধরুন না—আপনাদের অ্যালোপ্যাথিতে কত ওষুধেই তো base হিসেবে রাখা হয় পরিমিত পরিমাপের অ্যালকহল। সে ওষুধ খেয়ে শত শত রোগী ব্যাধিমুক্ত হচ্ছে আজ সারা দুনিয়ায়। কিন্তু আবার ঐ অ্যালকহলই যখন নেশা করার লোভে কোন মানুষ পান করতে থাকে বোতলের পর বোতল, তখন

তার স্বাস্থ্যে যে চরম বিপর্যয় দেখা দিতে বাধ্য—এটা কেই বা না জানে! গাঁজার ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনিটিই।'

'তা না হয় মানলাম। এখন তোমার ঐ গাঁজার এক্সট্র্যাক্টটা কেমনভাবে বানাও সেটা জানতে পারি কি?

'নিশ্চয়ই, কেন নয়? চার পাইন্ট রেকটিফায়েড স্পিরিটে আধসের গাঁজার গুঁড়ো সাতদিন ভিজিয়ে রেখে, তারপর তাকে চাপ দিয়ে অথবা নিংড়িয়ে নিয়ে আরক বের করতে হয়। এটাকে চুঁইয়ে স্পিরিটটুকু উড়িয়ে দিলেই প্রস্তুত Extractum Cannabis indicae আবার, এই এক্সট্র্যাক্টরই এক আউন্স যদি এক পাইন্ট বিশুদ্ধ স্পিরিটের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তাহলেই তৈরী হয়ে যায় গাঁজার টিঞ্চার (Tinctura Cannabis indicae)।'

'বাঃ, গাঁজা সম্বন্ধে তোমার এই নিজস্ব মতামতের উপর ভিত্তি করে একটা 'গঞ্জিকাষ্টকম' রচনা করে ফেল হে, তাতে গেঁজেলদের হাততালি পাবে খুব।' 'আমার নিজস্ব মতামত বলে তো কিছুই নেই। সিদ্ধি বা গাঁজা যে ভেষজগুণে গুণান্বিত সে কথা সর্ব্বপ্রথম যিনি ভারতের মানুষকে শুনিয়েছিলেন, তিনি এসেছিলেন তিব্বত থেকে। তাঁর এক হাতে ছিল পৃথিবীর প্রথম সমতাবাদী নব্যতন্ত্র ঘোষণাকারী এক বিস্ময়কর শাস্ত্র, যার নাম তন্ত্রশাস্ত্র, অপর হাতে ছিল বিশ্বের প্রাচীনতম চিকিৎসাবিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের দ্যুতি। অহঙ্কারপ্রমত্ত আর্যসমাজে যখন শুরু হয়েছিল বৈদিক বর্ণাশ্রমের নামে অনার্য্য, আদিবাসী এবং দরিদ্র সাধারণের ওপর অকথ্য অত্যাচার এবং অবিচার, যখন বৈদিক ধর্ম্মের মূল কথা যে উদার মানবতাবাদ—তাকে শিকেয় তুলে রেখে, সুবিধান্বেষী ব্রাহ্মণকুল কেবল কর্মকাণ্ড নিয়েই মাতামাতি আরম্ভ করেছিলেন আর্য্যাবর্তের দিকে দিকে—ঠিক সেইরকম সময়েই আবির্ভাব ঘটেছিল তিব্বতাগত ঐ বিপ্লবী মহাযোগীর। আগে আর্যাবর্তে পূজিত হতেন যে দেবতারা, তাঁদের সকলেরই ছিল রাজ-বেশ। শিরে কণকমুকুট, কণ্ঠে রত্নহার, কর্ণে স্বর্ণ-কুণ্ডল, হাতে কাঞ্চন-বলয়, অঙ্গে বর্ণাঢ্য বসন-বিলাস। কিন্তু তিব্বতের কৈলাসাঞ্চল থেকে নেমে এলেন যে প্রথম আর্য্য-স্বৈরতন্ত্র এবং ভ্রষ্টাচার বিরোধী অদম্য বিদ্রোহী মহাপুরুষটি, তিনি দিগম্বর, মাথায় তাঁর জটাজুট, কর্ণে ধুতরাফুল, কণ্ঠে সাপের হার, বাহুতে রুদ্রাক্ষমালা। লক্ষ্য করে দেখুন—দেহে যা-কিছু তিনি ধারণ করে এলেন—সেই ধুতুরা সর্প এবং রুদ্রাক্ষ—তাদের প্রত্যেকটিই কিন্তু ভেষজগুণ-সমন্বিত। ধুতরার বীজ থেকে স্নায়ু-রোগের ওষুধ তৈরী হয়, সাপের বিষও যে অনেক রোগেরই নিরাময়ার্থে প্রয়োজন হয়—সেটা আধুনিক বিজ্ঞানও মেনে নিয়েছে, আর আসল রুদ্রাক্ষের দ্রব্যগুণে বাতজাতীয় অনেক ব্যাধিরই যে উপশম ঘটে—সেটাও আজ আর অজানা নেই কারও। এর উপর সেই মহাবিপ্লবী যোগীশ্বর হিমালয় থেকে নিয়ে এলেন এক আশ্চর্য্য নেশার উপাদান। আর্য্য রাজা এবং দেবতাবৃন্দ তখন কারণবারী, সোমরস, সুরা এবং বারুণী জাতীয় উত্তেজক

পানীয়ের স্রোতে ভাসছেন। মদ্যপান করে যে উত্তেজনা আসে, তাতে মানুষ অনেক সময়েই প্ররোচিত হয় নারী-নির্যাতনে, প্রাণ হননে, পরস্বাপহরণে। কিন্তু কৈলাশবাসী সেই স্বৈরীদ্রোহী মহামানব যে নেশার উপাদান বহন করে এসে দাঁড়ালেন ব্যাভিচারোন্মত্ত তৎকালীন আর্যাবর্তে—তাও এক ভয়ঙ্কর ভেষজ যা যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করলে মানুষ উন্মাদ পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে, আবার রোগ লক্ষণানুযায়ী যার পরিমিত প্রয়োগে বহু ব্যাধিরই নিরাময় হয় ত্বরান্বিত। এই নবানীত নেশায় কোন মানুষের মাথায় খুন চাপে না মদ্যপের মত, জাগে না অন্যের সর্ব্বস্ব গ্রাসের দুরভিসন্ধি। সেই ভয়ঙ্কর ভেষজকেই পরবর্তীকালে লাটীনে বলা হয় Cannabis indicae বা Cannabis sativa ইংরেজীতে বলা হল Hemp, ফ্রেঞ্চে বলা হল Chanvre, জার্মানে—Hanf, ইতালিয়ানে Canape, রুষভাষায়—Konoplia, স্প্যানিশে–Canamo, হিন্দিতে—ভাঙ্গ, কাশ্মীরীতে বঙ্গি, মারাঠিতে ভাঙ্গাছা ঝাড়া, বাংলায় সিদ্ধি, ভাঙ্গ, গাঁজা।' সেকি? তুমি যে সিদ্ধি আর গাঁজাকে এক করে দিলে হে! বাংলায় যেটাকে সিদ্ধি বলা হয়। সেটা তো গাঁজা নয়, অন্য গাছের পাতা।'

বৃদ্ধ ডাঃ রায়ের এই কথায় বয়োকনিষ্ঠ হটাৎ হো হো করে হেসে উঠল। অনাবিল প্রাণ খোলা হাসি—অপালা শুনতে পেলো। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল কবে কোথায় যেন এমনই নির্বাধ উচ্চ হাস্য লহরী শুনেছে সে বহুবার, এ হাসির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় যেন তার কতকালের, কত যুগের। 'আরে! আমার কথায় এত হাসছ কেন? এতে হাসির কী আছে?' বৃদ্ধ-কণ্ঠের বিস্ময় প্রকাশ। আপনি ইংল্যাণ্ড থেকে সার্জারীতে ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন ডাক্তারবাবু, অথচ সিদ্ধি আর গাঁজা যে এক গাছেরই দুটি জিনিষ তা আপনার আজও অজানাই রয়ে গেছে। ঐ একই গাছের পাতাকে বাঙ্গালীরা বলে সিদ্ধি, আর ফুলকে বলে গাঁজা। আবার ঐ গাছেরই ফুল আর গাছের আঠাকে বলা হয় চরস।'

'বলো কি? আমার তো ধারণা ছিল ঐ তিনটি জিনিস পাওয়া যায় বুঝি আলাদা আলাদা গাছ থেকে, কি কাণ্ড বলো তো?' এটা আপনার দোষ নয় ডাঃ রায়। রূপবান আর্য্যরা বিদ্বেষভরে আর্য্যমণ্ডলের বহিঃস্থিত যে দেশটিকে ডাকতেন 'কিম্পুরুষবর্ষ' নামে, সেই চিরতুষারাবৃত তিব্বতের ভীতিউদ্রেককর কৃৎসিৎ মূর্তি বাসিন্দাদের মধ্যে থেকেই যখন অসামান্য যৌগশ্বৈর্য্যবান মহাপুরুষটি এসে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন প্রথমে অনার্য্য পরে আর্য্য অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতেও, তখনই আর্য্যকুলপতিরা, নিজেদের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কাতেই বোধ হয়, প্রচার করতে শুরু করলেন—ঐ জটাজুটধারী উলঙ্গ বর্ব্বর পুরুষটির সব খারাপ। আজও সেই 'সব খারাপ' ঘোষণারই ধ্বনি প্রতিধ্বনি অবিশ্বাস্যভাবে কাজ করে চলেছে কিন্তু আমাদের অনেকের মধ্যেই। আর তারই প্রমাণ হচ্ছে—আমরা এখনও গাঁজা বা সিদ্ধির নাম শুনলেই অকারণে নাক সিঁটকাই। সিদ্ধি কিংবা গাঁজার গুণাগুণ জানবার চেষ্টাটুকু পর্য্যন্ত করি না। কিন্তু

সেকথা এখন থাক। এই গাঁজার অশেষ গুণ। এর ধূম যারা সীমিত পরিমাণে পান করে, প্রচণ্ড শীতেও তাদের শৈত্যানুভব হয় না, প্রখর রোদও তাদের তাপবিব্রত করে তুলতে পারে না। একাগ্র মন নিয়ে মানুষ একইস্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা আত্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকতে পারে অনায়াসে। এই জন্যেই তো ভারতবর্ষের শত শত সন্ন্যাসী গাঁজা সেবন করে সম্পূর্ণ নগ্নদেহেও কালাতিপাত করতে কোন কষ্টবোধ করেন না হিমালয়ের ঠাণ্ডাতেও! সুদূর তুরস্কের লোকেরাও গাঁজার ধূম পান করে থাকে—হাসিস নাম দিয়ে। এই হাসিস পানের পদ্ধতিটা অবশ্য একটু অন্যরকমের। সাধারণতঃ সাত গ্রেণ গাঁজার আরকের সঙ্গে তামাক মিশিয়ে নলযোগে তার ধূম মুখগহ্বরে প্রবেশ করায় তারা। হিমালয়ের নিকটবর্তী কিছু কিছু অঞ্চলে গাঁজার বীজগুলি ভেজে খায় অনেকে। আসামে ভাঙ্গ থেকে এক প্রকারের পানীয় তৈরী করা হয়, তার নাম—গুন্টা। উত্তর-পশ্চিমে 'পত্তর' নামে যে গাঁজা বিক্রি হয়—তার জন্মস্থান কিন্তু হিমালয়ে নয়, 'ইন্দোরে।'

'গাঁজা সম্বন্ধে এত তথ্য আহরণ করলে কোথা থেকে হে? এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় আছে না কি এসব?'

'আজ্ঞে না। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা আরম্ভে নিজেই যে গণ্ডগোল পাকিয়ে বসে আছে, এতে আর তথ্য পাবো কেমন করে? এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বলছে, ইংরেজী Hemp শব্দের অর্থে শণ আর গাঁজা দুই-ই হয়। অথচ, আসল কিন্তু শন এবং গাঁজা গাছ জাতিতে এক হলেও, গাঁজা গাছের আকারে বেশ কিছু পৃথক ধরনের বিশেষত্ব আছে। শণ আর গাঁজা মোটেই এক বস্তু নয়। কিন্তু গাঁজা সম্বন্ধে কিছু তথ্য তো আপনারও জানা, থাকা উচিৎ ডাক্তারবাবু। কারণ আধুনিক চিকিৎসা-বিদ্যাতেও তো গাঁজার আরক ব্যবহৃত হয় অনেক ওষুধেই। 'মেডিসিন আমার সাবজেক্ট ছিল না—তুমি তা জানো। তাছাড়া, আজ থেকে পঞ্চান্ন বছর আগে গাঁজাকে ওষধিরূপে ব্যবহার করার কথা, অ্যালোপ্যাথরা তেমন গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছিলেন বলে তো আমার মনে পড়ে না। অবশ্য, এমন দেখতে পাই কিছু কিছু ওষুধের ফর্মূলার ক্যানাবিস ইণ্ডিকার উপস্থিতি তাও কেবল গুটিকয় Elixir ধরনের ওষুধেই।' 'আজ্ঞে না—অনেক রকম রোগের চিকিৎসাতেই আজকাল গাঁজার সহায়তা নেওয়া হচ্ছে।'

'বোগাস্। আমি বিশ্বাস করি নে। তুমি ছিলে পুরাতত্ত্বের ছাত্র, ডাক্তারির তুমি কী জানো?'

'কিছুই নয়। তবু বিভিন্ন মেডিক্যাল জার্নালেই পড়েছি যে, পাশ্চাত্ত্য ভৈষজ্যতত্ত্বেও গাঁজাকে বেদনা নিবারক, স্নিগ্ধকারক, ধনুষ্টঙ্কার রোগ নাশক, মাদক, মূত্রকারক ও প্রসবের সহকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই জন্যেই জলাতঙ্ক, ধনুষ্টঙ্কার, কম্প, প্রলাপ, তড়কা, স্নায়বীয় বেদনা প্রভৃতি রোগে গাঁজা প্রয়োগ করে বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে। এছাড়া, কলেরা, অধিক রজঃ জরায়ু থেকে রক্তস্রাব, বাতরোগ, হাঁপানি,

হৃৎপিণ্ডের বৈলক্ষণ্য, ক্লেশকর চর্মরোগ ও চুলকুণি প্রভৃতিতেও গাঁজার ব্যবহার হয়ে থাকে আজকাল নানাভাবে। প্রসবের সময় জরায়ুর অবসাদবশতঃ প্রসূতি অধিকক্ষণ ব্যাথা পেতে থাকলে গাঁজার প্রয়োগে জরায়ুর সঙ্কোচ সাধন হয়, এবং তারই ফলে প্রসব হয়ে যায় তাড়াতাড়ি।'

'আমার সন্দেহ হচ্ছে নান্দীবাবা, গাঁজার গুণকীর্তন করতে গিয়ে নিজে চিকিৎসক না হয়েও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে এখনই যে সব কথাগুলো বলে গেলে তুমি গড় গড় করে, তা নিশ্চয়ই হয় কোনো গাঁজাখোর হাতুড়ে ডাক্তারের মুখ থেকে শোনা, নয় তো সমস্তটাই তোমার উর্বর মস্তিষ্কের আবিষ্কার।'

বিস্মিত হয়ে শুনল অপালা—বৃদ্ধের অমন আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে কথা বলার উত্তরেও বয়োকনিষ্ঠের কণ্ঠে কিন্তু সামান্য উত্তাপও প্রকাশ পেল না। শান্ত স্বরেই সে বলল—'আপনি John Warings এর Pharmacopaela of India'র চার শো চৌষট্টি পৃষ্ঠায় আমার বলা কথাগুলির সত্যতা যাচাই করে নিতে পারেন অনায়াসে। ঐ বই পড়লে এটাও জানতে পারবেন যে, ডাঃ অসফনেসিই হচ্ছেন সেই চিকিৎসক—যিনি গাঁজার গুণাগুণ অবগত হয়ে সর্বপ্রথম তা প্রয়োগ করেন বিলেতি ওষুধে!'

এরপর ওদিকে কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। অমনি অপালার ভাবনা শুরু হয়ে গেল। 'গতকাল সেই জলে ভেজা দাড়ি, জল সপসপে ঝাক্‌রা চুলের গড়বালীটা তাহলে তাকে গাঁজার নির্য্যাসই খাইয়েছিল! তাই সেটা গলার মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মাথা বুক সব যেন কেমন করছিল তার, সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিল সে কয়েক মুহূর্তেই। কিন্তু এখন যে কথা বলছে পাশের ঘরে বৃদ্ধের সঙ্গে, সে তবে কে? কী আশ্চর্য্য চেনা চেনা মনে হয় তার বাচনভঙ্গী, কী অদ্ভুৎ পরিচিত মনে হয় তার উচ্চ হাস্য রোল। বৃদ্ধ শুধালেন—তা শেষ রাতে লোক পাঠিয়ে আমাকে এমন ঘুম ভাঙ্গিয়ে ডেকে আনার কারণটা তো বললে না?

'মেয়েটা মনে হয় বেশ কিছুটা উঁচু থেকে ভাগীরথীর জলে পড়ে গিয়েছিল। ঘাড়ে আর বাঁ পায়ে যে ওর বেশ চোট লেগেছে—তা ওর পা-ঘাড় নাড়ানোর সময় মুখের বিকৃতি দেখেই বুঝতে পেরেছি। ব্যথা-যন্ত্রণা কমানো, দৈহিক অবসন্নতা দূর করা এবং আকস্মিক পড়ে যাওয়ার জন্য যে শক্ ওর লেগেছে—তা থেকে বাঁচানোর তাগিদেই ওকে আমি গাঁজার এক্সট্র্যাক্ট দিয়েছিলাম। রাত তিনটেয় নাড়ী দেখেছি। আমার মতে ও এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু সোয়া তিনটের সময় মাতাজী গঙ্গায় স্নান করতে যাবার আগে আমায় আপনাকে একবার খবর দিতে বলে গেলেন। বললেন—উনি বিলেত ফেরত অভিজ্ঞ সার্জন। ওঁকে দিয়ে একবার মেয়েটাকে পরীক্ষা করানো দরকার—শরীরের কোন জায়গায় হাড়টাড় ভেঙ্গেছে কি না সেটা উনিই বুঝতে পারবেন!'

'মাতাজীর আদেশ? তবে তো একবার তোমার রোগিনীকে পরীক্ষা করে দেখতেই হবে! কিন্তু যা গাঁজার রস তুমি খাইয়েছ—সে কি আর কখনও জ্ঞান ফিরে পাবে?'

সর্ব্বনাশ! অপালা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল! ওরা তবে এখনই তো এসে প্রবেশ করবে তার ঘরে। তবে তো এখনই পরে নেওয়া উচিৎ গড়বালীটার দেওয়া সায়া, সাদরি সাঁপু, তিগবন্ধা! ঘাঘরা আর ওড়নাটা দিয়ে এখন যে কেবল কোনমতে আবৃত রাখা হয়েছে তার গা! আস্তে আস্তে শয্যা ছেড়ে উঠে ক্ষিপ্র হাতে সজ্জা পরিবর্তনে ব্যস্ত হয়ে উঠল অপালা। আর ঠিক এই সময়ে দূরে শোনা গেল ব্রাহ্মমুহূর্তের আকাশে-বাতাসে শিহরণ তুলে কোন এক মধুকণ্ঠি নারী কেদারা রাগে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছে বোধহয় এই কুটীরের দিকেই—

জয় শিব-শঙ্কর হর ত্রিপুরারি, পাশী পশুপতি ডম্বরুধারী।
শিরে জটাজুট কণ্ঠে কালকূট, সাধক জনগণ-মানস বিহারী।।

।। চার।।

গড়বালী পরিচ্ছদ সর্বাঙ্গে চাপিয়ে—কম্বলটা টেনে নিয়ে নিঃশব্দে খাটে শুয়ে পড়ে আবার চোখের পাতা বন্ধ করেছিল অপালা। কয়েক জোড়া পা যে ঘরে প্রবেশ করলো—সেটা সে বুঝতে পারলো শব্দ শুনেই। কে যেন তার বাঁহাতের কব্জিটা তুলে ধরে নাড়ী পরীক্ষা করতে লাগলো বেশ কিছুক্ষণ ধরে। বোধ হয় ডাঃ রায়ই হবেন। কারণ, এর পরেই তাঁর কণ্ঠ শোনা গেল—নাড়ীতো ভালই কিন্তু গাঁজার নেশা ছাড়লো কই? মেয়েটা তো এখনও বেহুঁশ হয়েই পড়ে আছে দেখ্‌ছি। রমণীর ঈষৎ হাসি শোনা গেল। তিনি বললেন—জ্ঞান ওর নিশ্চয়ই ফিরেছে। নইলে সাজ পোশাক বদ্‌লালো কেমন করে?

'কখ্‌খনো হতে পারে না। গাঁজার নির্য্যাস বলে কথা! ভদ্র ঘরের অল্প বয়েসী মেয়ের তা কি করে সহ্য হবে? নির্ঘাৎ ও এখনও বেহুঁশ হয়েই আছে।' বৃদ্ধ প্রত্যয় জ্ঞাপন করলো।

রমণী কণ্ঠ পুনশ্চ বললেন—কিন্তু রায়জী, আমি স্নান করতে যাবার সময় নিজে যে দেখে গেছি—ও কেবল একটি ইজের আর ব্লাউজ পরে শুয়েছিল। অপালা আঁখি মেলে তাকালো এবার সদ্য প্রবিষ্টদের দিকে। শুভ্র কেশ বৃদ্ধের অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন যিনি—তাঁর দিকেই দৃষ্টি গিয়ে পড়লো সর্বাগ্রে। সদ্যস্নাতা মধ্যবয়সী রমণীটির রূপ যেন আর ধরে না তাঁর অঙ্গে। আকর্ণ বিস্তৃত দুই নয়নের প্রদীপে শান্তি এবং পবিত্রতার হোমাগ্নি জ্বলছে ধিকি ধিকি করে। দেহরাগে কণকচ্ছটা। নাক, ভ্রু, ওষ্ঠ সবই যেন দেবী কুমারিকার মূর্তিকেই স্মরণ করিয়ে দিতে চায় বারবার। যেমন নিটোল গড়ন, তেমনি স্নেহসিক্ত কথাবার্তা। অপালাকে চক্ষু উন্মিলন করতে দেখেই আনন্দের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর মুখ। তিনি এগিয়ে এসে সস্নেহে অপালার মাথায় হাত রেখে সুমিষ্ট স্বরে প্রশ্ন করলেন—'কেও বিটি, আব্ তো থোড়া ঠিক হ্যায়?'

'আমি ভাল আছি।' বঙ্গবালা জবাব দিল বঙ্গভাষাতেই।

বৃদ্ধের পশ্চাতে দাঁড়িয়েছিল গতকালের গড়বালীটা। অপালা লক্ষ্য করলো—তার মুখে বাংলাবুলি শুনে গৈরিকধারিণী এবং ডাক্তার রায়ের চেয়ে ঢের বেশী বিস্মিত হল যেন সে-ই।

'আপনি কে? অপালা শুধালো অনিন্দ্যদর্শনা সন্ন্যাসিনীকে।

'আমি?' সন্ন্যাসিনীর মস্ত দুই চোখে একটু লজ্জার আভাস উঁকি দিল বলে মনে হল। স্মিত হাস্যে তিনি বললেন—আমাকে কেউ ডাকে আশা মায়ি, কেউ ডাকে মাতাজী। আমি আসলে কিন্তু ওসব কিছুই নই। আমি আসলে হচ্ছি বরিশালের আশালতা, ঝিঙ্কাঠির আশালতা।'

ইনিই মাতাজী? ইনিই তাহলে সারাটি রাত তার শয্যাপার্শ্বে জেগে কাটিয়েছেন কাল? কিন্তু আশ্চর্য্য! রাত জাগার গ্লানির চিহ্নও নেই কোথাও তাঁর আননে নয়নে। ইনিই রাত্রি সোয়া তিনটায় গিয়েছিলেন বরফ-গলা গঙ্গাজলে স্নান করতে? এঁরই কিন্নরীকণ্ঠের মধুক্ষরা সঙ্গীত মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বেও প্রত্যূষের নৈঃশব্দকে সিঞ্চিত করে তুলেছিল এক স্বর্গীয় ভাবমূর্ছনায়।

এই সময় বাইরে কিছুলোকের গুঞ্জন শোনা গেল। সঙ্গে একটি উত্তেজিত পুরুষ কণ্ঠের প্রলাপোচ্ছ্বাস। ঝোপরির দ্বারে দাঁড়িয়ে তারা তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল—নান্দীসাব, নান্দীসাব! দাড়ি আর ঝাঁকড়া চুলের গড়বালীটা মুহূর্তে বেরিয়ে গেল বাইরে। তাকে দেখেই সমাগত পাহাড়ীয়ারা খল্‌বল্ খল্‌বল্ করে কী সব যেন বলতে লাগল ঝড়ের বেগে। মাতাজী কান খাড়া করে শুনতে লাগলেন ওদের কথাবার্তা—অপালার পাশে বসেই। ডাঃ রায় সভয়ে ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলেন—'এত গণ্ডগোল কিসের মায়ি? কোন রুগীকে গাঁজার রস খাইয়ে মেরে টেরে ফেলে নি তো? তবে তো, ওর সঙ্গে আমাকে আপনাকেও গাড়োয়ালীরা জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে।

আশামায়ি হাসলেন। বললেন, না ডাঃ রায়—আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। ঐ যে লোকটা প্রলাপ বকছে—ও গত রাত্রে আচমকা উন্মাদ হয়ে গেছে, একে মারতে যাচ্ছে, ওকে কামড়াতে চাচ্ছে। তাই নান্দীবাবার কাছে নিয়ে এসেছে তাকে—চিকিৎসা করাতে।'

'চিকিৎসা করাতে উন্মাদ রোগের চিকিৎসা করবে নান্দীবাবা?' কেমন যেন একটু ব্যঙ্গের সুরেই প্রশ্ন করলেন ডাক্তারবাবু। 'চিকিৎসার ও কি জানে? দেখবেন— এমনি আন্‌তাবড়ি গাঁজার নির্য্যাস আর যা খুশি তাই খাইয়ে নান্দী একদিন এমন গাড্ডায় পড়বে যে, 'ওকে তখন আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। এখানকার জংগী পাহাড়ীদের হাতেই ওকে একদিন মরতে হবে খেঁতো হয়ে।'

মিনিট দশেকের মধ্যে ঘরে ফিরে এলো আলুথালু শ্মশ্রু কেশ লোকটা। ডাঃ রায় ভ্রূ নাচিয়ে বিদ্রূপ করলেন, উন্মাদ রোগের কি দাওয়াই দিয়ে এলে হে? গাঁজার রস, না, ভাঙের বড়ি? একটু হেসে জবাব দিল গড়বালী—'আজ্ঞে না, গাধার পেচ্ছাপ।'

'What? গাধার পেচ্ছাপ? you mean urine?' আঁৎকে উঠলেন ডাঃ রায়।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। গর্দ্দভ মূত্র সম্বন্ধে হারীতে বলেছেন—এতে উন্মাদ আর কুষ্ঠ রোগ নিরাময় হয় (হারীত ১/৯) আর বিশ্বামিত্র মুনির পুত্র সুশ্রুত লিখেছেন-গর্দ্দভ মূত্র বিষ, চিত্তবিকার, কৃমিবাত ও কফনাশক (সুশ্রুত, সূত্রস্থান ৫৪ অঃ)। ইংল্যাণ্ডের শিক্ষায় শিক্ষিত শল্য চিকিৎসকের চক্ষু চড়কগাছে ওঠার জোগাড়। উন্মাদের চিকিৎসায় হাত দিয়েছে এক আনাড়ী বদ্ধ পাগল।

ডাঃ রায়ের চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে কী যেন ভাবল গড়বালী। তারপর পুনর্বার একটু হেসে কথা কইল সে—'গাধাকে আমরা যতটা নিকৃষ্ট জীব বলে ভাবি, ঠিক ততটা নিকৃষ্ট কিন্তু সে নয়। তাই গাধার কাছ থেকেও তিনটি জিনিস শিক্ষা করতে বলে গেছেন চাণক্য।

অবিশ্রান্তং বহেদ্ভারং শীতোষ্ণঞ্চ ন বিন্দতি। সসন্তোষস্তথানিত্যং ত্রীণি শিক্ষেৎ গর্দ্দভাৎ। অবিশ্রান্ত ভারবহন, শীত এবং উষ্ণ দুটিকেই সহ্য করার শক্তি এবং নিত্য সন্তোষ—এই তিনটি গুণের পাঠ যে আমাদের গর্দ্দভের কাছ থেকেই নিতে হবে ডাক্তারবাবু।' এই বলে আবার হো হো করে উচ্চহাস্যে মুহূর্তে ছোট ঘরখানাকে কাঁপিয়ে তুলল গড়বালীবেশী অথচ সাবলীল বাংলাভাষী শশ্মশ্রু লোকটা। আর, সেই হাসির দমকে দমকে কোন এক সুদূর স্মৃতির উচ্ছ্বসিত আবেগ ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসতে চাইল যেন অপালার কুমারী হৃদয়ে হতাশাগ্রস্থ অচলায়তনকে পলকে চূর্ণবিচুর্ণ করে দিয়ে। কে এই পুরুষ? কেন এর কথা এর হাসি শুনলে বুকের ভেতর এমন ভাবে মোচড় দিয়ে ওঠে অপালার? টুপীর নীচেকার ঐ ঝাকড়া চুলের গাদা, আর মুখ ভরা ঐ অযত্নে বেড়ে ওঠা দাড়ির পাঁজার আড়ালে—কে আছে লুকিয়ে? কী রহস্য রয়েছে গোপনে গা ঢাকা দিয়ে?

হাসির শেষে গড়বালী কিন্তু দাঁড়ালো না আর বেশিক্ষণ। আশামায়ির দিকে চেয়ে বলল, 'নাকোরি ছাড়িয়ে ধরাসুর দিকে ঐ ভুগুা গ্রামে আমাকে একবার যেতে হচ্ছে, মা এবারকার তিব্বতযাত্রা যে জাড় ছেলেটি আমার সঙ্গী হবে, তারই সঙ্গে কিছু পরামর্শ আছে।'

মাতাজী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—কিন্তু বাবা, আমি যে শুনেছি যাযাবর ঐ জাড়-এরা শীতকালেই নাকি কেবল এসে ডেরা বাঁধে ভুগুায়, বছরের অন্য সময়ে তারা ছাউনি ফেলে বাস করে হরশিল আর নেলাং গিরিপথের মাঝামাঝি জায়গায়?'

'এ কথা ঠিক। কিন্তু পরশু খবর পাঠিয়েছে আমার সেই জাড়-বন্ধু-সম্প্রতি সে ভুগুাতে এসেছে ঘি বিক্রি করতে। আমি দিন দুই-এর মধ্যেই ফিরে আসতে চেষ্টা করবো মা' শান্ত স্বরে আশামায়ি বললেন—'বেশ তো, যাত্রা কর। শুভায় ভবতু।'

প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে গড়বালী।

ডাঃ রায় প্রশ্ন করলেন চোখের চশমার কাঁচ দুটো রুমাল দিয়ে পরিষ্কার করতে করতে—'ব্যাপার কী মাতাজী? পাগলটা তিব্বতে যাবার মতলব আঁটছে বুঝি? এবার চীনাদের হাতে বেয়নেটের গুঁতো খেয়ে মরবে।'

মুহূর্তে তুষার ধবল মুখখানিতে গাঢ় রক্তিম আভা ফুটে উঠল আশামায়ির। আকর্ণ বিস্তৃত নেত্র-প্রশান্তিতে ধক করে জ্বলে উঠল ক্রোধাগ্নি। ক্ষোভ কম্পিত স্বরে এবার কথা কইলেন তিনি। বললেন আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তাই নান্দীর নমস্য। এবং কেবলমাত্র সেই কারণেই যতক্ষণ নান্দী ঘরে ছিল, আমি আপনাকে একটি কথাও বলিনি ওকে অকারণেই বিদ্রূপ এবং ব্যঙ্গ করা সত্ত্বেও। কিন্তু এইবার যে আমার মুখের দুটো কথা শুনতে হবে আপনাকে ডাঃ রায়!'

'কি কথা বলুন।' শল্য চিকিৎসকের গলার সুরও বেশ গম্ভীর ঠেকল অপালার কানে। 'কেবল আজ নয়, অনেকদিন অনেকবারই করেছি, ছেলেটাকে সুযোগ পেলেই আপনি যা মুখে আসে তাই বলে ঠাট্টা করেন। মাত্র তিনমাস হল আপনি উত্তরকাশীতে এসে বাস করছেন, কিছুদিন পরে আবার চলেও যাবেন, তাই কোন কঠিন কথা শোনাতে চাই নে আপনাকে। শুধু জানতে চাইব, এর প্রতি আপনার এই বিদ্বেষের কারণ কি?

'কারণ আর কি? ওর ঐ শিব শিব করে বাড়াবাড়ি করাটা আমার কাছে একেবারেই অসহ্য বলে মনে হয়। ওর ধারণা—শিবই প্রথমে পৃথিবীকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অ-আ-ক-খ শেখায়, ওর ধারণা সাম্যবাদ বলে দুনিয়াতে আজকে যা চলছে— তারও ভিত্তিমূলে নাকি রয়েছে ঐ শিবেরই সৃষ্ট শৈবতন্ত্র। তাই শিবের নেশা গাঁজা ভাঙের প্রশংসায় ও পঞ্চমুখ, তাই ব্যাভিচারী তান্ত্রিকদের ইন্দ্রিয়-সম্ভোগসর্ব্বস্ব তন্ত্রকে সাম্যতন্ত্র বলে ঘোষণা করতেও ওর দ্বিধা বা লজ্জা আসে না একটুও।'

মাতাজী বললেন—আমি অবশ্য শিব সম্বন্ধে বলবার অধিকারিণী ঠিক নই, কারণ সেই কৈলাসচারী পরমপুরুষটির দুর্জ্ঞেয় জীবনচর্যার কতটুকুই বা জানতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি আজ অবধি। তবু এটুকু নিশ্চয় করেই বলতে পারি—নান্দীবাবা শিব সম্বন্ধে বাড়িয়ে বা বানিয়ে বলে না একটুও। যা কিছু সে বলে, তা তথ্যের ওপর নির্ভর করেই বলে।'

বিস্মিত কণ্ঠে রায় শুধালেন—আপনিও ঐ পাগলটার কথাতেই সায় দিচ্ছেন মাতাজী? একটা পৌরাণিক কাল্পনিক দেবতাকে নিয়ে—'

ডাক্তারের কথা শেষ হবার আগেই গর্জে উঠলেন আশামায়ি—'কে বলেছে মহাদেব পৌরাণিক দেবতা? কে বলেছে রুদ্রকে কাল্পনিক?

'যে দেবতার নাম বেদে আমরা পাই নে, যার নাম কেবল দেখতে পাই পৌরাণিক খোস গল্পের মধ্যে—তাকে কাল্পনিক বলবো না তো কি বলবো বলুন?'

'বেদ আপনি পড়েন নি ডাক্তার রায়। বেদে বহু জায়গায় খুঁজে পাবেন আপনি রুদ্রের প্রশস্তি। বেদে যিনি রুদ্র, পুরাণে তিনিই শিব।'

'তার প্রমাণ কোথায়?'

'বৈদিক মন্ত্রে অধিকাংশ স্থলে রুদ্রকে সংহার কর্তা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পৌরাণিক শিবও এইগুণে বিভূষিত। ঋগ্বেদে দেখতে পাই রুদ্রকে অগ্নিরূপে স্তুতি জানানো হয়েছে— ত্বমগ্নি রুদ্রো অসুরো (ঋক-৪।১।৬), জরাবোধ তদ্‌বিদ্ধি বিপেবিশে যজ্ঞিয়ায়। স্তোমং রুদ্রায় দৃশীক্‌ম। (ঋক্ ১।২৪।১০), সামবেদও (১।১৫) এই ঋকটি দেখতে পাওয়া যায়। নিরুক্তকার যাস্ক এই ঋকের ব্যাখ্যায় বলেছেন—অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে তস্যেবং ভবতি। পুরাণেও শিবের ঠিক এমনই অগ্নিমূর্তি দেখতে পাই আমরা। বামন পুরাণে আছে—ইত্যুক্তঃ শঙ্করঃ ক্রুদ্ধো বদনং ঘোরচক্ষুষা। নির্দগ্ধকঃ প্রত্যানিশং দদর্শ ভগবানজঃ। মহাকবি কালিদাসও কুমার সম্ভবে লিখেছেন—ভষ্মাবশেষং মদনং চকার। শিবপুরাণ বলছে—শিব ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তেই সমস্ত চরাচর দগ্ধ করতে সমর্থ। দগ্ধুং সমর্থোমনসা ক্ষণেন সচরাচরম্ (শিব পুরাণ—২৪।২৯)। পুরাণে বার বার শিবকে জ্ঞানদ বলে স্তব করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণে উপদেশ দেওয়া হয়েছে—জ্ঞানার্থীরা শিবের শরণ গ্রহণ করবেন। ঋগ্বেদেও রুদ্রের বর্ণনায় আছে—রুদ্রদায় প্রচেতসে মীড়হষ্টমায় তব্যসে। বোচেম শন্তমং হৃদে।।(১।৪৩।১) অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত অভীষ্ট বর্ষণকারী ও অতিশয় মহৎ রুদ্র আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করছেন, কবে তাঁর উদ্দেশে আমরা সুখকর স্তোত্রপাঠ করবো? পুরাণ বলছে শিব সঙ্গীতাচার্য্য, শিব তাণ্ডবনর্তক, শিব বিষাণবাদক। ঋগ্বেদও রুদ্রকে সুস্পষ্টভাষায় সঙ্গীতচার্য্যরূপেই স্বীকৃতি দান করেছে। (১।৪৩।১) পুরাণ পাঠে জানা যায় কতশত দৈত্য শৌর্য্য-বীর্য্য ও বিজয় লাভের নিমিত্ত শিবের তপস্যা করতেন, শিবের নিকট বর প্রাপ্ত হতেন। বাণ, রাবণ, শাল্ব প্রমুখ সকলেই ছিলেন শিব বরে বলীয়ান। শিব যে বীরগণের প্রভু—পুরাণে তার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ঋগ্বেদেও আমরা এর সূত্র দেখতে পাই। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তপাঠে জানা যায়—রুদ্রও বীরগণের বীর, সুখ-শান্তি ও মঙ্গলদাতা, এবং রণদুর্মদ যোদ্ধা ও যুযুৎসুগণের বরদাতা। সমরে বিজয়লাভের জন্যে পৌরাণিক শিবভক্তরা যেমন শিবের কৃপা প্রার্থনা করতেন, বৈদিক সময়ে রুদ্রের নিকটও যুযুৎসুগণ ঠিক সেই রকম প্রার্থনাই জ্ঞাপন করতে অভ্যস্ত ছিলেন (১।১১৪।৩)। পুরাণে শিব যেমন বহুমূর্তি বিশিষ্ট, রুদ্রকেও ঠিক তেমনি বহুমূর্তি বিশিষ্ট রূপেই বর্ণনা করা হয়েছে ঋগ্বেদেও (২।৩৩।৯) পুরাণের শিব রজত গিরিনিভ শুভ্র সমুজ্বল, ঋগ্বেদও রুদ্র সম্বন্ধে বলছে—যঃ শুক্র ইব সূর্যো হিরণ্যমিব রোচতে (১।৪৩।৫), যে রুদ্র সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান, হিরণ্যের ন্যায় উজ্জ্বল। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে শিব সহস্র নামে আমরা দেখতে পাই শিবের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"বজ্রহস্তশ্চ বিষ্কৃম্ভী চমুস্তম্ভন এব চ", ঋগ্বেদে

রুদ্রও বজ্রহস্ত রূপে বর্ণিত—শ্রেষ্ঠো জাতস্য রুদ্র শ্রিয়াদি তবস্তমস্তবসাং বজ্রবাহো (২।৩৩।৩) অর্থাৎ হে রুদ্র! তুমি ঐশ্বর্য্যে সকলের শ্রেষ্ঠ। হে বজ্রহস্ত! প্রবৃদ্ধাগণের 'মধ্যে তুমি অতিশয় প্রবৃদ্ধ, ইত্যাদি। এখন নিশ্চয়ই আপনার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না ডাঃ রায় যে, বেদের রুদ্র আর পুরাণের শিব একই।'

'কিন্তু কোন বেদেই রুদ্রকে তো কখন শিব নামে ডাকা হয় নি।' শল্য চিকিৎসক হট্ করে হটবার পাত্র নন। 'তাও হয়েছে। রুদ্রকে শিব বলা হয়েছে ঋগ্বেদেও (১০।৯২।৯)। তাছাড়া শুক্ল যজুর্ব্বেদ বা বাজসনেয় সংহিতাতেও আমরা শিব নামের উল্লেখ দেখতে পাই (৩।৬১)। রুদ্র দেবতা কি কারণে যে শিব নাম প্রাপ্ত হলেন, তারও বর্ণনা আছে শুক্লযজুর্বেদেই। রুদ্র নিজ সেবকদের প্রতি কখনও প্রতিহিংসাপরায়ণ হন না। তাঁর ক্রোধ না হলেই প্রজাদের মঙ্গল হয় তাই তিনি শিব। এইবার আপনিই বলুন ডাক্তার রায়, শিবকে পৌরাণিক খোস গল্পের তৈরী একটি দেবতা বলে অবজ্ঞার সুরে কথা বলাটা আপনার মত একজন বিজ্ঞজনের উচিৎ হয়েছে কি?' অকারণেই মাথা চুলকাতে চুলকাতে ডাক্তার আমতা আমতা করে বললেন—'হ্যাঁ, এখন অবশ্য মেনে নিতে আপত্তি নেই যে, শিব বৈদিক যুগেও পূজিত হতেন। কিন্তু পূজিত হতেন তো দেবতা হিসেবেই। তবে তাঁকে নান্দীবাবা সবসময় মহাপুরুষ, মহামানব, বিপ্লবী, স্বৈরীদ্রোহী—এইসব আখ্যা দেয় কেন? কেনই বা একটি দেবতাকে সামান্য কিছুক্ষণ আগে আপনিও হঠাৎ আখ্যা দিয়ে বললেন পরমপুরুষ বলে? দেবতা তো দেবতাই। তিনি তো মনুষ্যদেহধারী কেউ নন! শিব হচ্ছেন ভক্তের ভক্তির রং-এ রঞ্জিত একটি কল্পিত আদর্শ মাত্র।'

'কে বলেছে আপনাকে রায়মশাই, শিব স্বয়ং মনুষ্যদেহ ধারণ করেই এই পৃথিবীর বুকে বিচরণ করেন নি। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যিশুখৃষ্টের মত শিবও একদিন মানুষরূপেই লীলা করে গেছেন মানুষের গড়া সমাজে।'

'কিন্তু কৃষ্ণ, রাম, যিশু, মানুষ ছিলেন বলেই আমরা তাঁদের সকলেরই পিতার নাম জানতে পেরেছি, শিবের পিতার নাম তবে কোথাও কোন শাস্ত্রেই নেই কেন? শিবের পিতৃ পরিচয় জানতে না পেরে মহাকবি কালিদাস তো শেষে লিখেই বসলেন—'বপুর্বিরূপাক্ষমলক্ষ্যো জন্মতা' অর্থাৎ শিবের কূলের কোন ঠিক ঠিকানা নেই।'

'মহাকবি কালিদাস ভুল লিখেছিলেন। তার কারণ, নিশ্চয়ই সমস্ত বেদ এবং সংহিতা তাঁর পড়া ছিল না। শুক্ল যজুর্বেদের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ মন্ত্রটি হচ্ছে—শিবো নামাসি। সুধিতিস্তে পিতা নমস্তে (৩।৬৩) ইত্যাদি ইত্যাদি। এর মানে—তোমার নাম শিব। তোমার পিতার নাম স্বধিতী, তোমায় নমস্কার।'

একটু যেন থমমত খেয়ে গেলেন অশীতিপর শল্য চিকিৎসক। শিব-জনকের নামও যে এমন ঝাঁ করে কোন এক বেদের ভেতর থেকে টেনে বের করে আনতে

পারে কেউ, এটা তাঁর কাছে কল্পনাতীত কাণ্ড। তবু দমে যাবার মত লড়িয়ে যে তিনি একেবারেই নন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল তাঁর পরবর্তী প্রশ্নেই। খুবই গুরু গম্ভীর চালেই আবার তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য প্রকাশ করলেন, 'কিন্তু' একথা তো আপনি অস্বীকার করতে পারেন না মাতাজী যে, ভগবান বুদ্ধের ধর্মকে নকল করেই শৈব ধর্মের সৃষ্টি। বৌদ্ধরা যেমন কোন জাত বিচারের ধার ধারতেন না, শিবও ঠিক তেমনই—'

বাধা দিয়ে আশামায়ি শুধালেন—'তার মানে আপনি বলতে চান, শিবের আবির্ভাব ঘটেছিল বুদ্ধদেবের অনেক পরে?'

'সে বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে? আমার যতদূর পড়াশোনা, তা থেকে আমার নিশ্চিত ধারণা, শৈব ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে জৈন ধর্মের অভ্যুদয়েরও অনেক পরে।' তাহলে তো আপনার মতে জৈন ধর্মপ্রচারিত হয়েছিল বৌদ্ধধর্মের পরে। কিন্তু আমি যদি বলি আপনার ঐ দুটো ধারণাই আসল সত্য থেকে অনেক দূরে, তাহলে কি মনে কষ্ট পাবেন আপনি? বোঝা যাচ্ছে আপনি উইলসন সাহেবের মতটুকুই তাহলে কেবল পড়েছেন। তিনি বলেছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রতাপ খর্ব হলে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে জৈনধর্ম প্রচারিত হয়েছিল (Wilson's Mackenzie Collection)। কিন্তু আপনি কি জানেন প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ কোলব্রুক কি লিখে গেছেন? তিনি নানা তথ্যের সমর্থনে প্রমাণ করেছিলেন—শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরকেই বুদ্ধদেব গুরুরূপে গ্রহণ করেছিলেন (Miscellaneous Essays, vol. 1., p. 380)? তারপর, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ষ্টিভেনশনও বলেছিলেন প্রায় ঐ একই কথা। তাঁর বক্তব্য গৌতমবুদ্ধ নিজের অসাধারণ প্রজ্ঞাবলে স্ব-গুরু মহাবীর বর্ধমানকেও অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন (Stevenson's Kalpasutra & Nave Tatwa, P. XIII)। এছাড়া মথুরায় খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ যে সব প্রাচীন জৈন শিলালিপি কিছুদিন আগে আবিষ্কৃত হয়েছে (Epigraphia Indica-Vol.1) এবং কটক জেলার উদয়গিরি ও জুনাগড়ের উপরকোঠ থেকে রুদ্রদাসারও পূর্ব্ববতী যে অতি প্রাচীন শিলালিপি সম্প্রতি খুঁজে পাওয়া গেছে (Indian Antiquary, Vol. XX P. 363-64) তা থেকে এটা অনায়াসেই প্রমাণ করা যায় যে জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মের বহুপূর্ব্বেই প্রচার লাভ করেছিল। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর জৈনদের অনেকগুলি গ্রন্থই বলছে—শকরাজের ৬০৫ বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৫২৭ অব্দে, শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর নির্বাণ লাভ করেছিলেন (জৈনগ্রন্থ ত্রিলোক সার এবং Indian Antiquary Vol. XII, p. 21 ff. তাহলে—বৌদ্ধ ধর্ম যে জৈনধর্মের পরে তার প্রমাণ তো পেলেন আপনি। এবার আসছি শিবের ব্যাপারে। শিবের আবির্ভাব যে বুদ্ধদেবের পরে নয়, তার প্রমাণ তো বেদ গ্রন্থই। বুদ্ধের প্রধান বিরোধ ছিল বেদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গেই। সুতরাং বেদ নিশ্চয়ই রচিত হয়েছিল বুদ্ধ জন্মের অনেক আগেই। আর সেই বেদেই যখন আমরা পাচ্ছি শিবকে নানাভাবে,

তখন শিব অবশ্যই বুদ্ধ পূর্ব ভারতে বর্তমান ছিলেন। তাছাড়া বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থ ললিতবিস্তরে কেবল যে জৈনের উল্লেখ আমরা দেখতে পাই অনেক জায়গায় তাই নয়, ঐ ললিতবিস্তরেই স্পষ্টভাষায় একথাও লিখিত হয়েছে যে, বুদ্ধের জন্ম মুহূর্তে তাঁকে শিব, ইন্দ্র এবং সূর্য্যের প্রতিমা দেখানো হয়েছিল। এখন আপনাকে আমার জিজ্ঞাস্য রায়মশাই, শিবের আবির্ভাব যখন বুদ্ধের বহু পূর্বেই, তখন শিব বুদ্ধদেবের নকল করে ধর্মপ্রচার করেছেন—এমন একটা আজগুবি কথাকে আপনি বিশ্বাস করে বসে রইলেন কী ভাবে?'

মায়ির কথায় এবার অকস্মাৎ ভয়ানক উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন ডাক্তার। রোষবিকৃত মুখে তিনি সজোরে বলে উঠলেন—আজগুবি কথাকে কেবল আমিই বিশ্বাস করি নে, আজগুবি কথাকে বিশ্বাস করে আপনার নয়নের মণি ঐ নান্দী পাগলও। ও বলে কি জানেন? শিবকে মস্ত বড় চিকিৎসা বিশারদ বলে প্রমাণ করার মতলবে নান্দী বলে সুশ্রুত নাকি চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করেছিল আসলে শিবেরই কাছ থেকে।

অপালা লক্ষ্য করলো—বৃদ্ধের অভব্য মন্তব্যে, মুহূর্তের জন্যে মাতাজীর দুই চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ফুটে উঠল যেন। কিন্তু তা কেবল পলকের মতই পরক্ষণেই নিজেকে সম্পূর্ণ শান্ত করে নিয়ে বললেন তিনি সহজ সুরে—'এক্ষেত্রেও মনে হয় নান্দীবাবা খুব ভুল কিছু বলেনি। গরুড় পুরাণে আছে—সমুদ্রমন্থনের সময় ধন্বন্তরি উৎপন্ন হন। পরে তিনি দেবতাদের রোগযন্ত্রণা থেকে রক্ষা করার জন্যে বিশ্বামিত্রপুত্র সুশ্রুতকে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে উপদেশ দেন (গরুড় পুরাণ, ১৫ অঃ)। ওদিকে মহাভারতে শিব সহস্রনামে শিবকেই ধন্বন্তরি বলা হয়েছে—ধন্বন্তরি ধূমকেতুঃ স্কন্দো বৈশ্রবণ স্তথা। আবার এধারে ভাবপ্রকাশও বলেছে—সুশ্রুত তৎকালীন শৈবধর্মের প্রাণকেন্দ্র কাশীধামে গিয়ে দিবোদাস নামে যে ক্ষত্রিয় রাজার কাছ থেকে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেছিলেন তিনি আসলে ধন্বন্তরিই। ইন্দ্রের ইচ্ছায় ধন্বন্তরিই কাশীধামে দিবোদাসরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মহাভারতের বর্ণানুযায়ী শিবই যখন ধন্বন্তরি, তখন সুশ্রুত যে শিবের কাছ থেকেই অর্জন করেছিলেন আয়ুর্বেদের জ্ঞান—সেটা বিশ্বাস করায় আপত্তির কি থাকতে পারে। তবে এসব ক্ষেত্রে বিচার বিশ্লেষণ করতে যখন যাওয়া হবে, তখন প্রাচীন শাস্ত্রের অনেক রূপককেই বাদ দিয়ে ঐতিহাসিক বাস্তবটুকুই কেবল গ্রহণ না করলে বেদ, পুরাণ এর ঐতিহাসিক মূল্যায়ণে ভূল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। দেশীবিদেশী সমস্ত চিন্তাশীল সত্যসন্ধ ইতিবৃত্ত বেত্তারই মত অনেকটা এই রকমই।

কিন্তু মহাদেব যে সত্যিই চিকিৎসা শাস্ত্রে এক মহাপণ্ডিত ছিলেন এখবরটি আপনারা পেলেন কোত্থেকে? বৈদ্যনাথধামের ঘাড়বাঁকা ঐ লিঙ্গটির নামমহিমাই বোধহয় এমন একটা অদ্ভুত আবিষ্কারে উৎসাহিত করেছে আপনাদের?

'না। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋকবেদেই বারংবার মহেশ্বরের অসামান্য চিকিৎসাশক্তির

কথা উল্লেখিত হয়েছে। বৈদিক যুগের ঋষিরা প্রাচীন ঋক্ মন্ত্রে মহাদেবকে 'ভিষকতমং' অর্থাৎ ভেষঝ বিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ (২।৩৩।৪) বলে অভিহিত করে তাঁর কাছে রোগ থেকে মুক্ত রাখার জন্য (২।৩৩।২) এবং বীরগণের দেহ কার্য্যক্ষম করে দেবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করতেন। ঋগ্বেদের বহু স্থানেই বলা হয়েছে—রুদ্র বা শিব প্রত্যেক রোগের নিশ্চিতফলপ্রসূ ওষুধের ব্যবস্থা করে দেন (৫।৪২।১১) সহস্র সহস্র ওষুধ তাঁর সুবিদিত (৭।৪৬।৩); শ্রেষ্ঠ সুনির্বাচিত ওষুধ সততই তাঁর হাতে থাকে (১।১১৪।৫) তাঁর হাতের গুণে সর্বরোগ আরোগ্য হয়, তাঁর ওষুধের গুণে লোক শতবর্ষ জীবিত থাকে (২।৩৩।২)। কেবল কি এই? শল্য চিকিৎসারও তিনিই যে আদিগুরু ছিলেন তারও প্রমাণ আমরা বহুভাবেই পাই 'বেদ এবং পুরাণের মধ্য দিয়ে। ঐ যে একটু আগে বললাম—ঋষিরা তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাতেন বীরগণের দেহ কার্য্যক্ষম করে দেবার জন্য এর অর্থ আর কিছুই নয়, বীর অর্থাৎ যোদ্ধাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যখন সময়ে সময়ে অকেজো হয়ে পড়তো তখন মহাদেবই শল্য ব্যবস্থায় সেই অক্ষম অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আবার কর্মক্ষম করে তুলতেন অনায়াসে। দক্ষ যজ্ঞের পর যখন পিনাক পাণি, মহাদেব শিরচ্ছেদন করে ফেললেন দক্ষের, এবং দেবাদিদেবের দুরন্তবীর্য্য এবং অমোঘ প্রভাব প্রত্যক্ষ করে মৃত্যুভয়ে ভীত দেবতাকূল যখন ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁর স্তব স্তুতিতে প্রবৃত্ত হলেন তখন, পুরাণ-ইতিহাস বলছে, আশুতোষ অচিরে তুষ্ট হয়ে সকল দেবগণের অঙ্গের ক্ষতি তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করে দিলেন। যাদের যে যে অঙ্গ বিনষ্ট হয়েছিল, মহাদেবের শল্য চিকিৎসার প্রভাবে তাঁরা আবার তাঁদের সেই সেই অঙ্গের স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাছাড়া, শিবকে যে অধিকাংশ সময়েই দেখা যেত শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়াতে, পচা মড়া ঘাঁটতে নাকে কাপড় না দিয়েই, তারও কারণ তো কেবল শরীরতত্ত্ব আর মর্মস্থান অনুসন্ধান করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনারা যে অ্যানাটমি আর ফিজিওলজি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেছেন মেডিকেল কলেজের ঘরে রাখা কোন মৃতদেহ ডিসেকশন করে, বৈদ্যনাথকে তাই করতে হয়েছিল শ্মশানভূমিতে গলিত পরিত্যক্ত শব ঘেঁটে ঘেঁটে।'

'তা শিবের চেলা সুশ্রুত কী এমন দিয়ে গেছে পৃথিবীকে—যার জন্যে আজ পর্য্যন্ত আপনারা শিব সুশ্রুত চরককে নিয়ে এমন মাতামাতি করছেন। গাঁজার রস আর গাধার পেচ্ছাপ এই তো তাদের দেওয়া সব মহৌষধ?'

সন্ন্যাসিনী হেসে ফেললেন। বললেন—কী দিয়ে যাননি তাঁরা বলুন। নিদান (Pathology), শল্য চিকিৎসা (Surgery), ভেষজ বিদ্যা (Pharmacology) শরীর ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা (Anatomy), শরীর বিজ্ঞান (Physiology), শিশু চিকিৎসা (Pedriatrics), ধাত্রী বিদ্যা (Midwifery), ভেষজ ব্যবস্থা পদ্ধতি (Medical jurisprudence), বিষযন্ত্র (Toxicology), রসায়ণ (Chemistry), বাজীকরণ

(Aphrodisiac), চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই সবকটি শাখা-প্রশাখার ওপরেই আয়ুর্বেদে পৃথক পৃথক মৌলিক গ্রন্থ আছে। আয়ুর্বেদের এই বিরাট জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে ধার নিয়েই তো গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্যের আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান।'

—'দেখুন মাতাজী, কিছু মনে করবেন না, একটা অর্ধোন্মাদ যুবকের পক্ষাবলম্বন করে অকারণেই আপনি কতকগুলো মনগড়া কথা আমায় শুনিয়ে চলেছেন। কে বলেছে আপনাকে আয়ুর্বেদই হচ্ছে আজকের ইউরোপীয় চিকিৎসা পদ্ধতির জনক? বিদেশী ঐতিহাসিকরা অনেকেই লিখেছেন—গ্রীকরাই হচ্ছে ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্মদাতা।

'কিন্তু ভারত বিদ্বেষী বিদেশী ঐতিহাসিকরা যে গ্রীকদের আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের শ্রষ্টা বলে ঘোষণা করেছেন, সেই গ্রীকরাই যে অকুণ্ঠ চিত্তে বারবার স্বীকার করেছে ভারতের ঋণ। 'গ্রীক ঐতিহাসিক নিয়ারকাস (Nearcus) বলছেন, গ্রীক চিকিৎসকগণ সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে চিকিৎসা করে বাঁচাতে পারতেন না, কিন্তু হিন্দু চিকিৎসকবৃন্দ তা পারতেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Arian লিখেছেন, গ্রীকরা অসুস্থ হলে হিন্দু ব্রাহ্মণদের শরণাপন্ন হতেন। তাঁরা আশ্চর্য উপায়ে চিকিৎসা-সাধ্য সকল রোগই আরোগ্য করে দিতেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রীসের ডিওসকরাইডিস্ (Dioscorides) একখানি ভেষজ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের কিংস কলেজের অধ্যাপক Dr. Royle তাঁর প্রবন্ধে ডিওসকরাইডিসের সেই গ্রন্থ আলোচনা করে এটাই প্রতিপন্ন করেছেন যে, উক্ত গ্রীক গ্রন্থকার Dioscorides তাঁর পূর্ববর্তী প্রাচীন হিন্দুগণের চিকিৎসা গ্রন্থ থেকে বহু তথ্য গ্রহণ করেছেন। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, খৃষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দেও ভারতে চিকিৎসা শাস্ত্রের মান বিশেষ উন্নত ছিল। আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে ডাঃ রায়, কেবল গ্রীস নয়, মিশর এবং পারস্যও ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে অনেক ভাবেই ঋণী। অষ্টম শতাব্দীতে হারুণ-অল-রসিদের শাসনকালে আরবে চরক আর সুশ্রুতের গ্রন্থ অনুবাদ করা হয়েছিল।'

ভারততত্ত্বের ওপর অনুপম-লাবণ্যনির্ঝর সন্ন্যাসিনীর অপরিমেয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়েও এতক্ষণ পরম বিস্ময়ে নির্বাক হয়েই শুনছিল অপালা ওঁদের আলোচনা। এবার হঠাৎ সে কথা বলল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে মাতাজীর পানে চেয়ে সে বলেই ফেলল—'এত পড়াশোনা করার সুযোগ আপনি কেমন করে পেলেন মায়ি?

স্নেহসিক্ত স্বরে তৎক্ষণাৎ জবাব এল—'আমি আর কতটুকু জানি মা! এসব ব্যাপারে নান্দীবাবার জ্ঞান যে কত গভীর—ওর মুখের কথা না শুনলে তা বিশ্বাস করতেও পারবে না কেউ।' সন্ন্যাসিনীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন ডাক্তার রায়। বিতর্কের সময় তাঁর কূপমণ্ডুক জ্ঞান এতক্ষণ এক সামান্য গৈরিকধারিণী ঝোপরিবাসিনীর প্রত্যয়দীপ্ত জ্ঞান গভীরতার কাছে

যতবারই পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছিল, ততবারই তাঁর বিদেশী শিক্ষার অহঙ্কার পদাহত ভূজঙ্গের মতন ফোঁস ফোঁস করে উঠছিল অন্তরে। এখন সেই গৈরিক পরিহিতার মুখে আবার নান্দীবাবার সুখ্যাতি শুনে, বোধ করি, পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার দুর্বিনীত প্রয়াসেই, অত্যন্ত জঘন্য একটা কাণ্ড করে বসলেন বিলিতি ডিগ্রীধারী অশীতিপর চিকিৎসক। রুচিবিগর্হিত ভঙ্গিতে গাঁক গাঁক করে উঠলেন তিনি—'ছেলেটাকে বুঝি নিজের ভৈরব বানিয়েছেন ভৈরবী? তাই, ওর ওপর আপনার এত দরদ, ওকে মস্ত একটা কিছু প্রমাণ করার জন্যে তাই আপনার এমন চেষ্টা?

খাট ছেড়ে ধীরে ধীরে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবার আশামায়ি। অপালা স্পষ্ট দেখতে পেল দুই চোখে তাঁর দাবানল জ্বলছে দাউ দাউ করে, দেহের সমস্ত রক্ত এসে জমেছে যেন তাঁর মুখে। উত্তেজনাকম্পিত সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠে গর্জে উঠলেন তিনি অকস্মাৎ—'কী কইলা তুমি আমারে ডাক্তার? নান্দীবাবারে ভৈরব বানাইছি আমরা? বরিশালের আশালতারে তুমি চিনবার পার নাই বুঝি আজও? আজ তবে ভাল কইর‍্যা চিনা যাও তারে। এই নাও, এই দ্যাখো—বলেই একটানে নিজ অঙ্গবস্ত্র খুলে ফেলে দিলেন সন্ন্যাসিনী দূরে। তারপর নগ্নকটীদেশের দক্ষিণ পাশে কিসের ওপর যেন হাত ঠুকে ঠুকে অদ্ভুত একরকম শব্দ সৃষ্টি করতে লাগলেন খট্ খট্ করে। ভালভাবে নজর দিতেই অপালা বুঝল ওটা একটা ছোট্ট তালা। সেই তালারই ওপরে হাত ঠুকতে ঠুকতে বলতে লাগলেন আশামায়ি—'কি পইর‍্যা আছি দেখবার পাও না। অ্যারে কয় তামকোপনী। কাপড়ের কৌপনী তো অনেকেই দ্যাখস, তামার কৌপীনের নামটাও বোধহয় শোন নাই কখনও। আজ দ্যাখ, ভাল কইর‍্যা দেইখ্যা নাও। অ্যার সামনে পিছনে ক্যাবল দুইটা ফুটা। প্যাচ্ছাপ, পায়খান বন্ধ কইর‍্যা তো আর কেউ বাঁচবার পারে না, তাই। এই তামকৌপীনের তালাটায় চাবী লাগান! এর চাবী কার কাছে আছে জন? আমার গুর্বীর কাছে। গুর্বী থাকেন কামাখ্যা থেইক্যা দেড়শো-দুইশো মাইল দূরের এক পাহাড়ের গুমফায়। তের বৎসর যখন বয়স আছিল, সেই সময় তামকোপনী পরাইয়া তালা লাগাইয়া গুর্বী আমারে ছাইর‍্যা দিছেন হিমালয়ে। বত্রিশ বৎসর হিমালয়ের সব শিবতীর্থ পরিব্রাজন আর সাধন শ্যাষ হইলে গুর্বীর কাছে যখন ফির‍্যা যামু, তখন তিনি এই তালা খুইল্যা আমারে তামকোপনীর বন্ধন হইতে মুক্ত করবেন। এখন আমার তেতাল্লিশ বৎসর বয়স। আরও দুইটা বৎসর এই তামকোপনী পইর‍্যাই থাকতে হইব। জীবনের তেতাল্লিশটা বৎসর যে মাইয়্যা তামকোপনী পইর‍্যা কাটাইল, তার লগে তুমি মস্করা করবার আসছ? তারে কও সে নান্দীবাবারে ভৈরব বানাইছে? তোমার সাহসটা তো কম নয় ডাক্তার! এই পর্যন্ত বলে, দুই চক্ষুর রোষাগ্নিবাণে রায়ের সর্বাঙ্গ বিদ্ধ করতে করতে, আশামায়ি ঠক-ঠক ঠক-ঠক শব্দ করেই চললেন তাম্র-কৌপীনের তালাটির ওপর হাত ঠুকে ঠুকে। এ বুঝি তাঁর কামজয়ের তূর্যনাদ।

।। পাঁচ ।।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ হলে, আশামায়ি হাসিমুখে এসে অপালার শয্যায় বসে সস্নেহে ডাকলেন—'মা অপালা!' চমকে উঠে তাকাল অপালা মাতাজীর মুখের দিকে। কোথা থেকে নাম জানলেন তার? সে এখানে কাউকে বলেনি তো তার নাম। 'অবাক হচ্চ, না?' মাতাজী বললেন—'ভাবছ, কেমন করে জানলাম তোমার নাম অপালা গাঙ্গুলী?' পুনশ্চ একটু হাসলেন, তারপর আবার বলতে শুরু করলেন। 'নান্দীবাবাকে তুমি হয়তো এখনও ঠিক চিনে উঠতে পারোনি, ও কিন্তু কাল রাতেই আমাকে সব খুলে বলেছে। এমন একটি ছেলেকে জীবনের সর্বস্ব করে নেবার তপস্যায় যে তুমি রত রয়েছ আজকের এই সম্ভোগোম্মাদ লঘুচিত্ততার দিনেও, বয়সে অনেক ছোট হলেও—এর জন্যে তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধার আর সীমা নেই।'

ধড়মড় করে উঠে বসে বিস্ময়বিহ্বল স্বরে প্রশ্ন করল অপালা—কে এই নান্দীবাবা মায়ি? কি তার পরিচয়?

'জয়ন্ত।'

'জয়ন্তদা? যার জন্যে গত আট বছর আমি—' বাক্য রূদ্ধ হয়ে গেল অপালার একই সঙ্গে উদ্ধত আনন্দ এবং অভিমানের নিদারুণ উচ্ছ্বাসে।

'আমি জানি অপালা!' জয়ন্ত তো শিবেরই অপর নাম! উমার মতই এই আপনভোলা স্বপ্নেমগন শিবটিকে জয় করার সাধনায় কত কষ্ট কত ত্যাগই না মাথা পেতে নিয়েছ তোমার জীবনে। কিন্তু এখনও যে আর কিছুদিন ধৈর্য্যের বাঁধকে তোমার অটুট রাখতেই হবে, মা।'এখন বেশ বুঝতে পারছে অপালা কেন নান্দীবাবার হাসি, কথা বলার ভঙ্গি তার হৃদয়ের এক অতি স্পর্শকাতর তন্ত্রীতে বারবার আলোড়ন সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল ওদের আলোচনার সময়ে। নান্দীই তবে তার জয়ন্ত? কিন্তু কি আশ্চর্যরকমভাবে ও নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে পেরেছে ঐ দাড়ি, ঝাঁকড়া চুল, টুপী আর গাড়োয়ালী পোশাকের আড়ালে। আশামায়ির কথার উত্তরে অপালা শান্ত কণ্ঠেই বলল—'ধৈর্য্যের বাঁধ আমার এখনও তো অটুটই রয়েছে মায়ি। এ বাঁধ যে সেই দিয়েছে আমার মনে। এ কি সহজে ভাঙ্গতে পারে?'

'জয়ন্ত শিবের দেওয়া তন্ত্রশাস্ত্রের আসল পুঁথিগুলির সন্ধানে ব্রতী। কিছু কিছু পুঁথি সে অনেক বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েও খুঁজে বের করেছে এরই মধ্যে। ওর বিশ্বাস এই তন্ত্রশাস্ত্রের পুরোটাই যেদিন সে উদ্ধার করতে পারবে, বিশ্ব জেনে অবাক হবে যে, আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে ঋগ্বেদের কাল এবং অথর্ব বেদের কালের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে যে তন্ত্রধর্ম এই ভারতে প্রবর্তন করেছিলেন তুষার মৌলী কৈলাসাঞ্চলের মহামানব রুদ্র, তা কোন সম্প্রদায় বিশেষের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল না, তা ছিল সত্যিকারের এক মানবসমাজ হিতৈষী ধর্ম, উচ্চ-নীচ ভেদহীন সাম্যের ভিত্তিতে গড়া এক নতুন সমাজতন্ত্র'।

'কিন্তু হাজার হাজার বছর আগেকার পুঁথি এখনও কি নষ্ট হয়ে যায়নি?'

'যখন কোন পুঁথি নষ্ট হতে বসত, তখন সেই পুঁথিকেই হুবহু নকল করে তুলে নেওয়া হত টাটকা ভুর্জ অথবা তালপত্রে। এমনিভাবেই তো প্রাচীন পুঁথিরক্ষার রীতি চলে আসছে বংশপরম্পরায় এদেশে।'

কিন্তু আজকাল তো তান্ত্রিকদের কেউই ভাল চোখে দেখে না। শিবের অনুচরদের সেকালেও তো ব্রাত্য বলে ঘৃণার চোখেই দেখত সকলে!

তুমি কোন্ কালের কথা বলছ বলো তো? বোধ হয় লাট্টায়ন শ্রৌতসূত্রের যুগের। তুমি ঠিকই বলেছ মা, লাট্টায়ন শ্রৌতসূত্রে (৮।৬।২, ৭,৮) এবং কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রেই (২২।৪।৩) প্রথম শুরু হয় ব্রাত্যদের হীন প্রতিপন্ন করার প্রয়াস। কিন্তু সেতো বৈদিকযুগের অনেক পরেরকার কথা। অথর্ব বেদের পঞ্চদশ কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের সপ্তম পর্যায় সূক্ত কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে। সেখানে আছে—তং প্রজাপতিশ্চ পরমেষ্ঠী চ পিতা চ পিতামহশ্চাপশ্চ শ্রদ্ধা চ বর্ষ ভূত্বানুব্যহবর্তয়ন্ত (১৫।৭।২), অর্থাৎ ব্রাত্য পুরুষই যজ্ঞ শ্রদ্ধা প্রজাপতি পরমেষ্ঠী পিতা পিতামহ প্রভৃতির লক্ষীভূত বিষয়। আর, দ্বিতীয় অনুবাকের অষ্টম পর্যায় সূক্ত পাঠ করলে তো ব্রাত্যপুরুষকে সেই বিরাট পুরুষ অর্থাৎ পরব্রহ্মেরই নামান্তর ব্যতিত অন্য কিছু বলেই মনে হয় না।'

মুহূর্তের জন্য নীরব হলেন মায়ি। তারপর আবার বললেন—'তান্ত্রিকদের আজকাল আর কেউ ভাল চোখে দেখে না বলে দুঃখ করছিলে তুমি। কেমন করে ভাল চোখে দেখবে বলো? মহাশক্তিধর যুগপ্রবর্তক শিব তাঁর দীর্ঘদিনের গবেষণায় পাওয়া যে নতুন এক সমাজ-বিধান—সেই সুপ্রাচীন যুগের বৈদিক কর্মকাণ্ড-সর্বস্ব ব্রাহ্মণদের অবজ্ঞা, অবহেলা এবং অত্যাচারে জর্জরিত দুর্ভাগা সাধারণ মানুষগুলির জন্য এনেছিলেন—তা ছিল ব্যক্তিপূজা বিরোধী ধনীকূলদ্রোহী একনায়কত্ব বিদ্বেষী, তখনকার সংস্কারান্ধ যুগের এক বিস্ময়কর সাম্যবাদ। আর্যসমাজে তখন ব্রাহ্মণদের সর্বব্যাপী প্রতাপ। যা কিছু পুণ্যকর্ম—একমাত্র ব্রাহ্মণরাই ছিলেন তার অধিকারী। এমনকি বেদেও অধিকার ছিল না দ্বিজ যারা নয়, তাদের। আর্য রাজারা বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সভ্যতার অহঙ্কারে অনার্য শূদ্র, দস্যু, রাক্ষস, দানব আখ্যা দিয়ে এই ভারতেরই প্রাচীন সভ্য প্রতিবেশীদের ওপর নানাভাবে নিপীড়ন ও অনাচার চালাতে আরম্ভ করেছিলেন সোমরস আর সোমরস-রসিকাদের নিয়ে আত্মঘাতি বিলাসব্যসনে প্রমত্ত হয়ে। পক্ষান্তরে, শিব-প্রবর্তিত তন্ত্রধর্মে উচ্চ, নীচ জাতিভেদ ছিল না, সর্বক্ষেত্রে ছিল নরনারীর সমান অধিকার। তাই, আমরা দেখতে পাই—শৈবতন্ত্রকে সর্বপ্রথম ভারতের বহু বিস্তৃত অবহেলিত অনার্য সমাজই গ্রহণ করেছিল সাদরে বরণ করে, ঠিক যেমন আজকের সাম্যবাদকে সর্বাগ্রে, সহস্র প্রাণের বিনিময়েও, স্বাগত জানিয়েছিল বিলাসোন্মত্ত জারের (Czar) শাসনে শোষিত নিষ্পেষিত রাশিয়াবাসীরা। অনার্য, পতিত, অবহেলিতরা শিবকে শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত। শিবের দেওয়া তন্ত্রের জন্য তারা জীবন দিতেও প্রস্তুত

ছিল সর্বদা। কুলার্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে—ধন দেবে, স্ত্রী দেবে, আপনার জীবন পর্যন্ত বলি দেবে, কিন্তু এই গুহ্য শাস্ত্র (Mystic Doctrine) তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে দেবে না কাউকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আজ তন্ত্র বলে যেটা চালানো হচ্ছে—সেটা তো কামোন্মাদ কতকগুলো ভ্রষ্টাচারীর নির্লজ্জ যৌনাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। আর সেই কারণেই তো তন্ত্র তান্ত্রিক বর্তমানে কারুর দৃষ্টিতেই শ্রদ্ধার বস্তু নয়।' 'সেই আসল তন্ত্রশাস্ত্র এখন কোথায় আছে মায়ি?' অপালার কৌতূহলী প্রশ্ন। 'তার সন্ধানেই তো ডুবে আছে নান্দীবাবা আটটি বছর ধরে। শিবানুচর নন্দীর নামে ও নিজের নামকরণ করেছে। কিন্তু পাহাড়ীদের উচ্চারণে ঐ নন্দীই হয়েছে নান্দীতে পরিণত। ছেলেটা মাঝে মাঝে রাগে গম্ গম্ করতে করতে বলে—'আমি তো নন্দীই। যে নন্দী দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা শুনে দক্ষপ্রজাপতি আর তাঁর সমর্থক ব্রাহ্মণদের একাই বুক চিতিয়ে অভিসম্পাত করেছিল (শ্রীমদ্ভাগবত, ৪ স্কন্ধ, ২ অঃ)। আজও সেই অভিসম্পাতই বর্ষণ করে চলেছি আমি সেই সময়কার আত্মবিস্মৃত আর্যদের উদ্দেশে যারা অনন্যকর্মা, অতুল্যপ্রতিভা মহেশ্বরের প্রবর্তিত তন্ত্রশাস্ত্র পর্যন্ত লোপাট করে চালান দিয়েছিল ভারতের বাইরে—তাঁর প্রতি ঈর্ষা আর বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে।'

ক্ষণেকের বিরতির পর আশামায়ি আবার সবাক হলেন। 'বেচারী আর্যরা কল্পনাও করেনি যে সদ্যাবির্ভূত সেই গোত্রপরিচয়হীন অনার্য উলঙ্গ সর্বভূষণ শ্মশানচারী প্রবর্তিত তন্ত্রধর্ম একদিন আর্যদের এতবড় প্রাকৃত দেবতামণ্ডল ও ঋষিপরিপুষ্ট বৈদিক ধর্মকে কোণঠাসা করে, অচিরে দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়বে কেবল ভারতের আসমুদ্রহিমাচলেই নয়, সুদূর মিশর, আরব, চীন এমনকি আমেরিকা ও ইউরোপেও কেবলমাত্র তার মানবপ্রেমভিত্তিক সাম্যবোধের গুণে।'

'বলছেন কি মায়ি? শিবের পুজো তাহলে ভারতের বাইরেও হত?'

'হত বৈকি মা। মিশরে শিবলিঙ্গ পূজার চল কিছুদিন আগেও ছিল। মিশরের শিবের নাম ওসীরিস্। শিব আর ওসীরিস উভয়েরই শিরোভূষণ হচ্ছে সাপ। শিবের ত্রিশূলের মত ওসরীরিসের হাতেও দেখা যায় একটা ত্রিফল যুক্ত দণ্ড। ওসীরিসের অনেক পাষাণময় প্রতিমূর্তির সঙ্গেই মহাদেবের ব্যাঘ্রচর্মপরিহিত মূর্তির হুবহু মিল আছে। মিঃ উইলকিন্সের রচিত প্রাচীন মিশরবাসীর ইতিহাস নামক গ্রন্থে বাঘের চামড়া পরা ওসীরিসের ফটো মুদ্রিত রয়েছে দেখতে পাবে। শিবের প্রিয় যেমন বেলগাছ, ওসীরিসের ঠিক তেমনি একটি প্রিয় বৃক্ষ ছিল—যে বৃক্ষের পত্র ঠিক বিল্বপত্রের মতই ত্রিধা বিভক্ত। কাশীধাম যেমন ভারতে শিবের প্রধান তীর্থ, মিশরের মেম্ফিস নগরও ছিল সেইরকম ওসীরিসের সর্বশ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্যক্ষেত্র। আমরা দুধ দিয়ে শিবের অভিষেক করি, ফিলিদ্বীপে ওসীরিসের পীঠস্থানেও সেইভাবেই প্রতিদিন তিনশো ষাট পাত্র দুধ অর্পণ করা হত। মহাদেবের ষাঁড়টির মত ওসীরিসের বাহনও একটি ষাঁড়ই। এই ষাঁড়ের নাম এপিস। মক্কায় যে মক্কেশ্বর লিঙ্গমূর্তি আছে, তা এককালে ছিল

ইসরাইলবাসীগণের উপাস্য দেবতা (ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মপর্ব)। বাইবেল পড়লে জানতে পারবে—যে হোবোয়ামের পুত্র আশা তাঁর জননী মায়াকাকে শিবলিঙ্গের সমক্ষে বলি দিতে নিষেধ করেছিলেন। পরে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ঐ লিঙ্গমূর্তি ভেঙে ফেলেন (1 Kings xv. 13)। ইহুদীগণ সোৎসাহে লিঙ্গরূপী দেবতা বেলফেগোর গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষিত হতেন। মদিনাবাসীগণ ফেগোর পর্বতাস্থিত সেই লিঙ্গেরই উপাসনা করতেন। জুডা (Judah)-বাসীগণ Baal নামক লিঙ্গমূর্তির পূজা করতেন। তাঁরা প্রতি অমাবস্যায় ঐ লিঙ্গমূর্তির সম্মুখস্থ বৃষের সামনে ধূপ-ধুনা জ্বালাতেন পুজোপহার দিতেন। বাল (Baal) লিঙ্গসম্মুখস্থ ঐ বৃষটি হিন্দুদের সত্বগুণপ্রধান বালেশ্বর শিবলিঙ্গের সামনেকার ধর্মরূপী বৃষভমূর্তিরই অনুরূপ। সুপ্রসিদ্ধ ইতিবৃত্তকার কর্নেল টড্ লিখেছেন—আরবীয় দেবমূর্তি লাভ বা অলহাতের সঙ্গে শিবলিঙ্গের পুরোপুরি মিল রয়েছে। রোমক জাতির প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই লিঙ্গোপাসনা আরব থেকে ফ্রান্সে গিয়েও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নিসমেস নগরীর প্রসিদ্ধ সার্কাসগৃহে, ইতালীর সুপ্রাচীন ধর্মমন্দিরসমূহে, টলৌস নগরের গির্জায় এবং বুর্দোর কয়েকটি ধর্মমন্দিরে এখনও ঐ শিবলঙ্গি মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। প্লুটার্কের মতে, Ptah Sokari মূর্তিটিও একটি শিবলিঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু নয়। গ্রীকরাও ফলেশ (ফল + ঈশ) লিঙ্গে পুজো করতেন। শিব সিদ্ধি বা ফলদাতা, তাই তাঁর একটি নাম ফলেশ। গ্রীকগণ এই ফলেশ লিঙ্গমূর্তিকেই Phallus নাম দিয়ে পুজো করতেন ঘরে ঘরে। আমাদের এখানে যখন শিবরাত্রি হয়, সেই সময়ের কাছাকাছি অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি Phallus লিঙ্গের মহোৎসব হত গ্রীসে (Tod's Rajasthan, Vol. 1, p. 603)। বাইবেলে যে লিঙ্গমূর্তির পুজোর কথা বলা হয়েছে, তার নামটিও শিউন (Chiun)—ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে শিবকে শিউজী নামে যেমন ডেকে থাকে অনেকেই। Egekiel x vi. 17, Amos v. 25–27 পাঠে আরো জানা যায় যে, ৯৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দেও আজকের মতই শিবলিঙ্গোপাসনা ও কপালে তিলকধারণ প্রচলিত ছিল। আমেরিকার পেরুভিয়া নামক স্থানে রামসীতোয়া মহোৎসব এবং সেখানকার নৃপতিবংশের সূর্যবংশোদ্ভবতার কথা অনেকেই জানে (পেরু শব্দের মানেও হচ্ছে সূর্য)। ঐ অঞ্চলের কয়েকটি জাতির ভাষায় ঈশ্বরকে বলা হয় 'শিবু'। আসিয়ার অন্তর্গত ফ্রিজিয়া নামের জনপদবাসীরা শেবা বা শেবাজিয়াস নামক দেবতার উপাসনা করে। ঐ দেবোপাসকগণ শিবসঙ্গী সর্পকে নিয়ে কয়েকটি অনুষ্ঠান করে থাকেন তাঁদের দীক্ষা গ্রহণের সময়। মিশরেও শেব্বা নামে আর একটি দেবতা পূজিত হতেন। এইসব নামগত বিস্ময়কর সৌসাদৃশ্য এবং সর্পগত প্রক্রিয়াদি অনুধাবন করলে, ব্যালমালদিভূষিত আমাদের শিবকেই কি মনে পড়ে যায় না? (Serpent and Siva Worship and Mythology in Central America and Asia by Hyde Clarke, p. 10–11)। যবদ্বীপ আর বালিদ্বীপে অবশ্য শৈবধর্ম গিয়ে পৌঁছয়—এর অনেক পরে, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্য থেকে

শিবোপাসনার উত্তাল তরঙ্গ গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছিল ঐ অঞ্চলে। আজও ওখানকার প্রস্বনন নামক স্থানে শিব, দুর্গা, গণেশ প্রভৃতির পাষাণময় ও পিত্তলময় মূর্তি অটুট রয়েছে কম করেও দুই কোটি দেবমন্দিরে। খৃষ্টিয় তৃতীয় শতকে আসাম এবং কম্বোজেও বিস্তারিত হয় শিবারাধনার দুরন্ত আবেগ। গ্রীসে ব্যাকাস্ (ব্যাকাস্ (Bacchus) নামটি ব্যাঘ্রেশ শিবেরই নামান্তর)। দেবের মহোৎসবে যে একশো কুড়ি হাত দীর্ঘ একটি স্বর্ণ নির্মিত শিবলিঙ্গ বহন করে নিয়ে যেতেন লিঙ্গপূজারীবৃন্দ—তার বর্ণনা পাই আথোনিয়াসের লেখনী থেকে (Athenaeus Lib. V.)। এই Bacchus দেবের চক্রপীঠে যে সমস্ত লিঙ্গমূর্তি আছে, তার সঙ্গে আমাদের দেশের কোটীশ্বর বা শেষলিঙ্গের আশ্চর্যরকম মিল দেখতে পাওয়া যায়। একটা প্রস্তরস্তম্ভে সহস্র থেকে লক্ষাধিক লিঙ্গ খোদিত করে কোটীশ্বর বা শেষলিঙ্গ মূর্তি নির্মিত হয়। আমাদের ব্যাঘ্রেশ মহাদেবের মতই ব্যাকাস্ ও ব্যাঘ্রাম্বরধারীরূপে বর্ণিত। লুসিয়ানের বিবরণ থেকে জানা যায় সিরিয়ার এক সুবৃহৎ মন্দিরে তিনশো ফ্যাদম্ উঁচু লিঙ্গ ছিল। প্রাচীন আসিরীয় ও ব্যাবিলন রাজ্যবাসীরা ৩০০ হাত দীর্ঘ শিবলিঙ্গের পুজো করতেন। ব্যাবিলন থেকে যেসমস্ত পিত্তলনির্মিত অতি প্রাচীন লিঙ্গমূর্তি পাওয়া গেছে তা অবিকল ভারতের শিবলিঙ্গের অনুরূপ (Jour Roy. As. Soc. of Great Britain and Iraland, Vol. I, P. 91–92)। এমন একদিন ছিল যেদিন গ্রীসের নগরগুলির প্রত্যেক পথেই মন্দিরে মন্দিরে শিবলিঙ্গ মূর্তি পূজিত হত। (G. A. St. John's Hist. of the manners and customs of ancient Greece, Vol. I, P. 411)।

অপালা জিজ্ঞেস করল—'আর তিব্বতে? যে তিব্বত থেকে শিব এসেছিল বলছেন, সেই তিব্বতে তো শিবপুজো হয় না! তিব্বতীদের অধিকাংশই তো শুনেছি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী!'

'এমনটিই তো ঘটে এসেছে চিরকাল, মা। বৌদ্ধধর্ম জন্ম নিল ভারতের মাটিতে, কিন্তু আজ তার সত্যিকার অস্তিত্ব খুঁজতে গেলে দৌড়তে হবে তোমায়, লঙ্কা, চীন, জাপান আর তিব্বতে। ইহুদীদের মধ্যে প্রথম নিজের ধর্মমত প্রচার করলেন যিশু—আজকে ক'জন ইহুদী খৃষ্টের পূজারী? অথচ খৃষ্টান এখন ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া—কোথায় না আছে? ঠিক এমনটিই ঘটেছিল শিবের প্রচারিত তন্ত্রধর্মের কপালেও। শিবের প্রচারিত বিপ্লবাত্মক ধর্মমত—বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল যখন, দেখা গেল, শিবের সাধনা, গবেষণা এবং মুখ্য আবাসস্থল তিব্বত তখন অন্য ধর্ম গ্রহণের জন্য ব্যাকুল। অবশ্য পুরাতত্ত্ব বলছে, শিবলিঙ্গ পুজো পেত এককালে তিব্বতেও। তিব্বত থেকেই ঐ লিঙ্গপূজা মনে প্রবেশ করেছিল চীন দেশে চীনা ভাষায় তিব্বতীয় শিবলিঙ্গগুলিকে বলা হত—হবঙ্-হি-ফুহ্। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে—তিব্বতীয় মহাপুরুষ যে বেদদ্রোহী ধর্ম প্রবর্তন করলেন—তা তিব্বতে রইল না, এলো ভারতে। আর ভারতীয় মহামানব বুদ্ধ যে বেদবিরোধী ধর্ম প্রচার

করলেন, ভারতে তার অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া কঠিন, অথচ সেই ধর্মই সাদরে, সাগ্রহে গ্রহণ করেছে তিব্বত। তবে, নানাভাবে বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে নান্দীবাবা যেমন ব্যাখ্যা করে, তা শুনে আমার মনেও একটা সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, অনার্য বুদ্ধদেব প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম অনার্য মহাদেবের প্রবর্তিত তন্ত্রধর্মের অনেক কিছুই নিঃশব্দে গ্রহণ করে বৌদ্ধতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল একদিন। মূল কল্পতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র নামে প্রাচীনতম বৌদ্ধতন্ত্র যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় শতাব্দীতে (খৃষ্টীয়) রচিত হয়। হিন্দুতন্ত্রে যেমন বামাচার ও দক্ষিণাচার, বৌদ্ধতন্ত্রেও তেমনি ক্রিয়াতন্ত্র, চর্যাতন্ত্র, যোগতন্ত্র প্রভৃতি চারটি বিভাগ আছে। হিন্দুতন্ত্রে যেমন আগম ও যামল নামে দুই বিভাগ, তেমনি বৌদ্ধতন্ত্রেও বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান নামে তিনটি প্রধান বিভাগ আছে। কালচক্রযানের বিস্তৃত দর্শন ও ইতিহাসে তিব্বতীয় ভাষায় সুপণ্ডিত রুশদেশীয় বৌদ্ধতত্ত্ববিদ্ ডঃ জর্জ রোরিক (George Roerich) যা লিখেছেন, তাতে নান্দীবাবার মতই যেন সর্বতোভাবে সমর্থিত বলে মনে হয়।'

'কিন্তু অনেককেই তো বলতে শুনেছি ঠিক উল্টো কথা, মায়ি! ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁর Introduction to Buddhist Esotericism' গ্রন্থে বলেছেন, হিন্দুতন্ত্র নানাভাবে বৌদ্ধতন্ত্রের কাছে ঋণী?'

সামান্য হাসির রেখা ফুটে উঠল সন্ন্যাসিনীর ওষ্ঠসীমায়। বললেন—'হিন্দুদের তন্ত্র যেমন শিবোক্ত, বৌদ্ধদের তন্ত্র তেমনি বদ্ধসত্ব বুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত। সবচেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ ললিতবিস্তর বলছে—তথাগতের জন্মলগ্নে শিব, বিষ্ণু এবং সূর্যের প্রতিমা দেখানো হয়েছিল তাঁকে। তাহলে শিব নিশ্চয়ই বুদ্ধের বহু পূর্বেই ভারতে প্রচার করেছিলেন তাঁর তন্ত্রধর্ম। আর একথাও তো বলেছি যে, প্রাচীনতম যে বৌদ্ধতন্ত্রে (মূল কল্পতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র) গ্রন্থদ্বয় আজ অবধি পাওয়া গেছে, সেদুটির রচনাকাল মাত্র সেদিন, খৃষ্টীয় প্রথম ও তৃতীয় শতকে। মৈত্রেয়নাথ যে বৌদ্ধতন্ত্র বা বজ্রযান স্থাপনা করেন, তাওতো খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দের আগে নয়। তাছাড়া, শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই শিবনিন্দায় উত্তপ্ত নন্দী যখন দক্ষ প্রজাপতি ও তার সমর্থক ব্রাহ্মণদের অভিসম্পাত দিল, তখন ভৃগু ক্রোধান্ধ হয়ে অভিশাপ দিয়ে বললেন নন্দীকে—

ভবব্রতধরা যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ।।

(যে সকল ব্যক্তি মহাদেবের ব্রত ধারণ করবে এবং যারা তাদের অনুবর্তী হবে, তারা সৎশাস্ত্রের প্রতিকুলকারী ও পাষণ্ডী নামে খ্যাত হোক)।

পদ্মপুরাণেও পাষণ্ডোৎপত্তি অধ্যায়ে লিখিত আছে—লোকদের ভ্রষ্ট করবার জন্যই শিব নামের দোহাই দিয়ে পাষণ্ডীরা অভিনব তান্ত্রিক মত প্রকাশ কেরেছে। তাহলে বেশ বোঝা যাচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবত এবং পদ্মপুরাণের মত প্রাচীন গ্রন্থ রচিত হবার অনেক

পূর্বেই হিন্দুতান্ত্রিক মত প্রবর্তিত হয়েছিল! তন্ত্রের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হয়েই না মনুটীকাকার কুল্লকভট্ট বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করেছিলেন—বৈদিকী তান্ত্রিকীশ্চৈব দ্বিবিধা শ্রুতিকীর্তিতাঃ, অর্থাৎ কুল্লকভট্টের মতানুসারে তন্ত্রকেও বেদই বলা চলে।'

।। ছয়।।

পুরো আটটি বছর যার সন্ধানে উন্মাদিনীর মত ঘুরে বেড়িয়েছে অপালা, হিমালয়ের বিভিন্ন প্রান্তে, তার দর্শন যদি বা পেলো সে—কিন্তু তাঁর সঙ্গে একটি কথা বলারও সুযোগ হয়নি এখন পর্যন্ত। তিনদিন হয়ে গেল ভৃগুগ্রামে গেছে জয়ন্ত, আজও ফিরে আসেনি। ভরা শ্রাবণের ঘনঘটার মধ্যেও অপালার মন-বনে বইতে শুরু করেছে স্বপ্নেবিভোর ফাল্গুনের হাওয়া। কত কথা জমে আছে বলার, কত কথা বাকী আছে জানার। গতকাল তাকে নিয়ে উত্তরকাশীতে গিয়েছিলেন আশামায়ী গভর্নমেন্ট হাসপাতালের ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করাতে। সেখানেই তার দেখা হয়েছে সিভিল সার্জন ডাঃ পদ্মনাভ বোসের সঙ্গে। অকৃতদার শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত মহাযুদ্ধ-ফেরত ডাঃ বোসকে স্থানীয় লোকেরা বলে দেবতা। উজেলিতে ব্রাহ্মস্বরূপানন্দকেও প্রণাম করে এসেছে অপালা। আগে যিনি রামকৃষ্ণ মিশনে ছিলেন, এখন সারা উত্তরকাশীর পাহাড়ী অধিবাসীবৃন্দের হৃদয়-রাজ্যের যিনি হচ্ছেন মুকুটবিহীন একছত্র রাজা। পঞ্চপাণ্ডবকে পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল যে জতুগৃহে, সেই জতুগৃহের ধ্বংসাবশেষে গিয়ে বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে দেখেছে অপালা। প্রায় দেড়শো বছর বয়সেও কী আশ্চর্য দেহ ও স্বাস্থ্যের অধিকারী সম্পূর্ণ উলঙ্গ জাঠ তপস্বী রামানন্দ অবধূত। এরপর আশামায়িই পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তাকে আর একজন মহিয়সী যোগসাধিকার সঙ্গে—পাঞ্জাবের সিদ্ধক্ষেত্রতে নিয়ে গিয়ে। নাম তাঁর ধর্মবতী। বিরাট ঐশ্বর্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেও যে পাঞ্জাবী মহিলা আশৈশব ত্যাগব্রতে ব্রতিনী। শেষে ভাটোয়ারীর পথে আরও কিছুটা এগিয়ে এক গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে এক অভাবিতপূর্ব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়েছিলেন সন্ন্যাসিনী তাকে। সুউচ্চ এক আখরোট বৃক্ষের মোটা ডালে ঝুলন্ত প্রকাণ্ড এক মৌচাকের নীচেকার মাটিতে মুখ হাঁ করে বসে আছেন তালিমারা হাফপ্যান্ট আর ময়লা ফতুয়া পরা এক শ্বেতাঙ্গ বৃদ্ধ। বহু পুরাতন মৌচাক থেকে বহুদিনের জমে ওঠা মধু চাকের কোটর থেকে উপচে পড়ছিল ফোঁটা ফোঁটা করে। সেই মধুর ফোঁটাই মুখগহ্বরে পরমধৈর্যসহকারে গ্রহণে ব্যস্ত বৃদ্ধ মানুষটি। নাম বললেন উইলহেল্‌ম শ্লেগেল। রক্তে জার্মান। এঁরই সঙ্গে মার্লোর কাননে প্রথম দেখা হয়েছিল নাকি জয়ন্তর। ইনিই নাকি জয়ন্তের কানে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন শিবানুসন্ধানের সাংঘাতিক মন্ত্র। প্রতি বছরই স্বদেশ থেকে কয়েক মাসের জন্যে এসে ঘুরে বেড়ান হিমাদ্রিপ্রদেশের অরণ্যে, পর্বতে। এককালের প্রথিতযশা প্রকৃতিবিজ্ঞানী, আজ হিমগিরির রহস্যময় প্রকৃতির দুর্নিবার আকর্ষণে—আত্মহারা, গৃহভোলা। নিজের পরিচয় দেবার সময় সগর্বে বলেন—আমাকে

যেন যা-তা একজন বলে ভেবো না তোমরা। আমি হচ্ছি বন-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-অধ্যাপক সেই ফন্‌শ্লেগের নিকটাত্মীয়, যিনি একদিন 'বুক ড্যার লীডার'-এর ইহুদী লেখক হাইন্‌রিয হাইনের মাথায় সর্বপ্রথম পরিয়ে দিয়েছিলেন কবির মুকুট। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৯-এর মধ্যে বার পাঁচ-ছয় তিব্বতে ঘুরে এসেছেন নিজের নানা প্রশ্নের মীমাংসা পাবার তাগিদে। নির্ভীক, স্বাস্থ্যবান, অক্লান্ত পরিশ্রমী। এদেশী বেশ কয়েকটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে সক্ষম। ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ তাঁর প্রতিটি কথায় প্রকাশ হয়ে পড়ে। একথায় ওকথায় বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর উইলহেল্‌ম্ শ্লেগেল আচমকা প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, নৈরঞ্জনার তীরে উরুবিল্বে বসে বোধি লাভ করে, ভারতের এত জায়গা থাকতে কেন বারাণসীর ঋষিপত্তনে গেলেন বুদ্ধ তাঁর সদ্ধর্মের অমৃতবাণী প্রথম প্রচার করতে, বলতে পার? একথা কি কখনও ভেবে দেখেছ? অপালাকে নীরব থাকতে দেখে তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ জার্মান নিজেই জবাব দিলেন নিজ প্রশ্নের। বললেন—'তার কারণ, বারাণসীই ছিল তখন শৈবদের প্রধান স্নায়ুকেন্দ্র। এবং আদি শঙ্করাচার্যকে তোমরা যেমন ছদ্মবৌদ্ধ বলো, আমি তেমনি বুদ্ধকেও ডাকতে চাই ছদ্মশৈব বলে। সভ্যতার ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকে আজ অবধি ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বেশ বোঝা যায়, এখানে যখনই কোন প্রভাবশালী ধর্মে অনাচার এসেছে, ব্যভিচার ঢুকেছে, ধর্মের ধ্বজাধারীরা ধর্মের নামে শুরু করেছে অশিক্ষিত, দুর্বল, অসহায়দের ওপর দমনপীড়ন, তখনই আর একটা বিরোধী ধর্মমত প্রবলতর শক্তির তরঙ্গ তুলে ধেয়ে এসে ধুয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে পূর্বতন ধর্মবাদকে এবং তারপরেই বেশ কিছুদিনের জন্য আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছে সেই নবতর ধর্মাদর্শ। যে বৈদিকধর্ম দিকবিদিক প্রকম্পিত করে সারা বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছিল একদিন সাম্যভাবের উদাত্ত আহ্বান—

সমানী প্রপা সহ বোহন্নভাগঃ সমানে যোক্ত্রে সহ বো যুনজ্মি।
সম্যঞ্চোগ্নিংস্পর্যতারা নাভিমিবাভিতঃ।

(অথর্ববেদ, ৩।৩০।৭)

(এক পানশালাতে তোমরা পান করো, একত্রে সকলে একই অন্ন ভাগ করে খাও; একই স্নেহের রজ্জুতে আমি তোমাদের সকলকে বন্ধন করেছি, একই লক্ষে বদ্ধ হয়ে তোমরা সকলে একই পরমেশ্বরের সেবা করো) সেই বৈদিক ধর্মই যখন আবার নিজের বিরাটতা ও উদারতা বিস্মৃত হয়ে মানুষের সমাজে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ সৃষ্টি করে ঘৃণাসুরে বিদ্বেষবহ্নি উদ্‌গার করে বলল—

দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোহসৌ ব্রহ্মণস্য

তখন, সেই উৎপীড়িত সাধারণ মানুষের হাহাকারের হুতাশনকে নবসমতা ভাবের শান্তিবারিতে সিঞ্চন করতেই আবির্ভাব ঘটেছিল তিব্বত দেশীয় মহাযোগী আশুতোষের। আবার শিবোক্ত মূল তন্ত্রশাস্ত্রকে ঈর্ষাপ্রণোদিত হয়ে যেদিন অপসৃত করে, ইন্দ্রিয়সর্বস্ব

কতকগুলি মানুষ শিবের বিপ্লবাত্মক সাম্যপ্রচারী তন্ত্রধর্মের নামে শুরু করল নির্লজ্জ আচার-আড়ম্বর, দেখা দিল ভৈরবী নামধারী ব্যাভিচারিণীদের যথেচ্ছ অনাচার, সেদিনই ভারতের পূর্ব দিগন্তে সূচনা হল বুদ্ধ অভ্যুদয়ের। বুদ্ধ তাঁর সদ্ধর্মে শৈবতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ অনেক কিছুই গ্রহণ করেছিলেন, যেমন শঙ্করাচার্য সন্ন্যাসী সংঘ এবং মঠ প্রতিষ্ঠার আদর্শ নিঃশব্দে গ্রহণ করেছিলেন বৌদ্ধদের কাছ থেকে। অবশ্য শঙ্করাচার্য মুখে নিজে তা কখনই স্বীকার করেননি এবং বোধহয় সেই কারণেই ভারতে অনেকেই তাঁর শূন্যবাদকে মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের শূন্যবাদ অর্থাৎ শূন্য মাধ্যাত্মিকং পশ্য পশ্য শূন্য বহির্গতম (মাধ্যমিক ১৮ অঃ) এরই রূপান্তর মাত্র ভেবে নিয়ে, শঙ্করাচার্যকে ছদ্মবৌদ্ধ বলতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে, বুদ্ধ কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী ধর্মের ঋণ স্বীকার করেছেন। সূত্রপিটকের সংযুক্ত নিকায়ে তিনি বলেছেন—ভিক্ষুগণ, আমি একটি প্রাচীন পথকেই নতুন করে আবিষ্কার করেছি মাত্র। পুরাকালে মহাজ্ঞানীরা এই পথেই যাতায়াত করতেন। তন্ত্রধর্মের ঋণ স্বীকার করে নিয়ে, তখনকার শিবভক্তদের ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছিল বলেই সিদ্ধার্থকে সদ্ধর্মের মর্মবাণী সবার আগে গিয়ে প্রচার করতে হয়েছিল বিশ্বেশ্বরের শ্রেষ্ঠ তীর্থ বারাণসী ধামে। তবু বুদ্ধ যে ছদ্মশৈব, তা ধরে ফেলেছিলেন তাঁর সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালের অনেক বিদগ্ধজনই। তাই তাঁরা বুদ্ধকেও ডাকতে শুরু করলেন শম্ভু নামে। আজকের অভিধান বলে, শম্ভু মানে শিবও বটে, বুদ্ধও বটে (নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত বিশ্বকোষ)। পুরীতে লোকনাথ মহাদেবের বিরাট প্রতিপত্তি। আবার বুদ্ধদেবকেও সবাই জানে লোকনাথ বলেই। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত নলতা গ্রামে কালীকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়িতে চিন্তামণি ঠাকুর নাম দিয়ে যে মূর্তিটিকে হরগৌরীর ধ্যানে পূজিত হতে দেখেছি, সেটা কিন্তু ভূমিস্পর্শ মুদ্রাস্থিত ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়। (শরৎকুমার রায় রচিত 'বৌদ্ধভারত', ১৭৭) শব্দকল্পদ্রুম অভিযানে চিন্তামণি শব্দের একটি অর্থও লেখা হয়েছে বুদ্ধ বিশেষ বলে। ঠিক এমনিভাবে তিব্বতেও দেখেছি—নানা জায়গায়, বুদ্ধদেব আর মহাদেব একাকার হয়ে গেছে। পুরাবৃত্ত গবেষকরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলেই দেখতে পাবেন, হৃতশক্তি শৈবরাই অধিক সংখ্যায় বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন আর তা করেছিলেন বলেই যে বুদ্ধ স্বয়ং দেবতাকে স্বীকার পর্যন্ত করেননি কোনদিন, তাঁরই ধর্মে শৈবতন্ত্রের শক্তিমূর্তিগুলি প্রতিষ্ঠা পেতে লাগল এক এক করে অচিরকালের মধ্যেই। তারা দেবী নামরূপ ধরে বৌদ্ধদের পূজা গ্রহণ করতে লাগলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত ওখানে যে 'ধর্ম' সবাই মেনে চলত তার নাম ছিল 'বোন'। ঐ বোন ধর্মের প্রধান দেবতা কুন্তুৎসম্পের সঙ্গে শিবের চরিত্রের সৌসাদৃশ্য দেখে অনেক পুরাতত্ত্ববিদই 'বোন' ধর্মকে তন্ত্র ধর্মেরই কোন এক শাখা বলে বিবেচনা করে থাকেন। ইতিহাসে পাওয়া যাচ্ছে যে, এই 'বোন' ধর্মের ভক্ত ও পূজারীবৃন্দ তান্ত্রিকদের ন্যায় রক্তাম্বর পরিধান করত এবং ভূত, প্রেত,

ডাকিনী-যোগিনী ইত্যাদিরও পুজো করত। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর আজ পর্যন্ত শৈবতন্ত্রী ঐতিহ্য ওখানকার বৌদ্ধদের মধ্যে ভালভাবেই ক্রিয়া করে চলেছে। এখনও পো (তিব্বত) দেশের বৌদ্ধরা প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, গেল্‌গুপ্‌ ও শম্বর। গেল্‌গুপ্‌ এরা পীতবস্ত্র দেহে ধারণ করে এবং চিরকুমার থাকে, কিন্তু শম্বররা আজও সর্বত্রই রক্তবসনধারী এবং তারা বিবাহও করে। কৈলাসাঞ্চলেই এই রক্তশম্বর সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য দেখতে পাওয়া যায়। ক্রমে ভারতেও বৌদ্ধরা ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচী, যক্ষিণী প্রভৃতিকে উপাস্য বলে গ্রহণ করতে আরম্ভ করল। তাই বলতে চাচ্ছিলাম— অবনত শৈবরাই অধিক সংখ্যায় বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল বলেই বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে তন্ত্রধর্মের প্রভাব এত বেশিভাবে পড়তে পেরেছিল।

সুদূর জার্মানীর অধিবাসী সেই প্রজ্ঞাবান বৃদ্ধের মুখে ভারততত্ত্বের আশ্চর্য আলোচনা শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল অপালা গতকাল। এমন সুগভীর পাণ্ডিত্য এবং অকৃত্রিম ভারতপ্রেম না থাকলে পারতেন কি তিনি কখনও জয়ন্তের মত চিন্তাশীল, বিবেকবান ছেলেকে প্রভাবান্বিত করতে? কিন্তু, জয়ন্ত আশামায়ি এবং উইলহেল্‌ম শ্লেগেল—এঁদের সকলের মুখেই ঐ একই কথা শুনতে পেয়েছে অপালা; শিবসৃষ্ট তন্ত্রধর্মের মূল তত্ত্বগুলো শিববিদ্বেষীরা নাকি ষড়যন্ত্র করে সরিয়ে ফেলেছিল ভারতের বাইরে কোন এক স্থানে। আর সেই আসল তন্ত্রগুলি যে পুঁথিগুলোর মধ্যে রয়েছে লিপিবদ্ধ, তারই সন্ধানে ঘরছাড়া বাপ-মা ছাড়া হয়ে জীবনপণ করে নাকি ঘুরে বেড়াচ্ছে জয়ন্ত অবিরাম অবিশ্রান্তভাবে বিগত আটটি বছর ধরে—হিমালয়ের জঙ্গলে, প্রান্তরে, তুষারাবৃত পর্বতের কন্দরে কন্দরে। সেই তন্ত্রশাস্ত্র সত্যিই কি কোথাও পাওয়া সম্ভব এখনও? হাজার হাজার বছর আগে অনুন্নত কিম্পূরুষবর্ষে (তিব্বতে) বর্ণমালা বলে কোন বস্তুর কোন অস্তিত্বই কি ছিল? এই প্রশ্ন করেছিল অপালা শ্লেগেলের কাছেও। উত্তরে জার্মান বলেছিলেন—ইতিহাসে দেখতে পাচ্ছি বর্তমান তিব্বতীলিপির সৃষ্টি হয়েছিল খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে সান্‌ৎসন গম্পোর রাজত্বকালে। এ লিপিমালার নাম বুচন। সাত্রাযুক্ত নাগরী এবং মাত্রাহীন বুর্তু (কাফিরিস্থানে প্রচলিত অক্ষরমালা ও ভাষা) অক্ষর ভেঙেচুরে এই বুচন অক্ষর উদ্ভাবিত হয়। কিন্তু তার অনেক অনেক কাল আগেই তিব্বতে প্রাচীন সংস্কৃতের যথেষ্ট অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া যায় ঐ রাজা স্রোন্‌ৎসন গম্পোর সমকালীন ইতিবৃত্তেই। ইতিহাস বলছে—ঐ রাজার রাজত্বকালেই তিব্বতের নানা পার্বত্য গুহায় ও গুপ্তস্থানে প্রচুর পরিমাণে খোদিত শিলালিপি দেবদেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়—যার মধ্যে কয়েকটি স্থানে 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' এই ষড়াক্ষর মন্ত্রটিও খোদিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। এবং এই প্রাচীন সংস্কৃতের পো-দেশযাত্রা সম্ভব হয়েছিল, মনে হয়, একমাত্র সেই মহাযোগী মহেশ্বরেরই দাক্ষিণ্যে। ভারতের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল ঘনিষ্ঠ এবং যোগাযোগ ছিল চির অবিচ্ছিন্ন।

এসব শুনে বারবার রোমাঞ্চিতই হয়ে উঠেছে অপালা। সত্যি যদি জয়ন্ত সফল হয়

কোনদিন আসল শৈবতন্ত্রের মূল তত্ত্বগুলির পুনরুদ্ধার করতে, তাহলে বিশ্বব্যাপী বিদ্বজ্জন মহলে যে একটা বিরাট আলোড়ন দেখা দেবেই এবং সাম্যবাদী তন্ত্রধর্মের হবে আবার নবমূল্যায়ন—সেকথা কি জানে না অধ্যাপিকা অপালা গাঙ্গুলী? কিন্তু আজ ভুণ্ডাগ্রাম থেকে ফিরে এলে, তবু জয়ন্তের পায়ে ধরে মিনতি জানাবেই সে একবার দেশে গিয়ে পুত্রবিরহকাতরা মা'র সঙ্গে দেখা করে আসার জন্যে। একবার, মাত্র কয়েকদিনের জন্যে। এ মিনতি তো তার নিজের জন্যে নয়! আশামায়িকে তো সে কথাই দিয়েছে—তার ধৈর্যের বাঁধ অটুটই রাখবে সে ততদিন যতদিন না সাঙ্গ হচ্ছে জয়ন্তের শিবানুসন্ধানের কাজ। অপালার এই মিনতিটুকু জয়ন্ত কখনই না মেনে পারবে না নিশ্চয়ই। মা'র কান্নার কথা শুনলে সে নিশ্চয়ই পারবে না আর নিজেকে মা'র কাছ থেকে দূরে রাখতে। মাকে যে জয়ন্ত কত ভালবাসে, অপালার তো তা অজানা নয়।

জয়ন্তের অপেক্ষায় ব্যাকুলভাবে বসে থেকে, শেষে দুপুর দুটোয় অপালাকে পাশে নিয়ে আহারে বসলেন সন্ন্যাসিনী, সারা মুখে তাঁর চিন্তার ছায়া সুস্পষ্ট। একটি কথাও না বলে, প্রায় সমস্ত ভাত, তরকারী পাতে ফেলে রেখে, একসময়ে নীরবে আসন ত্যাগ করে উঠে পড়লেন তিনি।

বেলা তিনটের সময় হুড়মুড় করে এসে হাজির হলেন শ্লেগেল। পরিধানে সেই ময়লা ফতুয়া আর তালি দেওয়া হাফ প্যান্ট। কিন্তু দুই চোখে কিসের যেন উত্তেজনা। তাঁর এই আকস্মিক আবির্ভাবে মাতাজীও যেন বেশ হতচকিত। কিন্তু দুজনের কেউই কোন কথা ভাঙলেন না। একটু হাসবার চেষ্টা করে জার্মান বললেন অপালার দিকে চেয়ে—তোমার এবং নান্দীবাবার জীবনের সমস্ত ঘটনাই আমার জানা আছে। অতএব আমাকে তুমি তোমার শুভানুধ্যায়ীদের একজন বলে অনায়াসে ভেবে নিতে পারো অপালা দিদি। বলে, মুহূর্তের জন্যে মুখ নত করে কী যেন চিন্তা করে নিলেন বৃদ্ধ। তারপর বললেন পুনশ্চ—নান্দীবাবাকে তুমি তোমার জীবনসঙ্গী হিসেবে নির্বাচিত করেছ সেই ছেলেবেলায়, এবং সেই থেকেই অপেক্ষা করে আছ তাকে পাবার আশায়, এরজন্য আমি তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু দিদি, তুমি তো শুনেছ দুটি বিরাট কাজে হাত দিয়ে বসেছে তোমার এই ভাবী জীবনসঙ্গীটি। প্রথম কাজ হচ্ছে শিবোক্ত মূলতন্ত্র উদ্ধার, আর দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া শিবব্যবহৃত কয়েকটি ভেষজ উদ্ভিদের অনুসন্ধান করা। এর আগে দুইবার সে অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে এসেছে তিব্বতের ভিতরে গিয়ে। কিছুটা সাফল্যও যে অর্জন করেনি—সে কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। কিন্তু তখন তিব্বতে ঢোকার ব্যাপারে বাধা পায়নি সে বিশেষ কোথাও। এখন পরিস্থিতি ভিন্ন রকমের। সীমান্তে অনেক বাধা, অনেক বিধি-নিয়মের আস্ফালন। আগে শিবের দেশের লোক ভারতে এসে দর্শন করে যেত ছদ্মশৈব বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলিকে, আর ভারতের শিবভক্তরা বিনা বাধায়

তিব্বতে ঢুকে প্রণাম জানিয়ে আসতো কৈলাসে শিবের তন্ত্রসাধনা এবং ভেষজ গবেষণাগারের পুণ্য শ্রীপাদপীঠে। আমার অবশ্য তিব্বতে যাবার ব্যবস্থা করা আছে চীন হয়ে। বর্তমানে আমি পূর্ব বার্লিনের বাসিন্দা তো! আমি ঢুকবো সেই পথ দিয়েই। নান্দী এর আগেরবার যেখানে তন্ত্রের পুঁথির কিছু অংশ দেখে এসেছিল। আমার পরিচিত কয়েকজন তিব্বতীকে লাগিয়ে সে স্থানের খোঁজখবর সব নিয়েছি। নান্দীর দেওয়া বর্ণনায় দেখলাম কোন ভুল নেই।

'বলেন কি? তন্ত্রের পুঁথি সত্যিই তবে আছে কোথাও এখনও?' অপালা জানতে চাইল বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে।

স্মিত মুখেই উত্তর দিলেন বৃদ্ধ—যে শাস্ত্র একদিন ছিল, যে শাস্ত্রকে একদিন সবাই মাথায় তুলে নিয়েছিল, সেই তন্ত্রকে ঈর্ষান্বিত কিছু আর্যরাজা যদি নির্মূল করেও থাকে ভারতে, তবুও তার জন্মস্থান তিব্বতে কোন না কোন শিবভক্ত নিশ্চয়ই তা সযত্নে গ্রথিত করে রেখেছিল কোন প্রাচীন পুঁথির বুকে, এবং লুকিয়েও রেখেছিল তা এমন কোন গোপন স্থানে, যে স্থানের সন্ধান পাওয়া কোন ভারতীয়ের পক্ষেই সহজ হবে না কোনদিন।

'কোথায়? কোথায় লুকানো রয়েছে সেই পুঁথিগুলো, দাদু!' নিদারুণ উত্তেজনায় এই সহৃদয় জয়ন্তগতপ্রাণ মানুষটিকে বোধকরি নিজের অজান্তেই হঠাৎ দাদু সম্বোধন করে বসল অপালা।

উচ্ছ্বলিত স্নেহে একবার ঝলমল করে উঠল জার্মান আনন। অত্যন্ত নিম্নস্বরে, প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে এবার কথা শুরু করলেন তিনি। বললেন—কেমন করে তোমায় বুঝাবো দিদি, তিব্বতে যে তুমি যাওনি কখনও। তুব শোনো। দ্যাখো, যদি বুঝতে পারো। তিব্বতকে চীনারা ডাকে 'চঙ্' অথবা 'সি-তঙ্' নামে। তিব্বতীরা নিজেরা কিন্তু নিজেদের দেশকে বলে পো। তোমরা বলো তিব্বত। এই তিব্বত শব্দটা চু-পেহ্-তেহ্ (তুবো) শব্দের অপভ্রংশ। তিব্বতে লোহব্রা প্রদেশে তেসি পর্বত (কৈলাস) যাকে চীনারা বলে কিয়ুনলন। এই পর্বতেরই কিছু দূরে মফম্-য়ু-চহো (মানস সরোবর)। কৈলাস কিন্তু একটা অতি বিস্তীর্ণ পর্বতশ্রেণী—এটা কেবল শিবলিঙ্গসদৃশ একটা শিখর মাত্র নয়—সাধারণতঃ যে শিখরটিকে দেখানো হয়ে থাকে কৈলাস বলে। ঐ শিখরটিকে তিব্বতীরা বলে 'গ্যাংরী'। শিবের সাধনক্ষেত্র ছিল বিস্তীর্ণ ঐ কৈলাস পর্বত শ্রেণীরই কোন এক স্থানে। স্থানটি কোথায়, তোমায় বলছি একটু পরে। উ-ছু নদীর তীর ধরে পূর্বদিকের একটি জঙ্গল পার হলেই তগ্যের নামক পাহাড়ের ওপরে অতিষদেবের (দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান) তপোবন ও গুহা। এখানে ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে ৫৯ বছর বয়সে অতিষ এসে বেশ কিছুকাল বাস করেন এবং লমদোন (সত্য পথপ্রদীপ) নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন।

এ স্থানের অনতিদূরে শিব নামক দেবতার প্রতিমা বিদ্যমান। এ দেবতাকে তিব্বতীরা

বলে অদ্বিতীয় দেবতা। উ-ছু নদীর দক্ষিণ তীরে গধন আশ্রমে প্রসিদ্ধ ধর্মসংস্কারক শর চোঙ্গখপ্-এর সমাধিস্থল। এখানে যমান্তক মহাকাল-এর প্রতিমা এবং গুহ্য সমাজের মঠ আছে। উ-ছু এবং চঙ্-পো নদীর সঙ্গম থেকে অর্ধদিনের পথ উত্তরে দোর্জেতগ নামে তান্ত্রিক বৌদ্ধদের প্রধান আশ্রম। পো নদীর উত্তর তীরে ল-ছো নামক হ্রদ। এই ল-ছো-কে তিব্বতদেশীয়রা বলে পাদন-লহ্মো বা কালীদেবীর হৃদয়। এবং কিছু দূরেই দ্বগপো গোঙ্গমোল নামক পর্বতের উপর চরি-খোর থঙ্গ নামে অতি পবিত্র স্থান। তিব্বতীরা বলে, ঐ স্থানে খমোদরা (ডাকিনীরা) প্রহরা দিয়ে বেড়ায় সর্বদা। এখানে আসা খুবই কঠিন ব্যাপার। তিব্বতে একটা প্রবাদ আছে যে এই ভয়ঙ্কর দুর্গম চরি-তে মেষ, ছাগ প্রভৃতি পশুরা চরতে আরম্ভ করলেই, এই জটাজুটধারী দেবমূর্তি আপনা থেকেই মূর্ত হয়ে ওঠে তাদের শৃঙ্গে। তিথিক (ব্রাহ্মণ) যাঁরা কদাচিৎ চরি দর্শন করেছেন, তারা ফিরে এসে বলেছেন যে, ঐ অঞ্চল উলঙ্গ স্ত্রী-পুরুষের আবাসভূমি। তিব্বতীরা বলে—চলি হচ্ছে খোরডোম্প নামে তান্ত্রিকশ্রেষ্ঠ মহাদেবতার হৃদয়স্থান, তাই চরি এক মহাতীর্থ। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ দিদি ঐ তান্ত্রিকশ্রেষ্ঠ মহাদেবতাটি কে। এই স্থানই সুদূর অতীতে একদিন ছিল ভিষকতম যোগীশ্বর মারাত্মক পশুপত-অস্ত্রধর তন্ত্রস্রষ্টা রুদ্রের আলয় (আমদো নামক স্থানের লামা সোনপো মোসন খন লিখিত তিব্বতের ভূ-বিবরণ)।

অপালা বিস্ময়মিশ্রিত আবেগে বলে উঠল—তাহলে ঐ দারুণ দুর্গম আর বিপদসঙ্কুল চরি-খি-খোর-থঙ্গেই থাকতেন এক নতুন যুগের প্রবর্তক বিশ্বের প্রথম সাম্যঘোষক মহাতাপস আমাদের সবার প্রাণের মহাদেব? কিন্তু তন্ত্রপুঁথি কোথায় আছে, তা তো বললেন না!

'যে-গধন আশ্রমে ধর্মসংস্কারক শর চোঙ্গখশ্-এর সমাধি এবং যমান্তক মহাকালের প্রতিমা আছে বলেছি একটু আগে তার উত্তর-পূর্বে ছগল পর্বতের পরপারে রাদেঙ্গ নামে গুপ্ত আশ্রম আছে জনহীন হিংস্র জন্তুতে ভরা এক জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশে হারিয়ে যাওয়া আসল তন্ত্রতত্ত্বের বেশ কয়েকটি পুঁথি ঐ আশ্রমে বর্তমানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে বলে আমরা খবর পেয়েছি।'

'সেই সাংঘাতিক বিপজ্জনক জায়গায় যেতে হবে আপনাদের?'

'অবশ্যই। কিন্তু তিব্বতে ঢুকব এবার আমি একা—চীনের দিক থেকে। কাল ভোরের বাসেই ঋষিকেশ রওনা হচ্ছি। সেখান থেকে কলকাতা হয়ে হংকং যাব। তারপর—'

'আর জয়ন্তদা?'

'নেলাং-এর গিরিপথ ধরে গঙ্গোত্রী হয়েই শিব অধিকাংশ সময়ে ভারতে নেমে আসতেন তিব্বত থেকে, তাই এই পথেই স্থাপিত হয়েছে উত্তরকাশী আর ত্রিশূলির মন্দির। তিনিও নানা গিরিপথ দিয়েও আসতেন হয় তো কখনও কখনও। কখনও

আসতেন কুমায়ুনের যোহর, দর্ম অথবা ব্যাস গিরিপথ ধরেও। নান্দীকে এবার নেলাং-পাস্ দিয়ে তিব্বত সীমান্তে গিয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হবে। ওর সঙ্গে থাকছে যামাবর জড়-সম্প্রদায়ের এক যুবক এবং নান্দীবাবার আর এক পরম ভক্ত গুর্জর মুসলমান। ওরা বংশপরম্পরায় তিব্বতের সঙ্গে ব্যবসা করে আসছে, তাই তিব্বতের অনেক কিছুই ওদের জানা। নান্দীকে যে আরও একটি কাজ সারতে হবে কিনা এবার সীমান্তের এপারে দাঁড়িয়েই।

'কি কাজ দাদু?'

'শিব নির্দেশিত অথচ এদেশে দুষ্প্রাপ্য কতকগুলি ভেষজ উদ্ভিদ সংগ্রহ করবেই সে এবার, স্থির করেছে। যেসব গিরিপথ দিয়ে মহাদেব নামতেন আর্যাবর্তে, সেইসব গিরিপথের অধিবাসীরা আজও অনেক লতাগুল্মের নাম করে শিবৌষধি হিসেবে, অথচ সেগুলি হিমালয়ের এ অঞ্চলে আদৌ কোথাও পাওয়া যায় কিনা, তাও কেউ জানে না। নান্দীর বিশ্বাস, ঐ লতাগুল্মগুলির সন্ধান পাওয়া গেলে ক্যান্সার, গলিতকুষ্ঠ, গলগণ্ড ধরণের মারাত্মক ব্যাধিগুলির সহজ নিরাময় সম্ভব হবে নিশ্চয়। ও খবর পেয়েছে তিব্বতের হোতি-গোঙ্গিয়া, মরি-রব্-চ্যম্, জোমো নগরি, কোঙ্গৎস্থন্-ছেমো প্রভৃতি পর্বতে ঐ শিবকথিত ভেষজগুলো (Herbs) নাকি প্রচুর পরিমাণেই বিদ্যমান (আমতোবাসী লামা সোনপো নোমনখন রচিত তিব্বতের ভূ-বিবরণ)। সীমান্তের এপারে থেকেই এবার নান্দী ঐ লতাগুল্মগুলিও আনিয়ে নেবার চেষ্টায় রত থাকবে—স্থির করেছে।'

ময়লা ফতুয়া, তালি দেওয়া হাফ্প্যান্ট পরিহিত উদারমনা আত্মবিশ্বাসী জার্মান প্রকৃতি বিজ্ঞানী আবার সহসা একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন বলে যেন মনে হল। আজ এখানে আসার মুহূর্তে যে চাঞ্চল্য পরিব্যাপ্ত ছিল তাঁর চোখের ভাষায়—এ বোধহয় সেই চাঞ্চল্যেরই পুনরাবির্ভাব! কী যেন বলতে চাচ্ছেন তিনি, অথচ বলতে পারছেন না কিছুতেই।

আশামায়ি নির্বাক হয়ে শুনছিলেন এতক্ষণ বৃদ্ধের বক্তব্য। তাঁর মুখে চিন্তার ছাপ এখনও সুস্পষ্ট। এবার হঠাৎ তাঁর কণ্ঠশ্রুত হল—

'আপনি তবে কাল ভোরেই যাত্রা করছেন, সাহেব-বাবা?'

'হ্যাঁ মা-জননী।'

'আর জয়ন্ত?'

মায়ির এই প্রশ্নে যেন হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলেন শ্লেগেল। বললেন—এই কথাটাই বলব বলে এসেছি আজ এখানে, অথচ দিদিভাই-এর সামনে বলবার মত সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারছিলাম না কিছুতেই!

'কি কথা দাদু?' অপালার উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন।

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করে, শেষে বলেই ফেললেন স্নেহার্ত বৃদ্ধ আবেগ-কম্পিত

স্বরে—'নান্দীবাবা আজই চলে গেল তার সঙ্গী দুইজনকে নিয়ে নেলাং গিরিপথের দিকে, দিদি। তুমি কিছু ভেবো না। ওর কাজ শেষ হয়ে গেলে, ও তো তোমার কাছেই ফিরে আসবে সবার আগে।'

সারা বুক তোলপাড় করে একটা আর্তক্রন্দন যেন হাহাকার করে বেরিয়ে আসতে চাইল অপালার। কিন্তু কাঁদতে সে পারল না। চকিতে চেয়ে দেখল, আশামায়ির এতক্ষণের চিন্তাচ্ছন্ন মুখখানিতে এখন আর চিন্তার ছায়াটুকু পর্যন্ত নেই। করজোড়ে চক্ষু বন্ধ করে অস্ফুটস্বরে তিনি কেবল উচ্চারণ করে চলেছেন দুটি শব্দ—

শুভায় ভবতু, শুভায় ভবতু।
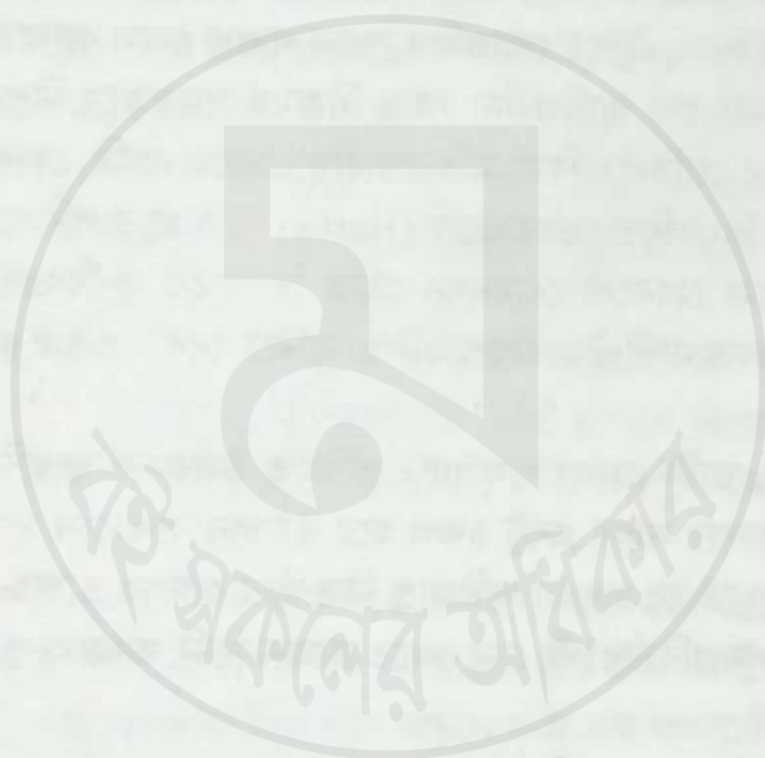
।। দ্বিতীয় অধ্যায় ।।

দারুব্রহ্ম রহস্য

শ্রীক্ষেত্রের ঐ নীল সাগরের তীরে
ক্ষ্যাপা কী যে খুঁজে খুঁজে ফিরে।

।। এক ।।

'ঐ যে মেয়েটাকে দেখছেন না, স্যার, ও একটি পয়লা নম্বরের স্নব।'

ঘরভর্তি লোকের মধ্যে বলে, জয়ন্তের কানের কাছে মুখ এনে, সদ্য ডাক্তারী পাশ করা ধনীর দুলাল শ্রীমান অপরেশ বাঁড়ুজ্জে বলল ফিস্‌ফিস্ করে।

'Snob? কোন্ মেয়েটা?'

'ঐ যে, স্যার, নাক থেকে কপালের শেষ পর্যন্ত তিলক কাটা, চুল বেঁধেছে চূড়ো করে, বসেছে সবার পেছনে।'

পেছন ফিরে চাইতেই দৃষ্টিতে ধরা পড়ল মেয়েটি।

উজ্জ্বল গৌরবর্ণা। পাড়হীন সাদা কাপড়ে ঢাকা অঙ্গ। মস্ত দুই চোখের মধ্যবর্তী নিটোল নাকটির ওপরে সত্যি সত্যিই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ঢং-এর আঁকা তিলকটি ওর মুখের শোভা অনেকটাই বাড়িয়ে তুলেছে। গলায় কণ্ঠী এবং রুদ্রাক্ষের মালা, বৈষ্ণব এবং শৈব প্রতীক। দুই-এরই সহাবস্থান।

জয়ন্ত শুধালো—'ওকে স্নব বলার কারণটা তো বললে না?'

অপরেশের হয়ে জবাব দিল এবার ওর সঙ্গিনী। সেও ফিস্‌ফিস্ করেই বলল—'বড়লোকের মেয়ে, গায়ের রং-তো দেখতেই পাচ্ছেন, তার ওপর এম-এ তে পেয়েছে ফার্স্ট ক্লাস। দেমাকে ওর মাটিতে পা পড়ে না। ও ভাবে, ও যা বোঝে, তাই ঠিক। অন্য কারুর মতও যে ঠিক হতে পারে, তা ও বিশ্বাসই করে না।'

জয়ন্ত ভাবল—বড় আশ্চর্যের কথা! অমন ভক্তি ঢলো ঢলো মুখ, আর অমন সাদামাটা সাজ যার, সে একটা কেবলই স্নব?

তা প্রায় শ-দুই পুরুষ-নারীর সমাবেশ ঘটেছে ছোট হল ঘরটায়। অধিকাংশই শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত। এমন অদ্ভুত নামাঙ্কিত সভা যে কখনও কোথাও হয়, জয়ন্তের জানা ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীর একটি প্রাচীন তালপত্র পুঁথির সন্ধান পেয়ে পুরী থেকে ছুটে এসেছে সে কলকাতায় মাত্র দুইদিনের জন্যে। উঠছে ক্রিস্টোফার রোডে এক ইংরেজী অধ্যাপক বন্ধুর গৃহে। সেইখানেই আজ সকালে প্রথম পরিচয় শ্রীমান অপরেশ এবং তাঁর বান্ধবী, কলকাতার নামকরা এক চিকিৎসকের কন্যা—পদ্মের সঙ্গে। ওরা গিয়েছিল ঐ ইংরেজী অধ্যাপককে আমন্ত্রণ জানাতে আজকের এই সভায়। অধ্যাপক জয়ন্তকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন—ওকে ধরে নিয়ে যাও সভায় কাজের কাজ হবে।

বলাবাহুল্য, তখনই দ্বৈত কণ্ঠের অনুরোধ উপরোধের দাপট সইতে না পেরে, শেষ পর্যন্ত রাজী হতে বাধ্য হয়েছিল জয়ন্ত—এই সভায় আসতে। অথচ জয়ন্তের মনের ইচ্ছা ছিল—রথযাত্রার দিন যখন এসেই পড়েছে কলকাতায়, তখন শেয়ালদহ-এর রথের মেলা সে দেখবেই যেমন করে হোক।

তবু, জয়ন্ত জানতে চেয়েছিল—সভাটা কি কারণকে কেন্দ্র করে হচ্ছে। উত্তরে, ডাক্তার-যুবকটি যা বলল, তা শুনে তো বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না জয়ন্তের। আজ

নাকি তাদের তমোনাশ সংঘের দন্তমহোৎসব এবং সেই উপলক্ষেই এই সান্ধ্যসভার আয়োজন।

'কি উৎসব?' জয়ন্ত নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না 'দন্ত মহোৎসব'? এমন উৎসবের কথা তো আমি কোথাও শুনিনি।' বিগলিত কণ্ঠে অপরেশ বলেছিল—শোনেননি তো? এটা যে একটা সম্পূর্ণ নতুন জিনিস। আমাদের তমোনাশ সংঘ সবসময়েই নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে মানুষকে, স্যার। আজ তো যাচ্ছেনই সভায়, গেলেই সব বুঝতে পারবেন।'

মহোৎসবের এই অদ্ভুত নামটিই, আসলে, টেনে এনেছে আজ জয়ন্তকে বুদ্ধিষ্ট টেম্পল স্ট্রীটের অদূরবর্তী তমোনাশ সংঘের এই সভাগৃহে।

জয়ন্ত জানতে চাইল পদ্মের কাছে—'Snob-ই যখন ঐ মেয়েটি, তখন তোমরা ওকে নিমন্ত্রণ করে এনেছ কেন আজ?'

'নিমন্ত্রণ করার দরকারই হয় না যেখানে কোন সভা বা উৎসব হবে, ও নিজেই সেখানে গিয়ে, জাঁকিয়ে বসবে কপালে সাত হাত তিলক কেটে আর হাতে জপের মালা নিয়ে, পদ্ম বলল—'অথচ দুই বছর আগেও ওর সাজগোজ ছিল রাণী-মহারাণীর মত। গা-ভর্তি গয়না। বাজারের সেরা সিল্কের সাড়ী পরত নানান কায়দায়। মাথায় কবরী বাঁধতো বেলফুলের মালা দিয়ে। ইউনিভার্সিটিতে পড়তো বটে, কিন্তু আমাদের ধারেকাছেই ঘেঁষতো না কোনদিন।'

'তা হঠাৎ এমন বদলে গেল কেন?' জয়ন্তের প্রশ্ন।

'দুই বছর আগে ওর ঠাকুমা না দিদিমার সঙ্গে ও নাকি পুরীতে গিয়েছিল জগন্নাথ দর্শন করতে। মনে হয়, সেখানেই ইস্কন-ফিস্কনের পাল্লায় পড়ে ওর এই আকস্মিক পরিবর্তন। পুরী থেকেই এইরকম তিলক-টিলক কাটা শুরু করেছে। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম—'এ আবার কেমন সাজ?' উত্তরে ও বলেছিল—'সাদা কাপড়, সাদা তিলক, সাদা তুলসীর মালা পরেছি—দেখি মনটা সাদাসিদা হয় কিনা।'

'লোকেরা ওকে দেখে হাসে না?'

'হাসবে কি, স্যার? ওর সঙ্গে দুটো কথা বলার জন্যে কত মেয়ে-পুরুষ আঁকুপাঁকু করছে সবসময় ওর চারধারে। কিন্তু দেমাকী মেয়ে তো। ও বিশেষ আমল দেয় না কাউকে।' এরপর, কণ্ঠস্বরকে আরও একটু নামিয়ে, পদ্ম আবার বলল—'ঐরকম সাজগোজ কেন করে জানেন? যাতে পুরুষের চোখ হন্যে হয়ে পড়ে থাকে ওর ওপর। ও ভাবে আমরা বুঝি কিছুই বুঝতে পারি না।'

পদ্ম এবং অপরেশ ক্রমাগত জয়ন্তকে স্যার-স্যার করছে, এটা কিন্তু একটুও ভাল লাগছিল না জয়ন্তর। ক্রিস্টোফার রোডের অধ্যাপক বন্ধুর ছাত্র-ছাত্রী এরা দুইজন। অধ্যাপককে স্যার বলে, তাই অধ্যাপকের বন্ধুও স্যারে পরিণত। কিন্তু, এ সম্বোধনটা বড়ই শ্রুতিকটু ঠেকছিল জয়ন্তের কানে।

হল-এর শেষপ্রান্তে একটু উঁচুতে তৈরী হয়েছে বক্তৃতা-মঞ্চ। মঞ্চের পেছনের দেওয়ালে—ভগবান বুদ্ধের একটি ধ্যানী মূর্তি চিত্রে শোভা পাচ্ছে। তার নীচে নীল কাপড়ের ওপর রুপালী রং-এ বড় বড় অক্ষরে লেখা—তমোনাশ সংঘ কর্তৃক দন্তমহোৎসব। মুখ্য বক্তা অধ্যাপক অনিলকান্তি বড়ুয়া।

বাইরের গাড়ি বারান্দায় একটি মোটর গাড়ির আওয়াজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপরেশ একলম্ফে উঠে দৌড় দিল বাইরের দিকে পড়ি কি মরি করে। পদ্ম খুশি খুশি মুখ করে বলে উঠল—'ঐ বড়ুয়া সাহেব এসে গেছেন স্যার। শুনবেন ওর বক্তৃতা। কি পাণ্ডিত্য।'

'গেরুয়া রং-এর পাঞ্জাবী আর সাদা ধুতী পরে' যিনি এবার সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন, তিনিই যে আজকের মুখ্য বক্তা অধ্যাপক বড়ুয়া, তা তাঁর প্রতি সংঘ কর্মীবৃন্দের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন দেখেই বুঝতে কষ্ট হল না। তিনি সোজা গিয়ে একেবারে মঞ্চের ওপরে উপবেশন করলেন।

বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারা। গোলগাল গড়ন। ফর্সা দেহবর্ণ। মাথায় চুল নেই বললেই হয়। মোটা শেলের চশমা আর ওষ্ঠকোণের স্মিত হাসিতে—একটা সুমিষ্ট ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠছে স্পষ্ট। বয়স মনে হয় পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হবে।

তিলকাঙ্কিত কন্যাটি কিন্তু ওদিকে সবার পেছনে বসে, জপের থলির মধ্যে আঙুল নাড়িয়েই চলেছে ক্রমাগত, অন্য কোনদিকে যেন ভ্রুক্ষেপও নেই তার। জয়ন্তের মস্তিষ্কে কেবল একটা কথাই তোলপাড় করে চলেছিল—এ হল-এ প্রবেশ করার পর থেকেই। দন্তমহোৎসব আবার কেমন উৎসব? উৎসবের এমন উদ্ভট নামকরণের অর্থ কি? বক্তৃতা মঞ্চের মাথায় কেন ভগবান তথাগতের চিত্র শোভিত?

শ্রীযুক্ত অনিলকান্তি বড়ুয়ার পরিচিতি প্রদান করলেন তমোনাশ সভার জেনারেল সেক্রেটারী। বললেন—'বৌদ্ধ শাস্ত্র ও বৌদ্ধ ইতিহাসের এতবড় পণ্ডিত আমাদের দেশে বিরল। প্রাচীন পালি ভাষায় পরম পারঙ্গম। ওঁরই উৎসাহ এবং নির্দেশে আমাদের তমোনাশ সংঘ এই প্রথম দন্তমহোৎসব উদ্‌যাপনে ব্রতী হয়েছে। একটা নতুন উৎসবের আয়োজন করতে পেরে আমাদের সংঘ কৃতার্থ। কিন্তু, সত্যিকথা বলতে কি, দন্তমহোৎসব নামকরণের তাৎপর্য আমার কাছে যথেষ্ট পরিষ্কার নয়। আমি পরম প্রাজ্ঞ বড়ুয়া সাহেবকে সবিনয়ে অনুরোধ করব এবার এই দন্তমহোৎসবের তাৎপর্যটুকু তাঁর অমিত পাণ্ডিত্য দিয়ে শ্রোতৃবর্গের সামনে ব্যাখ্যা করতে। যাতে এর পরের বছরেও এই রথযাত্রার দিনেই আমরা আবার এই দন্তমহোৎসবের আয়োজন করতে পারি অধিকতর আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে।'

ডঃ বড়ুয়া উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন মাইক্রোফোনের সামনে। হলভর্তি লোকের সঙ্গে জয়ন্তও উৎকর্ণ হয়ে উঠল—মুখ্য বক্তার ভাষণ শোনার আগ্রহে।

অনিলকান্তি শুরু করলেন—'আজ রথযাত্রার উৎসবে যখন সারা দেশ মেতে

উঠেছে, যখন পুরীতে জগন্নাথ, বলভদ্র ও শুভদ্রার রথকে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ ভক্তের বিশাল সমাবেশ ঘটেছে, যখন আমাদের কলকাতা এবং মাহেশও পড়েছে রথের রশিতে টান, ঠিক তখনই, আজকের আমাদের এই যে দন্তমহোৎসবের আয়োজন এর পেছনে আছে এক বিরাট ঐতিহাসিক তাৎপর্য। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দে ইলুভাষায় দলদাবংশ লিখিত হয়। সেই গ্রন্থ অবলম্বন করে দাথ-ধাতু বংশ বা দাথবংশ রচিত হয়েছে। এই দাথবংশ পাঠ করে এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ গবেষকদের অভিমত গ্রহণ করে আমি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, রথযাত্রা আসলে হিন্দুদের উৎসবই নয়। এটা একটি বৌদ্ধ উৎসব।

সমস্ত হলঘর স্তম্ভিত হয়ে গেল বলে মনে হল—বড়ুয়া সাহেবের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণায়। পদ্ম নিম্নস্বরে বলল—'শুনলেন তো স্যার, এতদিন আমরা রথযাত্রাকে হিন্দু-উৎসব ভেবে এসেছি মুর্খের মত।'

'রথযাত্রা মূলতঃ বৌদ্ধদের দন্তমহোৎসব। এখন জানতে হবে এই দন্তমহোৎসবটি কি জিনিস। সেটা জানতে গেলে আমাদের দৃষ্টি ফেলতে হবে সুদূর চতুর্থ শতকে রচিত ঐ দলদাবংশ গ্রন্থটির ওপরেই। এই প্রাচীন গ্রন্থ বলছে, বুদ্ধদেবের নির্বাণের পর তাঁর প্রিয় শিষ্য ক্ষেম কলিঙ্গাধিপতি ব্রহ্মদত্তকে বুদ্ধের দন্ত প্রদান করেন। ব্রহ্মদত্ত ভক্তিপূর্বক সোমহদন্ত দন্তপুর নামক নিজের রাজধানীতে প্রতিষ্ঠা করলেন। ব্রহ্মদত্তের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরেরা দীর্ঘদিন উৎকল এবং তার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি শাসন করেছিলেন। সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই ওড়িশায় বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে। অল্‌তিগিরি, খণ্ডগিরি, ধৌলি প্রভৃতি জায়গায় আজও বৌদ্ধ নিদর্শনের ছড়াছড়ি।' একটু থামলেন অধ্যাপক বড়ুয়া। সমস্ত হলঘরটার চতুর্দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর পুনরায় আরম্ভ করলেন—'খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষে রাজা গুহশিব ওড়িশায় আধিপত্য করতেন। প্রথমে তিনি হিন্দু ছিলেন। একদিন হঠাৎ দেখতে পেলেন নগরবাসীবৃন্দ এক বিরাট উৎসবে মত্ত। দেখে তিনি বিস্ময় বোধ করলেন। কিছু বিশিষ্ট নাগরিককে ডাকিয়ে আনিয়ে গুহশিব জানতে চাইলেন—এত উৎসব এবং উল্লাসের কারণ কি? কলিঙ্গবাসী শ্রমণগণ—জানালেন যে এটাই দন্তমহোৎসব। তারপর তাঁরা রাজার কাছে বর্ণনা করলেন বুদ্ধদন্ত এবং বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস। অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল ঐ শ্রমণদের সঙ্গে রাজার। শেষে, গুহশিব আনত মস্তকে গ্রহণ করেছিলেন ভগবান বুদ্ধের সদ্ধর্মকে। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে গুহশিব যে বিরাট দন্তমহোৎসব প্রত্যক্ষ করেছিলেন, হিন্দুরা পরবর্তীকালে সেই উৎসবকেই রথযাত্রা উৎসবে রূপান্তরিত করেছে। আর, আজকে উৎকলের যে স্থানটিকে আমরা পুরী বলি, সেটিই হচ্ছে কলিঙ্গাধিপতি ব্রহ্মদত্তের রাজধানী দন্তপুর।' সমবেত প্রায় দুশো শ্রোতার চোখেমুখে ঔৎসুক্য ও কৌতূহলের ঝিকিমিকি। অজানা কত তথ্যই না পাওয়া যাবে আরও আজ এই বিদগ্ধ পণ্ডিতের মুখ থেকে।

কিন্তু অকস্মাৎ নারীকণ্ঠ বিঘ্ন সৃষ্টি করে বসল।

জয়ন্ত পেছনে তাকিয়ে দেখল—জপের থলি হাতে নিয়েই উঠে দাঁড়িয়েছে অপরেশ বর্ণিত সেই স্নব মেয়েটি।

'দলদাবংশ এবং দাথ-ধাতু বংশ দুটি গ্রন্থই পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। কিন্তু সেদুটির কোথাও তো এমন কথা লেখা নেই যে, বুদ্ধের দন্তোৎসবই পরে রথযাত্রায় পরিণত হয়েছে।' মেয়েটি অত্যন্ত নম্রস্বরে বলল।

বক্তব্যে বাধা পেয়ে চকিতে একবার তাকালেন বক্তা প্রতিবাদিনীর পানে। বললেন—'না, ওদুটি বই-এ তেমন কথা লেখা নেই অবশ্য। তবে ঐতিহাসিকদের অনেক কিছু অনুমান করেও তো নিতে হয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হান্টার আর ফার্গুসন স্পষ্ট বলে গেছেন—বুদ্ধদেবের দন্ত এই জগন্নাথ ক্ষেত্রেই ছিল। তাই পুরীধামেরই প্রাচীন নাম—দন্তপুর (Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol., XIX, P. 42; Fergusson's Architecture, P. 416)।

'কিন্তু দন্ত-উৎসবই যে পরে রথযাত্রার রূপ নিয়েছে এ কথা কি কোন ঐতিহাসিক লিখে গেছেন?'

'নিশ্চয় লিখে গেছেন! ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিক ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতের কথাই আমি আজকের সভায় বলেছি। তিনি লিখেছেন—বুদ্ধদেবের দন্তোৎসবই বর্তমান রথযাত্রা উৎসবের রূপ পরিগ্রহ করেছে।'

'কিন্তু এই রাজেন্দ্রলালই তাঁর Antiquities of Orissa গ্রন্থে বলেছেন—বুদ্ধদেবের জন্মোৎসবকে উপলক্ষ করেই রথযাত্রার সৃষ্টি হয়েছিল (Vol. 11, P. 135)। এখন আপনিই বলুন, কোন্‌টা সত্যি, দন্তোৎসব না জন্মোৎসব?' এই বলে একটু থেমে পুনশ্চ কথা কইল মেয়েটি—'আর, রাজেন্দ্রলালের কথার যখন এত মূল্যই দিচ্ছেন আপনি, তখন রাজেন্দ্রলাল যে বলেছেন—পুরীকে দন্তপুর বলে কখনই গ্রহণ করা যায় না, সে কথাটা কেন গ্রাহ্যের মধ্যে আনছেন না?'

'এমন কথা বলেছেন নাকি প্রত্নতাত্ত্বিক রাজেন্দ্রলাল?' অধ্যাপক বড়ুয়া বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি যখন দাথ-ধাতু বংশ পাঠ করেছেন, তখন আপনি নিশ্চয় জানেন—মালব দেশের এক রাজপুত্র বুদ্ধদন্ত দর্শন করবার জন্য দন্তপুরে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে গুহশিবের কন্যা হেমমালার বিয়ে হয়। মালব রাজকুমার তখন বুদ্ধদন্তের অধ্যক্ষ হয়ে দন্তকুমার নামে পরিচিত হন। স্বস্তিপুরের রাজা ক্ষীরধারের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুস্পুত্রগণ অপর চারজন রাজার সঙ্গে মিলে একযোগে দন্তপুর আক্রমণ করলেন বুদ্ধদন্তকে গুহশিবের হাত থেকে কেড়ে নিতে। রণক্ষেত্রে গুহশিবের মৃত্যু হল। তখন দন্তকুমার গোপনে রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে এক নদীতীরে বালির মধ্যে ঐ বুদ্ধদন্ত লুকিয়ে রাখলেন। পরে, গুপ্তভাবে হেমমালাকে নিজের কাছে আনিয়ে

নিয়ে, সেই দন্ত বালুকাবেলা থেকে উদ্ধার করে তাম্রলিপ্ত নগরে এলেন। সেখান থেকেই তিনি বুদ্ধদন্তসহ সস্ত্রীক অর্ণবপোতে সিংহল অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন।'

বড়ুয়া বলে উঠলেন—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ ইতিহাস তো আমরা দাথ-ধাতু বংশে পেয়েছি।'

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে আবার শুরু করল—'এই ইতিহাসের সূত্র ধরেই ডক্টর রাজেন্দ্রলাল বলেছেন—পুরীকে দন্তপুর বলে কখনই গ্রহণ করা যায় না। পুরী যদি দন্তপুরই হবে, তাহলে দন্তকুমার পুরী থেকে সুদূরবর্তী তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) নগর থেকে জাহাজে চাপতে যাবে কেন সিংহলে যাবার জন্য? মেদিনীপুরের অন্তর্গত বর্তমানে দাঁতন নামে যে স্থানটি আছে, প্রাচীনকালে সেটিই মনে হয় দন্তপুর ছিল। কারণ দাঁতন থেকে তমলুক বা তাম্রলিপ্ত খুবই কাছে অবস্থিত।'

'কিন্তু রথযাত্রা যে বৌদ্ধদের দন্তোৎসবেরই রূপান্তর মাত্র, এ কথাটা তো মেনে নিতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।' বড়ুয়া প্রশ্ন করলেন মেয়েটির দিকে তাকিয়ে।

'আপত্তি না থেকে উপায় কোথায়?' শ্রোতৃবর্গ কি ভাবতে পারে সে কথা চিন্তামাত্র না করেই, জবাব দিল মেয়েটি, 'প্রথমতঃ দাথ-ধাতু বংশ বা দালদা বংশের কোথাও এমন কথা লেখা নেই। দ্বিতীয়তঃ আপনি যে রাজেন্দ্রলালের ওপর নির্ভর করে হিন্দু-রথযাত্রাকে বৌদ্ধ দন্তোৎসবের পরিবর্তিত রূপ বলে প্রচার করতে চাইছেন, আমি একটু আগেই প্রমাণ করেছি, সেই রাজেন্দ্রলাল নিজেকে কন্ট্রাডিকট করে ঘোষণা করেছেন—রথোৎসব প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধ জন্মোৎসবেরই প্রকারান্তর। আবার রাজেন্দ্রলাল যে জন্মোৎসব বলেছেন, সেটাও তাঁর নিজের কথা নয়। তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বর্ণনা থেকে। ফাহিয়েন যেদিন পাটলিপুত্রে বুদ্ধের রথযাত্রা দেখেন, সেদিন নাকি ছিল ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের দিন।'

'তবে তো রথযাত্রাকে বৌদ্ধদের বুদ্ধজন্মোৎসবের নামান্তর বলে মেনে নিতে এখন আমাদের আর কোন বাধা নেই! যখন ফাহিয়েন স্বয়ং বলেছেন'— বড়ুয়ার কথা শেখ হওয়ার আগেই পুনর্বার মুখর হল তিলক-চর্চিতা—'কিন্তু অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিকরা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, ফা-হিয়েন পাটলিপুত্রে রথযাত্রা দেখেছিলেন ভগবান বুদ্ধের জন্মতিথিতেই—একথা সত্য হতে পারে, কিন্তু তাই বলে, বুদ্ধের জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করেই রথযাত্রার সৃষ্টি—একথা একেবারেই ঠিক নয়। কারণ ফাহিয়েনের পূর্বতন বৌদ্ধদের মধ্যে একসময়ে এ উৎসবের প্রচলন ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কারণকে উপলক্ষ করে বৌদ্ধরা রথযাত্রা উৎসব করতেন।' তমোনাশ সংঘের জেনারেল সেক্রেটারী অমিতাভ চৌধুরী চট্টগ্রামের মানুষ, একটু বৌদ্ধভাবাপন্ন। তাঁরই অনুরোধে পণ্ডিতপ্রবর ডঃ বড়ুয়া রাজী হয়েছেন আজকের এই সভায় মুখ্য বক্তা হতে। এখন সেই পরম মাননীয় অতিথির মুখের ওপর এক তিলকধারী বৈষ্ণবীর এমন চ্যাটাং চ্যাটাং জবাব—তাঁকে ক্রমেই অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। তিনি এবার উঠে দাঁড়িয়ে

অত্যন্ত বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন—'ফাহিয়েনের ভারত-পর্যটনের বিবরণ পড়েছেন কখনও?'

'পড়েছি।' উত্তর দিল মেয়েটি, 'এবং তারই সঙ্গে পড়েছি শ্রদ্ধেয় অক্ষয় দত্তের লেখা 'উপাসক সম্প্রদায়' নামের গ্রন্থটিও। এক প্রত্নতাত্ত্বিক ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র যখন তাঁর Antiquities of Orissa-য় (Vol. 11, P. 135) ঘোষণা করেছেন ফাহিয়েন পাটলিপুত্রে বুদ্ধপূর্ণিমায় দর্শন করেন রথযাত্রা, অতএব বুদ্ধের জন্মোৎসব থেকেই সৃষ্টি হয়েছে রথযাত্রার, তখন অন্যদিকে, অপর এক প্রখ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ অক্ষয়কুমার দত্ত মশাই তাঁর উপাসক সম্প্রদায়ে (২য় ভাগ, পৃ. ২৭২) লিখেছেন—চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী ফাহিয়েন ভারতে আসার পথে তাতার দেশের অন্তর্গত খোটান নগরে একটি বৌদ্ধরথ উৎসব দর্শন করেন। সেই রথেও তিনটি মূর্তি ছিল। খোটানের রথযাত্রা বছরের যে সময়ে এবং যতদিন ব্যাপি সম্পন্ন হত, পুরীর রথযাত্রাও ঠিক সেই সময়ে এবং ততদিন ধরেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এখন আপনারই বলুন—কার কথা ঠিক? বৌদ্ধদের রথ উৎসবটি অনুষ্ঠিত হত তবে কখন? বৈশাখী পূর্ণিমায় না আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়ায়?

জেনারেল সেক্রেটারী উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করেন—'এতবড় দুই প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতের সম্পর্কে এমন হেয়কর কথাবার্তা বলার উদ্দেশ্য কি আপনার? আমাদের এই সুন্দর সান্ধ্য সমাবেশকে নষ্ট করে দেওয়া?' 'আজ্ঞে না। নষ্ট কেন করব? ইতিহাসকে যাচাই করতে হবে যুক্তির পথে, তথ্য-প্রমাণকে ভিত্তি করে। তাই আমি কেবল ডঃ বড়ুয়ার কাছে নিবেদন করতে চেয়েছিলাম যে, দুই পরম মান্য প্রত্নতাত্ত্বিকের রথযাত্রার উৎসমুখ সম্বন্ধে বক্তব্যে এই যে বিরাট পার্থক্য, এর একমাত্র কারণ হচ্ছে—ওঁরা দুজনেই প্রাণপণে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, রথ উৎসবটি মূলতঃ বৌদ্ধ উৎসবই ছিল, পরবর্তী যুগে হিন্দুরা সেই উৎসবকেই জগন্নাথদেবের রথযাত্রায় পরিণত করেছে।'

'করেছেই তো!' বড়ুয়া বললেন, 'ফার্গুসন, হান্টার, কানিংহাম, রাজেন্দ্রলাল, অক্ষয় দত্ত প্রমুখ সর্বজন স্বীকৃত গবেষকবৃন্দের সকলেই একবাক্যে বলে গেছেন—রথযাত্রা আসলে বৌদ্ধ উৎসবের অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।'

'ঠিক বলেছেন অধ্যাপক বড়ুয়া।' জেনারেল সেক্রেটারী হাতের ওপর হাত ঠুকে বললেন—'বৌদ্ধযুগের আগে রথের ব্যবহারই ছিল না এ ভারতে। রথ বস্তুটাই বৌদ্ধদের সৃষ্টি আপনি হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির অন্ধকারে মন ভরিয়ে, পুরাণের যুগে এখনও হামাগুড়ি দিচ্ছেন, তাই আধুনিক পুরাবিদ্‌দের গবেষণার ফলাফল মেনে নিতে চাইছে না আপনার মন।'

ভারি খুশি হয়ে পৃদ্ম বলল জয়ন্তকে—'এইবার মানটা কোথায় থাকল ঐ স্নবটার, বলুন তো স্যার? দিয়েছেন তো মুখের মত জবাব ঐ জেনারেল সেক্রেটারী।'

শান্তকণ্ঠে মেয়েটি কথা বলল এবার। গলার স্বরে আশ্চর্য এক গাম্ভীর্যের ছোঁয়া

লেগেছে, লক্ষ্য করল জয়ন্ত। 'ইতিহাসের সত্যের সন্ধান যে করে, তার চোখে কোনরকমের গোঁড়ামির ঠুলি থাকলে, সত্য কখনই ধরা দেবে না তার কাছে। তাই ইতিহাসের বিশ্লেষণ যখন আমি করি, কোন গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় আমি দিই না তখন। যা কিছু বলেছি একটু আগে, গোঁড়ামির প্রভাব তার মধ্যে কোথাও নেই, নেই কোন ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত দেবার চেষ্টাও। কিন্তু এ আপনি কী বলছেন সেক্রেটারী মশাই? বৌদ্ধযুগের আগে রথের ব্যবহারই ছিল না এ ভারতে? রথ বস্তুটাই বৌদ্ধদের সৃষ্টি।'

'ঠিকই তো বলেছি।' সেক্রেটারী অমিতাভের পুনর্ঘোষণা।

'তাহলে পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ-এ আমরা বিষ্ণু ও সূর্যের রথের কথা জানতে পারি কেমন করে?

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই তো বেদের সৃষ্টি। কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় বল্লীর তৃতীয় মন্ত্রে আছে—'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।। এখানে এই যে রথের সঙ্গে শরীরের তুলনা করা হয়েছে এর থেকেই এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় নাকি যে, উপনিষদের যুগেও রথ ছিল? কঠোপনিষদ তো বৌদ্ধযুগের অনেক আগেই রচিত হয়েছিল। সুপ্রাচীন গ্রন্থ ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে—সত্যযুগে, অর্থাৎ বৌদ্ধযুগের বহু সহস্র বছর পূর্বেই, প্রহ্লাদ সর্বপ্রথম মহাবিষ্ণুর রথ টেনেছিলেন; তারপরে দেবতা, সিদ্ধ এবং গন্ধর্বগণও এই রথযাত্রার অনুষ্ঠান করেছিলেন। বুদ্ধের জন্মের বহু পূর্বেই জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথকে নিয়ে রথযাত্রা হয়েছিল। এসব কথা আপনার জানা নেই বলেই হয়তো আপনি একটু আগে বলে ফেল্লেন—বৌদ্ধযুগের আগে রথের ব্যবহারই ছিল না এ ভারতে। আর, রাজেন্দ্রলালও বোধ হয় বেদ-উপনিষদ সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতাবশেই লিখে বসে আছেন যে, রথযাত্রা আসলে বৌদ্ধদের সৃষ্টি।'

ক্ষণেকের জন্যে নীরব হল মেয়েটি। তার মস্ত দুই আঁখির গভীরে দপ্ দপ্ করে জ্বলছে প্রত্যয়-বহ্নি। সে বলে চলল—'ফার্গুসন, হান্টার, কানিংহাম না হয় বিদেশী ছিলেন, তাঁদের পক্ষে হয়তো ভারতের প্রাচীন যে সব ইতিবৃত্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভারতেরই অজস্র পুরাণগ্রন্থে তাদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়নি, তাই রথ এবং রথযাত্রা বিষয়ে বহু বিভ্রান্তিকর কথা বলে থাকতে পারেন তাঁরা। কিন্তু ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত—উভয়েই তো ছিলেন ভারতীয়! তাঁরাও কেমন করে ঐ পুরাণ-অজ্ঞ বিদেশীদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ঐ একই কথা ঘোষণা করতে একটুও দ্বিধা বোধ করলেন না? রথ আর রথযাত্রা যদি বৌদ্ধদের সৃষ্ট হয়, তবে, হরিভক্তিবিলাসে (বি ১৬/৩৩৮-৮৭) লেখা থাকে কেমন করে উত্থান-একাদশীতে শ্রীহরির উত্থানান্তে রথযাত্রার কথা? পদ্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে কেমনভাবে থাকে ভগবান বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণের রথোরাহণের কথা। রামায়ণ আর মহাভারতে কেমনভাবে থাকে রথের ছড়াছড়ি। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন অর্জুনের রথের

সারথী। প্রাচীন শৈব এবং জৈনদের মধ্যেও রথযাত্রা ছিল। পুরীর অদূরবর্তী ভুবনেশ্বরে প্রতি বছর অশোকাষ্টমীতে লিঙ্গরাজ মহাদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এখনও অন্ধ্রপ্রদেশের সিংহাচলম্-এর পর্বতশীর্ষে বরাহদেবের রথযাত্রা হয় এখনও উগাদির রাত্রে (ঐ অঞ্চলের নববর্ষকে উগাধি বলা হয়। আমাদের চৈত্রসংক্রান্তি অথবা পয়লা বৈশাখে সাধারণতঃ অন্ধ্রের উগাদিপর্ব উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে)। নেপালেও শৈব ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই নানা প্রকারের রথযাত্রা দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে বৌদ্ধদের রথযাত্রা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে প্রখ্যাত বিদগ্ধ পুরুষ ওল্ডফিল্ড তাঁর Sketches from Nepal-এ (Vol. 11, P. 316) সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন—'The Buddhist Festival is evidently adopted from the Hindu Festival of Jagannath......।' এরপরেও কি আপনারা বলবেন—বৌদ্ধযুগের আগে রথ বা রথ-উৎসবের কোন অস্তিত্বই ছিল না এই ভারতে? আপনারা তো সকলেই জানেন, পুরী থেকে মাত্র ১৯ মাইল দূরে অবস্থিত কোণারকের মন্দির। এ মন্দির নিজেই একটি সম্পূর্ণ রথ। রথের আকারে গড়া মন্দিরের চূড়া, দেহ—সব। রথচক্র শোভা পাচ্ছে মন্দিরের নিম্নাঙ্গে, এমনকি সাতটি প্রস্তর নির্মিত নয়নাভিরাম অশ্বও সংযোজিত ঐ মন্দির-রথটির সম্মুখভাগে। এ-মন্দির কিন্তু বৌদ্ধ মন্দির নয়, এখানে পূজিত হতেন সহস্রাংশু সূর্যদেব। বৌদ্ধযুগের আরম্ভেরও অনেক আগে লিখিত অজস্র প্রাচীন গ্রন্থে কে না পড়েছে সূর্যদেবের সপ্তাশ্বযুক্ত রথের কথা?'

মেয়েটি যে লাবণ্য-উজ্জ্বল তাতে কারুরই সন্দেহ থাকার কথা নয়। এখন সেই লাবণ্যের সঙ্গেই এসে মিশেছে আবার আত্মবিশ্বাস-রঞ্জিত এক দীপ্ত ব্যক্তিত্বের প্রখরতা, যা তার রূপকে করে তুলেছে আরও বেশি আকর্ষণীয়। জয়ন্ত লক্ষ্য করে দেখল, হল-এ উপস্থিত সকলের দৃষ্টিই এখন আবদ্ধ ঐ সপ্রতিভ যুবতীটির দিকেই।

'কি নাম ঐ মেয়েটির?' পদ্মকে প্রশ্ন করল জয়ন্ত।

'যাচ্ছেতাই নাম। কিন্নরী। এ নাম উচ্চারণ করতেও আমাদের লজ্জা হয়। এমন জঘন্য নাম যে কোন ভদ্রলোকের মেয়ের হতে পারে, এ ভাবাও.........' পদ্মের কথা শেষ হবার আগেই জয়ন্ত পুনশ্চ জানতে চাইল, 'ওর বাংলা উচ্চারণে একটু অবাঙালী অ্যাক্সেন্ট লক্ষ্য করেছি। কিন্নরীর পদবী কি?' 'কার্লেকার। কিন্নরী কার্লেকার। আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার। ঐ স্নবটা আসলে মারাঠী অথবা গুজরাতী কিছু একটা হবে। মুম্বাই না আমেদাবাদে কোথায় যেন ওর বাপের দুটো কাপড়ের মিল আছে। কলকাতায় মস্ত দোকান; মাদ্রাজ আর দিল্লীতেও বেশ বড় বড় ব্যবসা। তাই তো ওর এত দেমাক।'

একটু হেসে জয়ন্ত শুধালো—'কিন্নরীর সম্বন্ধে এত খবর তুমি পেলে কোত্থেকে?' 'বা রে, ও যে এম.এ.-তে আমার ক্লাসমেট ছিল। বি.এ.-তে এসে ভর্তি হল কলকাতার কলেজে। তারপর, অবাক হয়ে দেখলাম, দুই বছর যেতে না যেতে গড় গড় করে বাংলা বলতে শিখে ফেলল।'

কয়েক মুহূর্তের বিরতির পরে আবার কিন্নরী কণ্ঠ শ্রুত হতেই, জয়ন্ত কথা বন্ধ করে সকৌতূহলে দৃষ্টি তুলল বক্তার দিকে। কিন্নরী বলে চলল—'বৌদ্ধযুগের পূর্বেই যে রথ এবং রথ উৎসবের অস্তিত্ব ছিল কেবল আমাদের দেশেই নয়, ইউরোপের মত মহাদেশেও, যেখানে বৌদ্ধধর্মের কোন প্রভাবই কখনো পড়েনি বলা যেতে পারে, তারও প্রমাণ আমরা পেয়েছি বেশ কিছু গ্রন্থে। এখনও ইউরোপের সিসিলি দ্বীপে প্রতি বছর ভাদ্র মাসের প্রথম ভাগে এক বিরাট রথযাত্রার অনুষ্ঠান হয়। এ রথযাত্রা কয়েকশো বছরের ঐতিহ্যবাহী। আমাদের সূর্যদেবের রথে যেমন জ্যোতিশ্চক্র ও নবগ্রহের সন্নিবেশ দেখা যায়, সিসিলির ঐ সুবৃহৎ রথের ওপরেও ঠিক সেইরকম সূর্যচন্দ্রাদি নবগ্রহ ও জ্যোতিশ্চক্র শোভা পায়। ঐ রথযাত্রা চাক্ষুষ দর্শন করে প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিকা Henrietta Karaciolo তাঁর গ্রন্থে (Memories of Henrietta Caraciolo, P. 21) লিখেছেন—'A colossal car is dragged by a long team of buffaloes through the irregular and ill-paved streets. Upon this car erected a great variety of objects, such as sun, moon and principal planets, set in rotary motion and diminishing proportionately in size as they approach the summit of the structure...... But its functions recall to mind the famed car of Jagannath.'

জেনারেল সেক্রেটারী অমিতাভর বোধহয় ধৈর্যচ্যুতি ঘটল অকস্মাৎ। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন—'ঢের হয়েছে, আর পণ্ডিতি ফলাতে হবে না। ডঃ বড়ুয়া আমাদের সম্মানিত এবং নিমন্ত্রিত অতিথি। তাঁর অপমান আমরা আর সহ্য করব না কিছুতেই। আপনি হয় চুপ করুন, নয়তো বেরিয়ে যান এই ঘর থেকে।'

সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে এতক্ষণ নীরবে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ডঃ বড়ুয়া রইলেন। অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে বললেন—'সে কি কথা, ও আমায় অপমান করল আবার কখন? ও তো কেবল আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে ওর যুক্তিগুলো তুলে ধরছে।'

হাসিমুখে কিন্নরী জানালো সেক্রেটারীকে—'আপনার বোধ হয় জানা নেই, আমি ডঃ বড়ুয়ার একজন ছাত্রী।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্নরী আমার কাছে পালি ভাষা শিখেছে দুই বছর ধরে। ও আমায় যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। বৌদ্ধশাস্ত্র পড়বার জন্যেই ওর যে এই পালি ভাষা শেখা—তাও ও বলেছে আমার কাছে?' মুখ্য বক্তা একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতিকে সামাল দেবার চেষ্টা করছেন, বোঝা গেল।

অমিতাভ কিন্তু উত্তেজিত স্বরেই আবার বললেন—'তাই বলে আজকের এই দন্তমহোৎসবের সভাটাকে উনি এমনিভাবে পণ্ড করে দেবেন?'

'পণ্ড কিছুই হয়নি। কিন্নরীর যা বক্তব্য তা তো শোনাই গেল। আসছেকাল আবার এইখানেই আজকের মত সভা বসুক। আমি কিন্নরীর সামনে ঐতিহাসিক যুক্তি দিয়েই প্রমাণ করে দেব যে, কেবল রথযাত্রা নয়, জগন্নাথ নয়, জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার মুর্তিগুলিও বৌদ্ধধর্মমূলক।' ডঃ বড়ুয়া বললেন—'পুরীর জগন্নাথের মন্দিরটাও আসলে বৌদ্ধদের মন্দির ছাড়া আর কিছুই নয়।' জয়ন্ত দেখল, ডঃ অনিলকান্তি বড়ুয়ার কথা শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কিন্নরী দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হল ঘর থেকে। আর ঠিক তার পরেই একটা উদ্ভট প্রশ্ন দুরন্ত গতিতে কোথা থেকে ছুটে এসে বার বার হানা দিতে লাগল জয়ন্তের মস্তিষ্কের কন্দরে কন্দরে। মেয়েটিকে কি কোথাও দেখেছে সে এর আগে?

জেনারেল সেক্রেটারীকে ঘিরে ধরেছে জনা তিরিশেক বিভিন্ন বয়সী মেয়ে-পুরুষ ওদিকে। অনেকেরই উত্তপ্তকণ্ঠে শোনা গেল একই কথা—এইসব শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তদের সভায় ঐরকম মান্ধাতাযুগে বাস করা তিলককাটা বৈষ্ণবীকে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে কেন? দিল তো আজ দম্ভোৎসব-আয়োজনের উদ্দেশ্যটাই নষ্ট করে? জনৈক স্যুটপরিহিত টাইধারী মধ্যবয়সী ভদ্রলোক তাঁর দক্ষিণ হস্ত শূন্যে আন্দোলিত করে, উচ্চৈস্বরে, অনেকটা শ্লোগান দেওয়ার ঢং-এ ঘোষণা করলেন—'আসছে কাল ওকে আমরা এ সভায় বসতে দেব না কিছুতেই।'

অপরেশ এতক্ষণ মুখ্য বক্তার কাছাকাছি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ডঃ বড়ুয়ার গাড়ি শব্দ তুলে গেট-এর বাইরে চলে যেতেই সে এসে হাজির হল জয়ন্ত এবং পদ্মের সামনে। এসেই বলল—'দেখলেন তো স্যার। তিলকটানা ঐ মেয়েটা একটা কত বড় স্নব? এমন একটা চমৎকার ফাংশনকে দিল একেবারে ডুবিয়ে ডাব করে?' এই বলে একবার থামল সে। তারপর গলা নামিয়ে ফিস্‌ফিস্ করল—'কাল দেখবেন বড়ুয়া সাহেবের হাতে কেমন নাকানিচোবানি খায় ঐ মেয়েটা। হ্যাঁঃ, ডঃ বড়ুয়ার মত মহাপণ্ডিতের সঙ্গে তর্কে নামা। আর, তাছাড়া, আমাদের তমোনাশ সংঘ থেকেও কিছু ব্যবস্থা করা হচ্ছে ও মেয়েকে ঠান্ডা করার।'

বিস্মিত সুরে জয়ন্ত জানতে চাইল—'সে আবার কি? তোমরা আবার কি ব্যবস্থা নিচ্ছ?'

'দেখতে পাবেন কাল, স্যার। আমাদের ফাংশন নষ্ট করা চেষ্টা করলে ওর থোঁতা মুখ আমরা ভোঁতা করে ছাড়ব।' রাগে গস্‌গস্ করতে করতে কথাগুলো উচ্চারণ করল সম্ভ্রান্ত সন্তান সদ্য এম.বি.বি.এস. পাশকরা ডাক্তার অপরেশ।

।। দুই।।

ক্রিষ্টোফার রোডে প্রত্যাবর্তনের মুখে একবার ইচ্ছা করেই খাড়াগির্জা এবং শেয়ালদার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিস্তৃত জনাকীর্ণ রথের মেলা দেখতে গেল জয়ন্ত। নানা প্রকারের পণ্য সাজিয়ে বসেছে পসারী আর পসারিণীর দল। নাগরদোলা, চড়কীঘোড়া, ছোট ছোট

তাঁবুর মধ্যেথেক আজব সব বাজীকরদের মাইক-গর্জন—'আসুন, আসুন, আর দেরি করবেন না'। গ্যাস বেলুন, রকমারী পুতুল, খেলনা, গরম গরম পাঁপর ভাজা—সব মিলিয়ে গম গম করছে জগন্নাথের রথযাত্রার মেলা। জয়ন্তের হঠাৎ মনে হল—এই লোকারণ্যের মধ্যে এমন একটি লোকও কি পাওয়া যাবে যে একবারও ভেবেছে আজ—এই রথযাত্রা আসলে বৌদ্ধ-উৎসব? অথবা হিন্দু উৎসব? জগন্নাথদেব স্বয়ং বিষ্ণু, না বুদ্ধ?

ক্রিষ্টোফার রোড অধ্যাপক বন্ধুর গৃহে ফিরে গিয়ে নৈশাহারান্তে—অতীত দিনের দুই সহপাঠী যখন অতীতের অজস্র ঘটনাপ্রবাহ পরিক্রমায় উজ্জ্বল এবং উদ্দীপ্ত, তখনই, কথায় কথায়, হঠাৎ আজকের অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করল জয়ন্ত বিস্তারিতভাবে। শুনে, অধ্যাপক দীনেশ ভট্টাচার্য্য আপন মনেই একবার বিড়বিড় করল যেন—'তিলককাটা তরুণী বলছিস? আমাদের কিন্নরী নয় তো?'

জয়ন্ত সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—'হ্যাঁরে, অপরেশ তো ঐ মেয়েটার ঐ নামই বলেছিল আমাকে। কিন্নরীকে তুই চিনিস তবে?'

'শুধু চিনব কেন, ওর সমস্ত কিছুই আমি জানি। আমার কাছে প্রায়ই তো আসে ইংরেজী সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করতে। কোটিপতির কন্যা বলা যেতে পারে। বালিগঞ্জে লেক-এর ওপর অত বড় অট্টালিকায় বাস করে, প্লেনে যাতায়াত করে মুম্বাই, চেন্নাই, দিল্লী, আহমেদাবাদ। ওর ব্যবহারের জন্যেই ওর বাবা ওকে একটা অতি আধুনিক ডিজাইনের গাড়ি কিনে দিয়েছেন। কিন্তু গত প্রায় দুই বছর ও ট্রামে-বাসে পথ চলে, কোথাও যেতে হলে ট্রেনে যায় সেকেণ্ড ক্লাসে। এ এক অদ্ভুত কাণ্ড।'

'সেকি? দীর্ঘ দু'বছরের মধ্যে একবারও কিন্নরী বাবার দেওয়া মোটরগাড়িতে চড়েনি?' জয়ন্তের বিস্ময় তুঙ্গে উঠছে ক্রমেই।

'না। পায়ে জুতো পরে না, সাদা কাপড় ছাড়া অন্য পরিধেয় ব্যবহার করে না। কপালে আঁকছে রসকলি, হাতে চলছে নামজপ প্রায় সর্বক্ষণ।' 'হঠাৎ এমন পরিবর্তনর কারণ?'

'ওর সমবয়সীরা ওর এই পরিবর্তন সম্বন্ধে অনেক কথা বলে। কেউ বলে কোন বাবাজী ওকে চেলা বানিয়েছে বোধ হয়, কেউ বলে ইস্কনের পাল্লায় পড়েছে। কিন্তু ওকে জিজ্ঞেস করে আমি যে জবাব পেয়েছি, তার সঙ্গে এসবের কোন মিলই নেই।'

বন্ধুপত্নী এতক্ষণ অদূরে মোড়ার ওপর বসে নীরবেই সব শুনছিলেন। তিনি বললেন—'কিন্নরী বলে, ও নাকি জগবন্ধু-ব্রত নিয়েছে। যতদিন না এই ব্রত উদ্‌যাপিত হবে, ততদিন এমনিভাবেই ও জীবন কাটাবে। কী পাগল মেয়ে বলুন তো। ওর মা এসে দুইবার আমার আর আপনার বন্ধুর কাছে কান্নাকাটি করে গেছে। মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। জামাই যে হবে, সে নাকি এই অল্প বয়সেই মস্ত নামকার এক কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, রূপেও নাকি সে কার্তিক। পাত্রপক্ষ বিয়ের শুভ কাজ

শেষ করতে চায় অবিলম্বে, কিন্তু কন্যা তো ধরে বসে আছে এক কঠিন ব্রত। কবে যে ওর ব্রত শেষ হবে তা ভগবানই জানেন।'

জয়ন্ত অনেকের মুখে অনেকরকম ব্রতের নাম শুনেছে, কিন্তু জগবন্ধু ব্রতের কথা শোনেনি তো কখনও!

সে শুধালো—'জগবন্ধুব্রতের নাম কি তুই আগে কোথাও শুনেছিস, দীনেশ?'

'না। ব্রতের এই অদ্ভুত নাম শুনে আমিও জানতে চেয়েছিলাম মেয়েটার কাছে, এ-ব্রত গ্রহণ করতে বলেছে ওকে কে? তা, ও জানালো, পুরীতে ও যখন ঠাকুরমার সঙ্গে গিয়েছিল বছর দুই আগে, তখনই ওর সঙ্গে পরিচয় হয় অনিন্দ্য আপ্পারাও নামে এক আশ্চর্য যুবকের। যে যুবক রাত্রিদিন পড়ে থাকে জগন্নাথের মন্দিরের কূর্মবেড়ের ভেতরে হয় মুক্তিমণ্ডপ নয়তো জগমোহনে, কিংবা একেবারে মণিকোঠায়—রত্নবেদীর আনাচে কানাচে। সেই ছেলেটির কাছ থেকেই নাকি এই জগবন্ধু ব্রত গ্রহণ করতে উৎসাহ পেয়েছে, উদ্বুদ্ধ হয়েছে কিন্নরী।' অধ্যাপক থামল তারপর একটু হেসে শুধালো—'একটু বেশি interested হয়ে পড়েছিস ঐ মেয়েটি সম্বন্ধে, মনে হচ্ছে।'

জয়ন্ত তৎক্ষণাৎ জবাব দিল—'ঠিক বলেছিস। সভায় ওর গভীর পড়াশোনা এবং সাবলীল বলার ভঙ্গি দেখেই প্রথমে interested হয়ে পড়েছিলাম। এখন তোদের মুখে ওর সম্পর্কে এতকিছু শোনার পর মনে হচ্ছে ক্রমেই বেশি interested হয়ে পড়ছি।'

এই বলে, কি যেন একটু ভেবে নিয়ে, জয়ন্ত আবার প্রশ্ন করল—'আচ্ছা, কাল সকালে ওকে তোর এখানে একবার আনতে পারিস না?'

'নিশ্চয় পারি। কিন্তু কেন বলতো? তুই তো অল্পবয়সী মেয়ে দেখলে সাত হাত দূরে পালাস, এটাই আমার জানা। আজ হঠাৎ তোর কি হল?' বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে রঙ্গ করতে উদ্যত।

চিন্তিত মুখে জয়ন্ত বলল—'কিন্নরীকে আগামীকালের সভায় যেতে মানা করতে হবে। অপরেশের কথায় জানতে পেরেছি—কাল যদি ও ডঃ বড়ুয়ার কথার ওপর কোন কথা বলার চেষ্টা করে, তাহলে, ঐ তমোনাশ সংঘের কিছু সভ্যই ওর চূড়ান্ত অসম্মান করবে। এটা মেয়েটাকে জানিয়ে দেওয়া আমার একান্ত কর্তব্য।'

'তুই নিশ্চিন্ত থাক্, জয়ন্ত, কাল সকালেই আমি ফোন করে কিন্নরীকে আনিয়ে তোর সামনে হাজির করব।' দীনেশ অভয় দিল জয়ন্তকে।

পরদিন ভোর থেকেই আকাশ কালো করে শুরু হয়ে গেল মেঘের দাপাদাপি। বেলা একটু বাড়তেই আরম্ভ হল প্রবল বর্ষণ। তারই সঙ্গে দুরন্ত বাতাসের ঝাপ্টা।

দাড়ি কামাতে কামাতে গালে-মাখা সাবান নিয়েই উঠে এসে একবার নৈরাশ্য জ্ঞাপন করে গেল অধ্যাপক—'টেলিফোন তো আমি করে দিয়েছি সকাল ছ'টাতেই, কিন্নরীও আসবে বলেছে। কিন্তু এমন সাংঘাতিক বৃষ্টির মধ্যে ও আসতে পারবে বলে তো মনে হয় না আমার।'

ঠিক ন'টায়, কাকভেজা হয়ে দীনেশের গৃহে এসে প্রবেশ করল কিন্তু কিন্নরী ঠিকই, হাসতে হাসতে। মাথার চুল, গায়ের কাপড় জলে ভিজে সিঁটিয়ে গিয়েছে একেবারে। বৃষ্টির ধারা বিকৃতি ঘটিয়েছে কপালের রসকলির। তবু মেয়েটি যে অতুল লাবণ্য আর সৌন্দর্যের অধিকারিণী, তা তাকে এই অবস্থাতেও দেখে বুঝতে কষ্ট হল না জয়ন্তের।

আর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তের মনের গভীর থেকে হুস্ করে শুশুকের মত ভেসে উঠল গত সন্ধ্যার সেই প্রশ্নটিই—মেয়েটিকে কি এর আগে দেখেছে সে কোথাও?

ব্যস্ত হয়ে অধ্যাপক গৃহিণী বললেন—'কি কাণ্ড বলো তো। এত বৃষ্টির মধ্যেও গাড়িতে না এসে ট্রামে-বাসে এলে? দাঁড়াও, আমার একটা শাড়ি এনে দিচ্ছি, ভিজে কাপড়টা ছেড়ে ফেল।'

'তোমার তো রঙিন কিংবা পাড় বসানো শাড়ি, ওসব তো এখন আমার পরার উপায় নেই, বৌদি, আমি যে ব্রতে আছি। আমি ভিজে কাপড়ে এই মাটিতেই বসছি।' বলে, দীনেশের দিকে চোখ ফিরিয়ে হেসে শুধালো—'বলুন, দাদা, কেন ডেকেছেন আমাকে।' সঙ্কোচ কণ্টকিত কণ্ঠে অধ্যাপক বললেন—'ডেকে যে কত বড় অন্যায় করেছি, তা তো বেশ বুঝতে পারছি এখন। কিন্তু, কি করব বোন, আমার এককালের সহপাঠী বন্ধু এই জয়ন্ত যে তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল কাল রাত্রে।' এই বলে, ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা জয়ন্তকে দেখিয়ে দিল। চকিতে মুখ ঘুরিয়ে জয়ন্তের পানে তাকিয়ে তাকে নমস্কার জানাতে গিয়ে কিন্নরী যেন পাথরের মূর্তিতে পরিণত হল একমুহূর্তে। বিস্ময় স্ফূরিত অধর থেকে তার কেবল একটি শব্দই বের হতে শোনা গেল—'মা...স্টা...র...ম...শা...ই!'

দীনেশ বলল—'সেকি? জয়ন্ত তোমার মাস্টার হবে কেমন করে? ওতো বাংলার বাইরেই কাটিয়েছে সারাজীবন। এখন ওর ঠিকানা হচ্ছে ওড়িশার পুরী শহর।'

নিমেষে নিজেকে সামলে নিয়ে, ছুটে গিয়ে সে প্রণাম করে বসল জয়ন্তের পায়ে হাত দিয়ে। তারপর বলল দীনেশকে—'এঁর কাছে পড়বার সুযোগ পাব, এমন ভাগ্য করে আমি আসিনি দাদা, এ পৃথিবীতে। তবে, সুরাটে ইনি যখন কলেজে পড়াতেন, তখন, শেঠ নয়ন চাঁদের একমাত্র সন্তান চম্পাবেন ছিল এঁর ছাত্রী। চম্পা আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিল, আমার বয়েস তখন দশ কি এগারো হবে। চম্পাবেন ওঁকে মাস্টারমশাই বলে ডাকত, আমরাও তাই মাস্টামশাই-ই বলতাম।'

'তুমি খুব ভাল গর্বা নাচতে, না? আর রঙ্গোলিতে তোমার হাত ছিল খুবই সূক্ষ্ম?' স্মৃতির সমুদ্রে সাঁতরাতে সাঁতরাতে হঠাৎ যেন পায়ের তলায় মাটি পেয়ে গেছে, এমনিভাবে কথা কইল জয়ন্ত—'আমি যে কলেজে পড়াতাম, সেই কলেজেরই অধ্যাপিকা ছিলেন তোমার কাকীমা শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী কার্লেকার। তুমি থাকতে তোমার বাবার কাছে আমেদাবাদে। গরমের ছুটি, পুজোর ছুটি আর বড়দিনের ছুটিতে সুরাটে গিয়ে কাকীমার সঙ্গে কাটাতে।

'এত কথা আপনার মনে আছে মাস্টারমশাই?' কিন্নরীর দুই চোখের ভাষায় অবাক হওয়ার ছবি।

'কোন্ চম্পার কথা বলাবলি করছিস তোরা জয়ন্ত? যাকে নিয়ে তুই তোর বই লিখেছিস 'কণ্টক-পথে'।'

জয়ন্ত ঘাড় নাড়িয়ে বুঝালো—'হ্যাঁ।'

'তুমি গতকাল দন্তমহোৎসবের সভায় যা কিছু বলেছ, সবই যুক্তিগ্রাহ্য। কিন্তু, তুব, আমি তোমাকে অনুরোধ করব—আজকে সভায় না যেতে।' জয়ন্ত কাজের কথা পাড়ল।

'যেতে মানা করছেন আপনি? কিন্তু, কেন মাস্টারমশাই?'

'গেলেই তুমি হয়তো কিছু না কিছু বলতে চাইবে ডঃ বড়ুয়ার কথার ওপরে, তখনই শুরু হবে গোলমাল। তমোনাশ সংঘের সভ্যরাই হয়তো তোমায় অপমান করে বসবে।'

একটু হাসল মেয়েটা। তারপর বলল—ব্রতিনীর কোন মান-অপমান বোধ রাখতে নেই, মাস্টারমশাই। আমি যে জগবন্ধু-ব্রতচারণ করছি এখন।'

'এ-ব্রতের অর্থই তো আমি বুঝতে পারছি না।'

আবার হেসে কিন্নরী জানালো—'পুরীর ঐ গগনচুম্বী মন্দিরের মধ্যে যুগ যুগ ধরে বসে ভক্তদের হৃদয়-ঢালা পুজো আর প্রণাম গ্রহণ করছেন যে আশ্চর্য বিগ্রহ জগন্নাথ, তাঁকে ঘিরে রয়েছে এক দুর্ভেদ্য রহস্যের কুহেলিকা ঐ যুগ যুগ ধরেই। আমি ব্রত নিয়েছি সেই রহস্য-জাল ছিন্ন করার। কতখানি পারব জানিনে, তবে, চেষ্টার কোন ত্রুটি আমি রাখব না।' 'এই রহস্যের কুহেলিকা বলতে তুমি কি বলতে চাচ্ছ সেটা আমাদের বোঝাও—' দীনেশ কৌতূহল প্রকাশ করল।

সিক্ত বসন থেকে জলের ধারা নেমে জলময় করে তুলছে মেঝেটাকে। সপসপে ভিজে চুলের রাশি থেকে জলস্রোত বইছে কপাল আর কপোলের ওপর দিয়ে। ওসব দিকে খেয়ালই নেই মেয়েটার। আবেগভরা স্বরে সে বলল—'করুণাসিন্ধু জগবন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতি জগন্নাথের সবকিছুই হেঁয়ালীতে ভরা। প্রথমেই দেখুন জগন্নাথ কতগুলি ধর্ম আর সম্প্রদায় দ্বারা পূজিত হচ্ছেন। বৈদিক হিন্দুদের সমস্ত জাতি এবং সম্প্রদায় তো জগন্নাথকে পুজো করেই থাকে, অবৈদিক যারা অর্থাৎ যেসব ধর্ম ও সম্প্রদায় বৈদিক কর্মকাণ্ডের ঘোর বিরোধী—সেই বৌদ্ধ, জৈন এবং আদিবাসীরাও দলে দলে এসে ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করেন আমাদের রহস্যময় জগবন্ধুর রত্নবেদীর মূলে। সারা বিশ্ব আমি ঘুরে বেড়িয়েছি বাবার সঙ্গে, কোন মন্দির, মসজিদ, গির্জা বা প্যাগোডায় তো এমনটি ঘটতে দেখিনি। এ এক রহস্য নয়?'

দীনেশ সংশয় প্রকাশ করলেন—'সম্রাট অশোকের সময় থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পড়েছিল শুনেছি জগন্নাথক্ষেত্রে, সেই কারণেই হয়তো জগন্নাথ বৌদ্ধদেরও পূজ্য হয়ে

উঠেছিলেন, কিন্তু জৈনরা যে জগন্নাথ-ভক্ত ছিলেন কোনদিন, এমন কথা তো পড়িনি কোথাও।' 'উৎকলে জৈনধর্ম তার উৎকর্ষের চরমসীমায় পৌঁছেছিল খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাশক্তিধর অধিপতি মহামতি খরবেলার রাজত্বকালে। তাঁরই প্রভাব পড়ে মহাতীর্থ জগন্নাথ ক্ষেত্রেও। আজও সেই প্রভাব সমানভাবেই কাজ করে চলেছে। সারাবছর শত শত জৈনধর্মাবলম্বী এসে দর্শন করছেন জগন্নাথকে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম মূলতঃ নাস্তিক ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও পুরীর মন্দিরে তাঁদের প্রবেশে কোন বাধা নেই। ভুবনেশ্বরের অদূরে উদয়গিরি পাহাড়ের চূড়োয় যে হস্তীগুম্ফা আছে, সেখানেই খরবেলার একটি প্রস্তর লিপিতে জগন্নাথ এবং তাঁর রত্নবেদীকে 'জিন্-আর্সন' বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, আপনারা জানেন নিশ্চয়ই।'

জয়ন্ত ক্রমেই বুঝতে পারছে—এত অল্প বয়সেও মেয়েটির ইতিহাস জ্ঞানের পরিধি কিন্তু অল্প নয়। সে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল—'জগন্নাথকে ঘিরে আর কোন্ কোন্ রহস্য রয়েছে, এবার বলো।'

'ভারতের সমস্ত মন্দিরেই সাধারণতঃ একটি দেব অথবা একটি দেবী পূজিত হন—কেবলমাত্র পুষ্করতীর্থ ও আয়াপ্লেনের মন্দির ছাড়া। এই দুই মন্দিরের প্রতিটিতে দুইটি দেবতার সমন্বয় ঘটিয়ে একই রূপে পুজো করা হয়। কিন্তু জগন্নাথ একাই পূজিত হন কখনো বুদ্ধ কখনো জিনাসন রূপে। কখনো বা হিন্দুদের প্রধান সবকটি সম্প্রদায়ে পূজনীয় মুখ্য দেবতা হিসেবে। বলা হয়, যখন রত্নবেদীতে অবস্থান করেন জগন্নাথ, তখন তিনি নারায়ণ বা বিষ্ণু; স্নানযাত্রার সময় স্নানবেদীতে যখন বিরাজমান, জগন্নাথ তখন গণপতি, নবকলেবরের সময় জগন্নাথ হন রুদ্র বা শিব, শয়ন একাদশীতে জগন্নাথ পূজিত হন শক্তি অথবা দুর্গা রূপে, আবার এই জগন্নাথই যখন রথারূঢ়, তখন তাকে পুজো করা হয় ভাস্কর বা সূর্য রূপে। এছাড়া, অনার্যদের দেবতা নরসিংহ হিসেবেও পুজো পেয়ে থাকেন এই একই জগন্নাথ। সারা পৃথিবীর মধ্যে এমন আর একটি বিগ্রহের কথাও কি আপনাদের জানা আছে—যে বিগ্রহকে কেন্দ্র করে ঘটেছে এতগুলি ধর্ম ও সম্প্রদায়ের একাত্মতা এবং সন্নিবেশ? বৌদ্ধ, জৈন যেমন ভাবছেন জগন্নাথ তাঁদের পূজ্য, তেমনি বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গণপৎ এবং সূর্য উপাসকরাও একইসঙ্গে মেনে নিয়েছেন—জগন্নাথ তাঁদের আরাধ্য দেবতা। একটি বিগ্রহে এতগুলি মত আর পথের মিলন সংঘটিত হল কেমন করে? এ-রহস্য ভেদ করবে কে?' মুহূর্তের জন্য নীরব হল কিন্নরী।

বাইরে মুষলধারায় বৃষ্টি ঝরছে অবিরাম।

দীনেশ বলল—'জগন্নাথকে বৈষ্ণব এবং শৈবরা পূজনীয় বলে ভাবে, এটা আমার অজানা নয়, কিন্তু গাণপৎ আর শাক্তদেরও তিনি যে পূজ্য তার প্রমাণ তুমি পেয়েছ কি কোথাও?'

'নিশ্চয়ই পেয়েছি। ওড়িয়া ভাষায় লেখা **'দার্ঢ্যতা-ভক্তি'** নামক গ্রন্থে একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। কর্ণাট দেশের কানিয়ারি গ্রামের গণপতি ভট্ট ছিলেন এক গাণপত্য ব্রাহ্মণ। তিনি স্নানযাত্রার দিন পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ বা দারুব্রহ্মকে গণপতি মূর্তিতে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন—গণেশ মূর্তিতে যখন দর্শন দিলেন না দারুব্রহ্ম বহুদূর থেকে বহু কষ্ট স্বীকার করে আসা এই গাণপৎ ব্রাহ্মণকে, তখন, আমি ধরেই নিলাম—নীলাচলে ব্রহ্ম নেই। দার্ঢ্যতা-ভক্তি আরও বলছে, ব্রাহ্মণের এই কথা শোনার পরেই নাকি দারুব্রহ্ম গণপতি মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই গাণপত্য ব্রাহ্মণের সামনে। এখনও প্রতি বছর সেই ঘটনারই ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে স্নাযাত্রার সন্ধ্যায় ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু জগবন্ধুকে গণেশ বেশে সাজানো হয় মহা আড়ম্বরে। প্রাচীন ঐ গ্রন্থটিতে বর্ণিত ঘটনার মধ্যে অতিরঞ্জন কিছু থাকতে পারে, কিন্তু ঐ কাহিনী থেকে এ সত্যটুকুর সন্ধান তো আমরা ঠিকই পাচ্ছি যে, জগন্নাথকে গাণপত্য-সম্প্রদায়ের লোকেরা গণপতিরূপে মেনে নিয়েছেন।' এইবার হঠাৎ অধ্যাপক গৃহিনী বলে বসলেন—'কিন্তু তোমার ঐ কথাটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিনে, কিন্নরী।'

'কোন্ কথাটা, বৌদি?'

'ঐ যে তুমি বললে—জগন্নাথকে পুজো করা হয় শক্তিরূপেও। একথা কখনই ঠিক নয়। পুরীতে গিয়েছি তিন-চার বার, জগন্নাথ সম্পর্কে লেখা বইও যে পড়িনি, তাও নয়। জগন্নাথকে সকলেই মানে বিষ্ণু বলে। বিষ্ণু তো পুরুষ, তাকে আবার দুর্গা বা কালী বলে লোকে পুজো করবে কেন? জগন্নাথের মন্দিরটা হচ্ছে বৈষ্ণবদের মন্দির, ওখানে শাক্ত মতে পুজো হবে কেমন করে?'

একটুও উত্তেজনা প্রকাশ না করে, স্মিত হাস্যেই জবাব দিল কিন্নরী—'করে, বৌদি, করে। আর সেটাই তো জগন্নাথকে ঘিরে থাকা আর একটি রহস্য। তুমি লক্ষ্য করে দেখোনি—জগন্নাথকে নোলক পরিয়ে রাখা হয়, তাঁর অঙ্গে চড়ানো হয় শাড়ি। রামনবমী আর জন্মাষ্টমীর আগের দিন জগন্নাথকে নিবেদন করা হয় জেউড়-ভোগ। যে জেউড় ফল খাওয়ানো হয় উৎকলে কেবলমাত্র আসন্নপ্রসবা নারীকে—তার সন্তান প্রসবকে তরান্বিত করতে।'

'ওমা, তাই নাকি? এমন কথা তো কখনো শুনিনি!' অধ্যাপক পত্নীর বিস্ময় প্রকাশ।

'হ্যাঁ বৌদি, আরও আছে। জগন্নাথের মন্ত্রে জগন্নাথকে দক্ষিণা কালী বলা হয়েছে এক জায়গায়। দক্ষিণা কালী হচ্ছেন আমাদের কলকাতার কালীঘাটের মা কালী। কেন জগন্নাথকে কেবল কালী না বলে দক্ষিণা কালী বলা হল? এবার, একবার চোখ বন্ধ করে, কালীঘাটের কালীমূর্তি আর নীলাচলের জগন্নাথ মূর্তিকে পাশাপাশি রেখে চিন্তা করে দেখো—এই দুটি মূর্তির গড়ন এবং ভাবের মধ্যে যেন কোথায় একটা গভীর মিল। কেন এই মিল, তা অবশ্য বলার সাধ্য আমার নেই।' নিজের মাথার চুলের

খোঁপাটা খুলে ফেলল একটানে কিন্নরী—বোধ হয় যাতে মাথাভর্তি জল ঝরে যায় পিঠে ছড়ানো ঐ চুলের মধ্যে দিয়, সেই উদ্দেশেই। তারপর পুনশ্চ কথা কইল সে—'তোমার বোধ হয় জানা নেই, বৌদি, জগন্নাথের বীজমন্ত্রে বিষ্ণু এবং দুর্গা দুজনেই আছেন। আবার দেখো বলা হচ্ছে—বিমলা ভৈরবী যত্র, জগন্নাথস্তু ভৈরবম্। জগন্নাথকে ভৈরব অর্থাৎ দুর্গার পতি শিবরূপেও পুজো করা হচ্ছে। তোমাদের কি জানা আছে—প্রতি বছর দুর্গাপুজোর সময়, মহাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী এবং মহানবমী তিথিতে রাত বারোটার পরে, জগন্নাথের শয়নপর্ব সম্পন্ন হলে, রোজ দুটি করে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়, জগন্নাথ মন্দিরের চত্বরেই বিমলাদেবীর সামনে। এখন বুঝতে পারছ তো, জগন্নাথ কাল্ট কতগুলি কাল্টের। কতবড় সমন্বয়। বৈষ্ণব, শৈব আর শাক্ত—যে তিনটি মুখ্য সম্প্রদায়কে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমরা দেখতে পাই কেবল বিবাদ-বিসম্বাদে মত্ত থাকতে, আমরা দয়াল প্রভু জগৎবন্ধুর ছত্রচ্ছায়ায় এসে, তারা সব বিদ্বেষ-সংঘর্ষ ভুলে, পরস্পর পরস্পরকে আবদ্ধ করেছে গভীর প্রেমালিঙ্গনে তারা একাকার হয়ে নাম গ্রহণ করেছে—দারুব্রহ্ম জগন্নাথ।' এই পর্যন্ত বলে, ভক্তিআপ্লুত চক্ষু নিমীলিত করে, বোধ হয় সেই বিশ্ববন্দিত নীলাচলনাথের উদ্দেশ্যেই দুই কর একত্রিত করে প্রণতি নিবেদন করল—ভাবে বিভোর মেয়েটা।

একটু আগেই প্রশ্ন করেছিল কিন্নরী—সারা পৃথিবীর মধ্যে এমন আর একটি বিগ্রহের কথাও কি জানা আছে আপনাদের—যে বিগ্রহকে কেন্দ্র করে ঘটেছে এতগুলি ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের এমনি গভীর একাত্মতা আর সন্নিবেশ? এখন জয়ন্ত বুঝতে পারছে—ঐ প্রশ্নটার সূতিকাগার কোন ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসের মধ্যে নিশ্চয়ই নয়। অনেক বিচার-বিশ্লেষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে যে সত্যানুসন্ধান, তারই ফলশ্রুতি ঐ প্রশ্ন।

আঁচলের জল নিঙড়ে ফেলে, সেই আঁচল দিয়ে নিজের চোখ-মুখের জল মুছতে মুছতে কিন্নরী বলল—'রহস্য কি একটা মাস্টারমশাই? আমার প্রেমের ঠাকুর জগন্নাথ রহস্যনাথও বটে। ওঁকে ঘিরে জমাট বেঁধে আছে কতই না রহস্যের মেঘ। মহাপ্রসাদের কথাই ধরুন না। যে অন্ন কোন অব্রাহ্মণ স্পর্শমাত্র করলেই অস্পৃশ্য হয়ে যায় শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের কাছে সেই অন্নই যখন জগবন্ধুর প্রসাদ হয়, তখন শূদ্রের হাত থেকেও তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন না কোন ব্রাহ্মণই। ভারতের অন্য একটি হিন্দু মন্দিরেও এ দৃশ্য দেখতে পাওয়া যাবে না। মহাপ্রসাদ আর গঙ্গাজল যেন এক। চণ্ডাল স্পর্শ করলেও এ দুটির কোনটিই অপবিত্র হয় না। উৎকল খণ্ড বলছে—সাধারণ ধর্মশাস্ত্রের নিয়ম মহাপ্রসাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। মহাপ্রসাদ গ্রহণ করাটাও একটা ধর্ম। এ ধর্ম শ্রীভগবানই প্রচার করেছেন। আচার থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। এবং স্বয়ং জগন্নাথই ধর্মের কর্তা (৩৮ অঃ)। কপিল সংহিতা গ্রন্থেও (৫ অঃ) মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্যের অপূর্ব বর্ণনা আছে। উৎকল খণ্ড আরও বলেছে, মহাপ্রসাদ যখন যে অবস্থায় পাবে, যার হাত

থেকে পাবে, যে কোনো পরিবেশে পাবে, গ্রহণ করবে। জাত-পাত নিয়ে সারা ভারতের মানুষ যখন ঝগড়া-মারামারি করছে, খুন করছে, ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, ঠিক সেই সময়, নীলাদ্রিশেখরে বসে আমাদের রহস্যরাজ জগন্নাথ কেমন নিঃশব্দে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকে একই পাত্রে অন্নপ্রসাদ খাইয়ে ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্ব বোধের মন্ত্র তুলে দিচ্ছেন প্রাণে প্রাণে। কিন্তু, এমনটি করা সম্ভব হল কেমন করে? কেন সে রহস্যময় কারণে জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করলেই—সাধারণ মানুষ কিছুক্ষণের জন্যও অন্ততঃ বিস্মৃত হয় সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ আর তিক্ততার কথা?'

জয়ন্ত বলল—'অনেক পুরাবিদ্ লিখেছেন, এই জাতপাত না মেনে একসঙ্গে একই জায়গায় বসে অন্ন খাওয়াটাও নাকি বৌদ্ধধর্মীয় ব্যাপার। তোমার মতামত কি এ ব্যাপারে?'

একটু হাসল মেয়েটি। বলল—'আপনি তো সব জানেন মাস্টারমশাই, তবু আমায় প্রশ্ন করছেন? তাই যদি হবে, তাহলে তো বৌদ্ধগয়ার মন্দিরেও এইরকম উদার নিয়মই চলত। সে মন্দিরেও তো এখন হিন্দু পূজারীই পুজো করে। আমার রহস্যরাজ জগবন্ধুর রাজ্যের রহস্যময় ক্রিয়াকলাপের কারণ যখনই কেউ খুঁজে পায় না, তখনই সে জগন্নাথ ঘটিত সমস্ত কিছুকেই 'বৌদ্ধ' আখ্যা দিয়ে নিজের ইতিহাস বিশ্লেষণের অক্ষমতাকে ঢাকে। আপনিই বলুন—এই যে রাজেন্দ্রলাল, কানিংহাম, ফার্গুসন, হান্টার, অক্ষয় দত্ত—এই মহাপ্রসাদ গ্রহণের উদার নীতি ও লোকপ্রিয়তাকে বৌদ্ধ ব্যাপার বলে প্রমাণ করার এত চেষ্টা করলেন, তাঁরা তো কই একবারও ভেবে দেখলেন না—বোধিগয়া, যেখানে বৌদ্ধ প্রভাব পুরীর চেয়েও বেশি প্রবল ছিল, একদিন সেখানে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-আদিবাসী এক ভাণ্ড থেকে অন্ন একসাথে খায় না কেন আজও?'

দীনেশ জানতে চাইল—'বেশ তো, তোমার যুক্তি মেনে নিয়ে আমরা না হয় ধরেই নিলাম—মহাপ্রসাদ গ্রহণের উদার প্রথাটি বৌদ্ধধর্মমূলক নয়। কিন্তু আমাদের দেশের এতগুলি তীর্থ থাকতে কেবলমাত্র পুরীতেই কেন এমন প্রথার প্রচলিত হল, সেটা তো বলবে?'

'ইতিহাসে সূত্র ধরে এর কারণ অনুসন্ধান করে যা জানতে পেরেছি, তা বলার আগে, আবার আগের কথারই পুনরুল্লেখ করছি—এ সমস্তই আমার লীলাময় জগন্নাথের এক এক লীলা।' বলে, আর একবার দুই করপুট একত্রিত করে কপালে ঠেকিয়ে, সে শুরু করল—'যখন সমস্ত কলিঙ্গ রাজ্যে শবর রাজগণের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল, তখন জগন্নাথ ক্ষেত্রও ছিল শবরদেরই অধিকারে। সোমবংশীয় রাজা যযাতি যে সময় শবর রাজের অধীনে ওড়িশা শাসন করতেন, সেই সময়েই অর্থাৎ খৃষ্টীয় নবম কিংবা দশম শতাব্দেই, মহাপ্রসাদের আদরের সূত্রপাত হয়।'

'এ কেমন কথা!' অধ্যাপক গৃহিণী বিস্ময় প্রকাশ করলেন, 'দশম শতাব্দীর আগে মহাপ্রসাদের কোন আদরই ছিল না?'

'না। যযাতির আবির্ভাবের আগে মহাপ্রসাদ ভক্ষণের প্রথাটাই ছিল কিনা সন্দেহ। প্রাচীন নারদপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে জগন্নাথের মাহাত্ম্য বর্ণিত থাকলেও, মহাপ্রসাদের নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই। এটা আধুনিক প্রথা বলেই রঘুনন্দন প্রমুখ প্রখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিতগণ—জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্যকথা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা সত্ত্বেও, মহাপ্রসাদের কথাই তোলেননি তাঁদের রচনায় কোথাও।

'তবে কি যযাতিই প্রথম প্রচলন করলেন মহাপ্রসাদের?' অধ্যাপক পত্নীর প্রশ্ন। 'ইতিহাস তো তেমনটিই বলছে। কারণ, যযাতির রাজত্বের পরবর্তীকালে রচিত উৎকলখণ্ড এবং কপিলসংহিতাতেই (উৎকলখণ্ড, ৩৮ অঃ; কপিলসংহিতা, ৫ অঃ) আমরা মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্যের প্রথম সুন্দর বর্ণনা পাচ্ছি। তাতে বলা হয়েছে—ত্রৈবণিক হোক বা শূদ্রই হোক, যে কেউ-ই পাক করুক, তোমরা জানবে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীই পাক করেছেন এই মহাপ্রসাদ। সুতরাং, একে যে কেউই স্পর্শ করুক, তাতে কোন দোষ হয় না। সমস্ত জাতি—দীক্ষিত, অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি সকলেই মহাপ্রসাদ ভোজনে পবিত্র হয়। যেমন গঙ্গাজল চণ্ডাল-স্পর্শে অপবিত্র হয় না, তেমনি এই মহাপ্রসাদও অপবিত্র হয় না কিছুতেই।'

বাইরে বৃষ্টির দাপট অনেকটা কমে এসেছে। বর্ষণের শব্দ আসছে না আর কানে। 'একটু চা করে আনি? যেমন ভেজা ভিজেছো, গরম চা-এ উপকার দেবে।'

'না বৌদি। চা খাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি ব্রত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই।' বলে, জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে পুনশ্চ তার প্রসঙ্গে ফিরে গেল কিন্নরী। 'যখন শবররাজের অধীনে দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাধিকারী রাজা যযাতি ওড়িশাকে শাসন করতেন, যখন শবর সেবকরাই জগন্নাথের পুজো ও ভোগ প্রস্তুত করতেন, যখন শত শত ব্রাহ্মণ হয়ে পড়েছিলেন শবরের আশ্রিত এবং যখন সেই আশ্রিত ব্রাহ্মণরা শবর হস্তে প্রস্তুত সেই জগন্নাথের প্রসাদ ভক্ষণ করে নিজেদের কৃতার্থ জ্ঞান করতেন, ঠিক সেই সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় নবম বা দশম শতকেই প্রথম কিছুটা সমাদর লাভ করে মহাপ্রসাদ।'

'কিন্তু যযাতি তো আর্য ছিলেন, ছিলেন সোমবংশীয়।'

দীনেশ বলল—'তবে তিনি কেন ব্রাহ্মণদের দিয়েই আবার জগন্নাথের ভোগ রান্নার প্রবর্তন করলেন না?'

'অতীতে যখনই কোন অনার্য বা নিকৃষ্টতর জাতি—কোন সভ্য বা আর্যজাতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে, তখনই সে চেষ্টা করেছে সেই উন্নত-এর জাতিকে নিজেদের সমাজভুক্ত করে, নিজেরাও বড় হতে। এর প্রমাণ আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। যেমন বলা যায় শবররাজ শিবগুপ্ত ও ভবগুপ্তের কথা। তাঁদের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ শাসনপত্র পাঠে জানা যায় যে, সোমবংশীয় রাজাদের করায়ত্ব করে, তাঁরা নিজেদেরকেও চন্দ্রবংশীয় বলে পরিচিত করেছেন। অথচ, শবর যে কখনও চন্দ্রবংশীয় হতে পারে না, কে না জানে তা?' 'তা করে থাকতে পারেন শবররাজরা। কিন্তু যযাতি

তো শবর ছিলেন না। তিনি কেন ভোগ রান্নার জন্যে আবার ব্রাহ্মণদেরই নিয়োগ করলেন না?' ইংরেজীর অধ্যাপক হলেও, ইতিহাসের ব্যাপারেও আগ্রহ যে কম নয় দীনেশের, বোঝা গেল।

'কেমন করে পারবেন? যযাতির আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই জগন্নাথক্ষেত্র ছিল শবর রাজাদের অধিকারে যযাতি নিজেও যখন এসে হাল ধরলেন উৎকলের শাসনতন্ত্রের তখনও তিনি স্বয়ং এবং জগন্নাথক্ষেত্র উভয়েই ছিল দুর্ধর্ষ শবররাজেরই অধীন। তাই জগন্নাথের পূর্বাপর সমস্ত পদ্ধতি এককালে পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। ব্রাহ্মণরা, যযাতির সময়ে, আবার জগন্নাথের পুজো করার অধিকার ফিরে পেলেন বটে, কিন্তু ভোগ রান্নার দায়িত্ব রয়ে গেল শবরদের উপরেই। শবর-আধিপত্যের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে শবর-পাচকদের অপসারিত করা ছিল দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্নের সাধ্যের বাইরে। এরপর, জগন্নাথের ব্রাহ্মণ সেবকগণ যখন দেখলেন—তীর্থযাত্রীরা এসে সকলেই পরম পরিতোষে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেছে, সাধারণ লোকেরা আর কোনরকম গোলযোগ করছে না, তখন তাঁরা সেই শবর পাচকদেরকেই যজ্ঞোপবীত প্রদান করে এক স্বতন্ত্র প্রকার ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করলেন। এখনও জগন্নাথের সূপকারগণ সকলেই বলভদ্র গোত্রীয় এবং 'শওয়র নামে পরিচিত। শওয়র বা শুয়র শবর শব্দেরই অপভ্রংশ।' 'এইসব শওয়ার বা শুয়রদের হাতে প্রস্তুত জগন্নাথের ভোগ সব ব্রাহ্মণরাই সমান ভক্তি নিয়ে গ্রহণ করতেন? কেউ কোনদিন কোন আপত্তি তোলেননি?' জয়ন্ত শুধালো।

তুলেছেন বৈকি। বাধা না পেলে কি জগবন্ধুর লীলার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে?' উত্তর দিল কিন্নরী একটু আগেই তো বলেছি, নারদপুরাণ বা ব্রহ্মপুরাণের মত প্রাচীন গ্রন্থে মহাপ্রসাদের নামোল্লেখ মাত্র না থাকায় ভারত-বিশ্রুত পণ্ডিত রঘুনন্দনের মত স্মার্তবৃন্দ কেউই তাঁদের রচনায় কোথাও মহাপ্রসাদের কথা উচ্চারণ পর্যন্ত করেননি, যদিও জগন্নাথের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন তাঁরা সকলেই। এঁদের কেউই মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করেননি কখনো। এখনও এই বাংলারই এমন অনেক প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত আছেন, যাঁরা নীলাচলে জগবন্ধুকে দর্শন করেই তীর্থানন্দে উদ্বেলিত হন, কিন্তু মহাপ্রসাদ স্পর্শও করেন না। ষোড়শ শতাব্দীর পুরীতেও এমন অনেক পণ্ডিত ছিলেন, যাঁরা মহাপ্রসাদকে বর্জন করে চলতেন। ইতিহাসে সে দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আপনারা সকলেই জানেন রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের প্রধান পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য চৈতন্য দর্শনলাভের আগে কখনো মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতেন না। যখন যুবক চৈতন্যের দিব্যরূপ, প্রখর পাণ্ডিত্য আর আশ্চর্য ভক্তিবাদে মুগ্ধ হয়ে তিনি স্বয়ং রূপান্তরিত হলেন একজন চৈতন্য ভক্তে, তখনকার একটি ঘটনার সুন্দর বর্ণনা আছে চৈতন্যচরিতামৃতে। একদিন অতি প্রত্যুষে শ্রীমন্মহাপ্রভু, সার্বভৌমকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা মনে নিয়ে, মহাপ্রসাদ এনে হাতে তুলে দিলেন সার্বভৌমের। ভট্টাচার্যের তখনও স্নানাহ্নিক কিছুই

হয়নি। তবু, চৈতন্যের শ্রীহস্ত থেকে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে সানন্দে ভক্ষণ করতে করতে উচ্চকণ্ঠে তিনি পৌরাণিক বচন আবৃত্তি করেছিলেন—শুষ্কং পর্য্যুসিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ। প্রাপ্তিমাত্রেন ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥ নদেশ নিয়মস্তত্র ন কাল বিষয় স্তথা। প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরির ব্রবীৎ॥ (পদ্মপুরাণ)। আর, চিরভক্তিবাদ বিদ্বেষী সার্বভৌমের এই অপূর্ব পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করে আমাদের গৌরহরিও প্রেমানন্দে নৃত্য করতে করতে বলে উঠেছিলেন—আজি মুই অনায়াসে জিনিসু ত্রিভুবন। আজি মুই করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহন॥ আজি মোর পূর্ণ হল সর্ব অভিলাষ। সার্বভৌমের হল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥ এই পর্যন্ত বলার পর মুহূর্তের জন্য নীরব হল কিন্নরী কার্লেকার। তারপর আবার বলল—'আসলে কি জানেন মাস্টারমশাই, প্রেমের অবতার চৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্রে পা দিয়েই জগবন্ধুর প্রেমে আত্মহারা হয়েছিলেন। তাঁর কাছে জগন্নাথের সবকিছুই অপার্থিব, অলৌকিক। সুতরাং যে গৌরসুন্দর হিন্দু আর মুসলমানকে সমমমত্ববোধ নিয়ে একইভাবে কোল দিয়েছিলেন, তিনি যে শবর-পক্ক মহাপ্রসাদও সাদরেই গ্রহণ করবেন, তাতে বিস্ময়ের আর কি আছে? তাঁর দেখাদেখি শত শত চৈতন্যভক্ত মহাপ্রসাদকে অমৃত বলে গ্রহণ করেছিলেন। আজকে যে ভারতব্যাপি এই মহাপ্রসাদের এত খ্যাতি এবং জয়জয়কার, বাস্তবিক পক্ষে, সেটা কিন্তু আমাদের নদীয়ার ঐ গৌরগুণমণিরই অন্যতম অবদান।

কিন্তু এসব কথা এখন থাক মাস্টারমশাই। জানতে চেয়েছিলেন জগন্নাথদেবকে ঘিরে থাকা রহস্যগুলি সম্বন্ধে। তা এক মহাপ্রসাদ নিয়েই কেটে গেল এতটা সময়। কিন্তু অন্য রহস্য সম্পর্কে কিছু বলার আগে এই মহাপ্রসাদের ব্যাপারেই আর একটি মজাদার খবর জানিয়ে রাখি এখানে। একটু আগেই বলছিলম না—বৈষ্ণব, শৈব আর শাক্ত কান্ট একাকার হয়ে গেছে এই জগন্নাথ-মহাসাগরে এসে পড়ে? তারই আর একটি নমুনা জানিয়ে রাখি।

প্রতিদিন সকাল, মধ্যাহ্ন এবং সন্ধ্যায় জগন্নাথদেবের যে তিনটি ধূপ হয়, এই তিন ধূপেরই জগন্নাথ-প্রসাদের থালা পূজারীদের নিয়ে যেতেই হবে শাক্তদের একান্ন পীঠের একটি পীঠের অধিষ্ঠাত্রীদেবী বিমলার সামনে। জগন্নাথের প্রসাদ দেবী বিমলা গ্রহণ না করা পর্যন্ত সে প্রসাদ মহাপ্রসাদ বলে গণ্য হয় না কখনো।'

'তাই নাকি?' দীনেশ বলে উঠলেন, 'এ এক সম্পূর্ণ নতুন তথ্য শুনলাম তোমার মুখে।' কিন্নরি এবার অন্যান্য রহস্য-বর্ণনায় মন দিল।

'জগবন্ধু স্বয়ং এক বিরাট রহস্যের আধার। তাঁর রহস্য কি গুনে গুনে কেউ বলতে পারে? তবে, আমার কাছে তিনটি রহস্যকে সবচেয়ে দুর্ভেদ্য বলে মনে হয়। প্রথম রহস্য হল—জগন্নাথের এমন অদ্ভুত রূপ এলো কোথা থেকে? কোন দেব, মনুষ্য বা পশুর চেহারার সঙ্গে যে রূপের মিল নেই, সে রূপ সৃষ্টি করেছিল কে বা কারা এবং কেন?

দ্বিতীয় রহস্য হচ্ছে—ঐ রত্নবেদী। কী আছে ঐ রত্নবেদীর ভেতরে যার জন্যে এখনও বহু এমন পণ্ডিত আছেন যাঁরা বলেন—জগন্নাথ যতক্ষণ মহাবেদীতে অবস্থান করেছেন, ততক্ষণই তাঁর প্রসাদ মহাপ্রসাদ বলে বিবেচিত হবে? কেন উৎকলখণ্ডে জগন্নাথের রথযাত্রা উৎসবকে রথযাত্রা না বলে বলা হয়েছে মহাবেদী-উৎসব (উৎকলখণ্ড—৩৩, ৩৪ অঃ)?

আর তৃতীয় রহস্য হল, নবকলেবর। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা যখন শ্রীমূর্তির জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করে নতুন মূর্তিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন, সেই সময় এক বিরাট উৎসব হয় পুরীতে কেবলমাত্র সেই বছরে, যে বছর আষাঢ় মাসে দুটি অমাবস্যা পড়বে এবং মলমাস হবে। ঐ উৎসবকে বলে নবকলেবর। বলা হয়, জগন্নাথের পুরনো দেহের মধ্য থেকে বিষ্ণু-পঞ্জর বের করে নতুন কলেবরের হৃদয়ে তা স্থাপন করা হয়। এতদিন ধরে যেটাকে বিষ্ণুর পঞ্জর বলা হচ্ছে, সে বস্তুটা আসলে কি?'

'এই তিন রহস্যভেদ কি তুমি এরই মধ্যে করে ফেলেছ?' জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল। সলজ্জ হাসি হেসে উত্তর দিল মেয়েটা—'আমার বিদ্যেবুদ্ধি কতটুকু মাস্টারমশাই? আমি খুঁজে পাব তিনটি রহস্যের কিনারা? এই তিনটের মধ্যে, আমি কেবল একটি রহস্যকে বেছে নিয়ে তারই পেছনে ছুটে চলেছি উদ্‌ভ্রান্তের মত।'

কোন্ রহস্যটিকে বেছেছো?'

'ঐ প্রথমটি। আর যে মূর্তিতে আমরা জগন্নাথকে দেখছি, এমন রূপ তাঁর এলো কোথা থেকে। এই একটি রহস্যভেদে নেমেই আমি হাবুডুবু খেয়ে মরতে বসেছি, আমার কি অন্য রহস্যের দিকে তাকাবার আর উপায় আছে? এ বড় কঠিন ব্রত মাস্টারমশাই।'

'একে ব্রত বলছ কেন বলো তো? এ তো গবেষণা?' জয়ন্তর পুনঃ প্রশ্ন।

দুই আঁখির পাতা নিমীলিত করে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে থাকল কিন্নরী। তারপর ফোঁস করে একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল—'ব্রত নিয়েছি জগন্নাথকে হৃদয়ে গ্রহণ করার জন্যে। মনেপ্রাণে, আচরণে তাঁর প্রেমে ডুবে না যেতে পারলে, তাঁর সত্য তিনি প্রকাশ করবেন কেন আমার কাছে, মাস্টারমশাই?'

ভারী ভাল লাগছে জয়ন্তের, গভীর জ্ঞানসম্পন্না এই অনন্যা রূপবতী তরুণীর আত্মম্ভরিতাবর্জিত ভক্তিভাবটিকে।

'এ গবেষণা শেষ হলেই আবার অন্য দুটো নিয়ে নতুন করে ব্রত শুরু করার ইচ্ছা আছে নাকি?' অধ্যাপক গৃহিণীর কৌতূহল। 'অন্য দুটি রহস্য নিয়ে এখন কাজে মেতে আছে আমার ব্রতের যে গুরু, সে।'

জয়ন্ত ব্রতের গুরুর নাম জানবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করাতে কিন্নরী জানালো—'অনিন্দ্য আপ্পারাও।'

'উনি কি অন্ধ্রপ্রদেশী?'

'ঠিক তা বলা যায় না, মাস্টারমশাই। অনিন্দ্যর বাবা খড়্গাপুরে রেলেতে কাজ করতেন। তিনি তেলেগুভাষী, কিন্তু তাঁর পত্নী বাঙালী। বাবা বাংলা বলেন ঠিক বাঙালীদের মতই। যে তিনটে রহস্যের কথা একটু আগে বললাম, তাদের মধ্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রহস্য ভেদ করার দায়িত্বভার নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছে অনিন্দ্য। জগবন্ধুব্রত আসলে ওরই ব্রত, আমি তার অনুসরণ করছি মাত্র।'

'সেও কি তোমার মতই সংযমের জীবন বেছে নিয়েছে? সেও কি সাদা কাপড় পরে, কাপলে তিলক আঁকে?'

'একমাত্র জগন্নাথ ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে কোনরকম কৌতূহলই নেই যার, তার আবার সংযমের কি প্রয়োজন, মাস্টারমশাই। কেউ ডেকে খেতে না বললে, খাওয়ার কথা ওর মনেই আসে না। হয়তো গোটা দিন-রাত উপোসে কেটে যায়। আবার একই জায়গায় বসে পর পর ষাটটা মালপোয়া খেতেও দেখেছি আমি ওকে, সঙ্গে সের খানেক দুধ। বৃষ্টির মধ্যে বসে আছে তো বসেই আছে। সারাদিন ভিজে কাপড় আর ভিজে মাথায় কাটিয়ে দিতে দেখেছি ডিসেম্বরের শীতেও।'

'অসুখ করে না?'

'আমি তো কখনো অসুখ হতে দেখিনি।'

'কোন্ ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ. দিয়েছে?'

এবার ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠল বলে মনে হল মেয়েটার। বলল—'ইউনিভার্সিটিতে ঢোকেইনি কখনও। ও যে মাত্র ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েছে।'

কিন্নরীর কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল দীনেশ—'বলো কি? যে ম্যাট্রিক পাশও করেনি, সে করছে জগন্নাথকে নিয়ে গবেষণা, আর তুমি, যে কিনা এম.এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছ, হয়েছ সেই নন-ম্যাট্রিকের চেলা?'

'না, না, স্যার, অমন কথা বলবেন না। ওর জ্ঞানের অফুরন্ত পিপাসা কোন স্কুল বা কলেজ মেটাতে পারত না বলেই, মনে হয়, স্কুলের গণ্ডীবদ্ধ পড়াশোনা ওর ভাল লাগেনি।' এই বলে, পুনশ্চ জয়ন্তের পানে চেয়ে কিন্নরী শুধালো—'আপনি পুরীতে কবে ফিরে যাবেন আবার?'

'আগামীকাল। মাত্র দুইদিনের জন্যে কলকাতায় এসেছি। কিন্তু এবারকার আসা সার্থক হয়েছে আমার। তোমার মত একনিষ্ঠ এক ব্রতিনীকে দেখে গেলাম। এমনটি তো বড় একটা চোখে পড়ে না আজকাল।'

মুহূর্তে লজ্জাঘিরে আরক্ত হয়ে উঠল কিন্নরীর কর্ণমূল। সঙ্কোচাকীর্ণ স্বরে সে বলল—'না, না, মাস্টারমশাই, আমার সম্বন্ধে এসব কি বলছেন আপনি? সুরাটে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধার ওপর আপনার গবেষণার কথা যখন দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন এক ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রে সহস্র মানুষের সমাবেশে, সেদিন বিশ্বেশ্বরী কাকীর পাশে বসে আমারও তা শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। সে বক্তৃতা, দুষ্ট কিছু লোকের বিদ্রূপ

আর প্রতিবাদকে তুচ্ছ করে—আপনার সেই তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠের সত্য-উদ্‌ঘাটন—আজও আমার কানে বেজে ওঠে মাঝে মাঝে। ইতিহাসের সত্যকে নির্ভয়ে তুলে ধরার শক্তি আর সাহসের হাতেখড়ি যে আপনার কাছেই হয়েছে, মাস্টারমশাই।' উঠে দাঁড়াল কিন্নরী। বেলা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। তাকে একবার বেলভিডিয়ারে যেতেই হবে। ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে কিছু কাজ আছে। 'চললে নাকি?' জয়ন্ত জানতে চাইল। এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে, নিজেই অন্য একটি প্রশ্ন করে বসল জয়ন্তকে—'আপনি তো পুরীতে এখন শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে গবেষণা করছেন না মাস্টারমশাই?' 'তুমি জানলে কোত্থেকে?'

চম্পাবেন কলকাতায় এসেছিল কিছুদিন আগে, তার মুখেই শুনলাম। তা, মাস্টারমশাই, আপনি নিজেই তো একবার গিয়ে দেখা করতে পারেন অনিন্দ্যর সঙ্গে। আপনার কথা ওকে আমি অনেক বলেছি। আপনাকে পাশে পেলে ও যে কত খুশি হবে!' জয়ন্ত তাড়াতাড়ি বলে উঠল—'আর আমি? আমি খুশি হব না? যে ছেলে জগন্নাথের রহস্য-সাগরে এমনিভাবে মগ্ন হতে পেরেছে স্বেচ্ছায়, এমনিভাবে নিজের যৌবনের সমস্ত সাধ-আহ্লাদ, নিজের দেহের সমস্ত সুখ-সাচ্ছন্দ্যকে তুচ্ছ করে নিজেকে আত্মস্থ করতে পেরেছে গবেষণার গভীর গহ্বরে, তাকে দেখবার জন্যে, তাকে বোঝবার জন্যে আমার প্রাণেও কি কম আকুলতা জেগেছে ভাবছ! আমি পুরীতে ফিরেই তাকে খুঁজে বের করব নিশ্চিত। বলো তার ঠিকানা।'

মুখ কাচুমাচু করে কিন্নরী জানালো—'ঠিকানা তো তার জানা নেই!'

'সেকি কথা? তবে পুরীতে তাকে তুমি পাও কোথায়?' 'বড়দেউলে? অর্থাৎ জগন্নাথ মন্দিরে।'

'পুরীতে গেলে তুমি ওঠো কোথায়?

'মন্দিরেরই কাছে, একটি মঠে। তবে অনিন্দ্যর মুখে শুনেছি—ও নাকি চক্রতীর্তের ঐদিকে কোথায় এক তেলেঙ্গী জেলের একখানি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে।' 'ব্যাস, ঐটুকুই যথেষ্ট। একটি হাত তুলে কিন্নরীকে থামিয়ে দিয়ে জয়ন্ত বলল—'ওকে আমি বের করে নেব ঠিক। কিন্তু তোমাকে যে এবার আমার একটা কথার জবাব দিতে হবে, বোনটি!'

জয়ন্তের মুখে 'বোনটি' সম্বোধন শুনে পুলকে উদ্বেল হয়ে উঠল কার্লেকার একমুহূর্তে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করল—'কোন্ কথার, দাদা?'

'তুমি আজ সন্ধ্যায় তমোনাশ সংঘের দন্তমহোৎসবের সভায় যাবে নাতো?' কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মেয়েটা নির্বাক হয়ে। তারপর, হঠাৎ, নীচু হয়ে জয়ন্তের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে আবেগভরা কণ্ঠে বলে উঠল—'আমায় মানা করবেন না দাদা। যেখানে আমার প্রাণের ঠাকুর জগবন্ধুর ইতিহাসকে বিকৃত করার

চেষ্টা হয়, সেখানে না গেলে আমার যে পাপের আর অন্ত থাকবে না।' এই বলে, চক্ষের পলকে, ছুটে বেরিয়ে গেল সে অধ্যাপকের গৃহ থেকে।

আর, তার কয়েক মিনিট পরেই, হুড়মুড়িয়ে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল ঐ বাড়িরই সদর দরজায়, পেট্রোলের গন্ধ হাওয়ায় ছড়িয়ে এবং তা থেকে নেমে এলো অপরেশ আর পদ্ম। উত্তেজিতভাবে জয়ন্তের সামনে এসে পদ্ম বলল—'আজ সন্ধ্যায় কিন্তু নিশ্চয়ই যাবেন স্যার, আমাদের সভায়। শুনবেন ডঃ বড়ুয়ার অপূর্ব বক্তৃতা। পুরীর জগন্নাথ যে আসলে বুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়, সেটা কেমনভাবে প্রমাণ করবেন দেখবেন বড়ুয়া সাহেব। অতবড় পণ্ডিত এদেশে আর কটাই বা আছে।' অপরেশ বলল—'আমি টেলিফোন করেছিলাম কিন্নরী কার্লেকারকে সকাল সাতটায়। মানা করেছিলাম আজকের সভায় আসতে। তা, সে কি জবাব দিল জানেন? বলল—আমার না গিয়ে উপায় নেই, ভাই। মহাপ্রভু জগবন্ধুকে নিয়ে আলোচনা হবে যেখানে, সেখানে যে যেতেই হবে আমাকে। আমি যে জগবন্ধু ব্রতচারিণী।'

অপরেশের কথা শেষ হবার আগেই পদ্ম প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল—'আসুক না আজকের সভায়। এসে, ডঃ বড়ুয়ার কথার ওপর কিছু বলে দেখুকই না একবার, কি হয় ওর কপালে।' মুহূর্তে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল জয়ন্তের ললাটে বিব্রত স্বরে সে জিজ্ঞাসা করলো পদ্মকে—'কেন কি হবে?'

ঈর্ষাবিম্বিত অধরে প্রতিহিংসা-বিকৃত হাসি ফুটিয়ে পদ্ম উত্তর দিল—'আজকের সভা যদি কালকের মত পণ্ড করার চেষ্টা করে ও, তবে ওকে উচিত শিক্ষা দেবে আজ তমোনাশ সঙ্ঘের ব্যায়মাগারের ছেলেরা। সুন্দরী মেয়ে বলে ওকে ছেড়ে কথা বলবে না ওরা।'

।। তিন ।।

বন্ধু অধ্যাপক দীনেশ ভট্টাচার্য্য এবং তার পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে ঠিক ছ'টায় জয়ন্ত গিয়ে উপস্থিত হ'ল বুদ্ধিষ্ট টেম্পল্ ষ্ট্রীটের অদূরবর্তী সেই হল-এ, যেখানে গতকাল শুরু হয়েছিল তমোনাশ-সঙ্ঘের দন্তমহোৎসব। আজ প্রবেশ পথেই নজরে পড়লো বেশ কিছু বেপরোয়া ধরনের যুবকের ভীড়। ডাম্বেলমুগুর ভাঁজা চেহারা প্রায় সবারই। ঘাড় পর্য্যন্ত নেমে আসা চুলের কসরৎ, টাইট প্যান্ট-টাইট শার্টে ছাতি আর হাতের মাংসপেশীর প্রদর্শনী। সবার দৃষ্টি গেট-এর দিকে। তাদের চোখ ফস্কে কেউ সভায় যেন ঢুকে না পড়তে পারে।

কিন্নর কার্লেকারের জন্য কিছুটা উৎকণ্ঠা তো ছিলই মনে। এখন হল-এ ঢোকার আগেই এতগুলি 'মাস্ল্-ম্যান'-এর ঝাঁককে লক্ষ্য করে সেই উৎকণ্ঠাই যেন বৃদ্ধি পেলো আরও জয়ন্তের।

সভামণ্ডপেও আজ গত সন্ধ্যার চেয়ে অনেক বেশী জন সমাবেশ। ঘরের মধ্যে

তো তিলধারণের ঠাঁই নেই-ই, বাইরে, জানালাগুলির রেলিং ধরেও দাঁড়িয়ে গেছে ঠাসাঠাসি করে কৌতূহলী শ্রোতার দল।

ভাষণ মঞ্চ আরও বড় করা হয়েছে। মঞ্চের মধ্যস্থলে লেক্‌চার-ষ্ট্যাণ্ড এবং তারই সামনে তিনটে মাইক একত্রিত করা। লেকচার ষ্টাণ্ডের দুইদিকে দুটি চেয়ার দেওয়া হয়েছে আজ। একটিতে বসে আছেন ডঃ বড়ুয়া, অপরটিতে পীত বসন ও পীত পাঞ্জাবী পরিস্থিত জনৈক বৃদ্ধ। চেহারায় বেশ একটা সৌম্য শান্ত ভাব। তিনিই সভারম্ভে প্রায় দশ মিনিট ধরে বৌদ্ধ মন্ত্র আবৃত্তি করলেন সুন্দর উচ্চারণে।

জয়ন্ত সভাগৃহের চুতুর্ধারে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে বার বার তাকিয়েও কোথাও খুঁজে পেলো না কিন্নরীর মুখখানিকে।

সভার কাজ শুরু হল। ডঃ বড়ুয়া উঠে দাঁড়িয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন পীত-বসনধারীকে। ভিক্ষু ডঃ কাকন্দক। পরম প্রজ্ঞা এঁর বৌদ্ধ শাস্ত্র এবং ইতিহাসে। সিংহল থেকে অর্থাৎ শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতে এসেছেন মাত্র পনেরো দিনের জন্যে বৌদ্ধতীর্থ পরিক্রমায়। সভার উদ্যোক্তাবৃন্দ ভাগ্যবান তাই ডঃ কাকন্দকের মত একজন বিদগ্ধ পণ্ডিতকে তাঁরা পেয়েছেন আজ তাদের মধ্যে। ইনিই আজ নীলাচলের জগন্নাথ সম্বন্ধে পুরাতনপন্থী অনেকের মনেই যে ভুল ধারণা আছে, তা ভেঙ্গে দেবেন। এমন আশা করা নিশ্চয় অন্যায় হবে না যে, যতক্ষণ এই সম্মানিত অতিথি তাঁর বক্তব্য পরিবেষণ করবেন, সকলেই শান্ত হয়ে শুনবেন।

এই সময় সহসা বাইরে চিৎকার-হৈ চৈ শুরু হল—'যাবেন না, ভেতরে যাবেন না। ভাল চান্ তো আমাদের কথা শুনুন।' এবং সঙ্গে সঙ্গে নারীকন্ঠের প্রতিবাদও শোনা গেল—'কেন যাবো, না? সভা তো সর্ব্বসাধারণের জন্যে। আমি যাবোই।' বলতে বলতে সমস্ত সভাকক্ষকে উচ্চকিত করে দিয়ে, দ্রুত পদবিক্ষেপে প্রবেশ করলো তিলক-চর্চিতা, শুভ্রবসন পরিহিতা কিন্নরী কার্লেকার। তাকে দেখে ডঃ বড়ুয়া কিন্তু খুবই খুশি হয়ে উঠলেন বলে মনে হল। প্রসন্ন হাস্যে মুখ ভরিয়ে প্রবেশপথের বাধাদানকারীদের বিস্মিত করে দিয়ে, বড়ুয়া সাহেব স্বয়ং স্বাগত জানালেন তাঁর এক সময়ের প্রতিভাবতী ছাত্রীকে। দূরে দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা স্বেচ্ছাসেবকদের ডেকে বললেন—'ওকে মঞ্চের সামনে এনে বসাও। ওর মনের সংশয় দূর করার জন্যেই বিশেষভাবে আজ ধরে নিয়ে এসেছি কাকন্দকজীকে।'

উপবিষ্ট অনেকেই উঠে দাঁড়িয়ে পথ করে দিলেন কিন্নরীকে মঞ্চের সামনে যাবার জন্যে। কিন্নরী কিন্তু আসন সংগ্রহ করার আগে, মঞ্চের উপরে উঠে গিয়ে, প্রথমে ডঃ বড়ুয়া এবং পরে ডঃ ককন্দকের পদ-স্পর্শ করে প্রণাম সেরে নিল অত্যন্ত সপ্রতিভ-ভাবে।

ইংরেজীতে ভাষণ আরম্ভ করলেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত শ্রীলঙ্কাবাসী তামিল পণ্ডিত ভিক্ষু ডঃ কাকন্দক—আমার বিশিষ্ট বন্ধু অনিলকান্তি বড়ুয়ার অনুরোধকে তুচ্ছ করতে

না পেরে, আজ আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি পুরীর জগন্নাথ ও ভগবান তথাগত সম্বন্ধে কিছু বলতে। কিন্তু বল্‌তে গিয়ে প্রথমেই ভয় হচ্ছে, আমার বক্তব্যকে ভুল বুঝে কেউ যদি আমায় হিন্দুবিদ্বেষী ভাবেন! বলে রাখা ভালো, কোন ধর্মের প্রতি কোনপ্রকার বিদ্বেষ পোষণ করাকে যে কোন সাচ্চা বৌদ্ধই পাপ বলে মনে করে থাকে। আমি তাই, এখন যা বলবো, তা কেবলই ইতিহাস এবং শাস্ত্রের কথা, আমার নিজের কথা একটিও নয়।' তামিল জিহ্বাতেও বেশ সহজ ইংরেজী উচ্চারণ কাকন্দকের। তিনি বলে চললেন—'জগন্নাথের মন্দির এবং মূর্তি যে বৌদ্ধধর্মমূলক তার প্রমাণ আধুনিক গবেষণায় গবেষকরা নানাভাবেই পেয়েছেন। প্রাচীনকালে, আজকের এই জগন্নাথের মন্দির যে বৌদ্ধস্তূপ ছিল, তার প্রমাণ আমরা পাই খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যে চীনা পরিব্রাজক বৌদ্ধতীর্থ দর্শনে ভারতে এসেছিলেন, সেই হিউয়েন-সাং-এর গ্রন্থ থেকে। হিউয়েন-সাং উৎকলের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে সাগরতটে চরিত্রপুর নামে একটি সুপ্রসিদ্ধ বন্দর দেখতে পান, এখনকার পুরীই হচ্ছে সেই চরিত্রপুর। এই চরিত্রপুরে হিউয়েন-সাং পাঁচটি অত্যুন্নত বৌদ্ধস্তূপ দেখতে পেয়েছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ কানিংহাম বলেছেন, সেই পাঁচটি স্তূপেরই একটি আজ জগন্নাথ মন্দিরে রূপান্তরিত। ওঁর আগে, পঞ্চম শতাব্দীতে যখন ফাহিয়েন ভারত পরিক্রমায় আসেন তখনও পুরীর মন্দির যে বৌদ্ধদের হাতেই ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে ফাহিয়েনের ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্যে। অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে তিনি লিখেছেন—'পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে তখনও অকলুষিতভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত ছিল এবং ব্রাহ্মণদের কোনো দৌরাত্ম্য ছিল না। হিন্দুদের মধ্যে এত জাতবিচার সর্বত্র, কিন্তু শ্রীক্ষেত্রে আজও কেউ জাতিভেদ মানেন না। এটা বৌদ্ধপ্রথা। জগন্নাথের বুকের মধ্যে বিষ্ণুর পঞ্জরাস্থি রক্ষিত আছে বলে বলা হয়। এটাও বৌদ্ধপ্রথা। কোনো হিন্দুই কখনো কোনো পঞ্জরাস্থিকে তাদের মূর্তির মধ্যে রেখে পুজো করবে না। মৃতের অস্থি হিন্দুর কাছে অপবিত্র। কিন্তু বৌদ্ধের কাছে বুদ্ধদেবের অস্থি, দন্ত, নখ, কেশ—সবই পরম পবিত্র। বৌদ্ধরা এগুলিকে পূজ্য বলে ভেবে থাকেন। পুরীর মন্দিরেই, দশাবতারের চিত্রপটে বুদ্ধাবতারের স্থলে জগন্নাথের মূর্তি অঙ্কিত রয়েছে সুস্পষ্ট ভাবে। জেনারেল কানিংহাম প্রমাণ করেছেন জগন্নাথ, শুভদ্রা ও বলরাম এই তিন মূর্তিই আসলে বৌদ্ধ পূজিত বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ। বৌদ্ধরা সাধারণত ধর্মকে স্ত্রীরূপে বর্ণনা করে থাকেন, তাই হিন্দুরা পরবর্তীকালে বৌদ্ধদের ধর্মকে সুভদ্রার রূপ প্রদান করেছেন। আধুনিক গবেষকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে যাঁকে সবাই মেনে নিয়েছে, সেই জেনারলে কানিংহাম দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রম করে সাঁচি, অযোধ্যা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি নানা স্থান থেকে, এমনকি শকরাজাদের মুদ্রা থেকেও ঐরকম বৌদ্ধধর্ম যন্ত্র, অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতীক, সংগ্রহ করেছেন অনেকগুলি। ঐ তিনটি বৌদ্ধধর্ম যন্ত্রের সঙ্গে জগন্নাথ, সুভদ্রা এবং বলরামের মূর্তির আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করে, আমি বিশ্বাস করি, সকলেই একবাক্যে মেনে নেবেন যে, আজকের হিন্দু পূজিত জগন্নাথ,

সুভদ্রা ও বলরাম প্রাচীনকালের বৌদ্ধ পূজিত বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ ছাড়া আর কিছুই নয়।' নীরব হলেন বক্তা কিছুক্ষণের জন্যে। ছোট টি-পয়ের ওপর রাখা কাঁচের গেলাসটা তুলে নিয়ে শুষ্ক কণ্ঠকে সিক্ত করে নিলেন একবার। তারপর পুনরায় বলে চললেন— 'হিন্দুরা জগন্নাথকে বিষ্ণু বা কৃষ্ণ বলে ঘোষণা করে থাকেন। আমার প্রশ্ন, তাহলে একমাত্র পুরী ছাড়া বিষ্ণু বা কৃষ্ণের এমন অদ্ভুত রূপ আর কোথাও নেই কেন ভারতের? জগন্নাথের মূর্তির সঙ্গে কোনো দেবতা, মানুষ বা পশুর চেহারার কোনো সাদৃশ্য নেই কেন? কেন ঔরঙ্গাবাদের অন্তর্গত ইলোরার কাছে একটি বৌদ্ধ দেবালয় আজও জগন্নাথের মন্দির বলে খ্যাত? কেন কাসী এবং মথুরার পঞ্জিকাতেও বুদ্ধাবতারের জায়গায় জগন্নাথেরই রূপ দেখতে পাই আমরা? কেন পুরীর জগন্নাথের মূর্তির সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম যন্ত্রগুলির এত মিল। কেন আমরা ভাবব না যে, ইলোরার অদূরবর্তী জগন্নাথ মন্দিরের মত পুরীর জগন্নাথ মন্দিরেও একদিন বুদ্ধদেবই ছিলেন আরাধ্য এবং সেই কারণেই পুরীর মন্দিরেও হয়েছে জগন্নাথের মন্দির নামে আখ্যায়িত? কেন আধুনিক গবেষকদের আর একজন দেশবিশ্রুত নেতা রাজা রাজেন্দ্রলাল তাঁর গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে গেলেন জগন্নাথের বুদ্ধ-বেশের কথা? কেন জগন্নাথের অঙ্গে নিত্য যে সব বেশ-পরিচর্যা হয়, তার মধ্যে বুদ্ধ বেশের অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান। আমার এই এতগুলো প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তরই শুধু দেওয়া যায়। সে উত্তর হচ্ছে, পুরীর জগন্নাথ ক্ষেত্রটি পূর্বে একটি বৌদ্ধক্ষেত্রই ছিল।' পূর্ববিরতি এবং জলপান কাকন্দকজীর। হল-এ উপস্থিত অধিকাংশ শ্রোতারই জানা ছিল না যে, তাঁদের এত পরিচিত একটি দেবতা জগন্নাথ—আসলে ভাগবান বুদ্ধেরই আর এক রূপমাত্র এবং যে জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রাকে কৃষ্ণ এবং তাঁর ভাই-বোনরূপে পুজো করে এসেছেন এতকাল, তাঁরা মূলতঃ বুদ্ধ, ধর্ম আর সঙ্ঘেরই প্রতীক। যুগযুগান্তরের বিশ্বাস আর ঐতিহ্যকে ইতিহাসের যুক্তির খড়্গাঘাতে কাকন্দকজী এমনিভাবে খণ্ডবিখণ্ড করে দিলেন কয়েকটিমাত্র মুহূর্তের মধ্যে যে, এ ঘটনার আকস্মিকতার চমক-এ সমস্ত সভাগৃহ বেশ কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি এবং স্তম্ভিত হয়ে বসে না থেকে পারল না।

ভিক্ষু কাকন্দকের কণ্ঠ পুনরায় ধ্বনিত হল বিস্ময়-বিধ্বস্ত এক অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে আপনাদের মনে রাখতে হবে—পুরীর বর্তমান মন্দির তৈরী হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে, যে সময় ভারতে হিন্দুদের উৎপীড়নে বৌদ্ধধর্মের নাভিশ্বাস উঠেছিল, ক্রমেই ভারতের মাটি থেকে অন্তর্হিত হচ্ছিল সদ্ধর্ম। ঐ দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জগন্নাথ বুদ্ধরূপেই পূজিত হতেন, বিষ্ণু বা কৃষ্ণরূপে নয়। হৃতশক্তি অবসন্ন বৌদ্ধদের পুরীর জগন্নাথ ক্ষেত্রে থেকে বিতাড়িত করে ব্রাহ্মণরা জোর করে দখল করে নেন ঐ বুদ্ধমন্দিরটিকে। তারই ওপরে নির্মিত হয় বর্তমানের গগনচুম্বী দেবালয়—মূলতঃ যেটি ছিল একদিন পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ-এর স্বচক্ষে দেখা একটি সুউচ্চ বৌদ্ধস্তূপ। এসব কথা আমি যদি বলতাম, আপনারা অনায়াসে অবিশ্বাস করতে পারতেন, কারণ

আমি নিজে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ। কিন্তু ইতিহাসের এই অকাট্য সত্যকে যাঁরা উদ্‌ঘাটন করে গেছেন, সেই প্রখ্যাত পুরাবিদ্ হান্টার, ফার্গুসন, কানিংহাম, রাজেন্দ্রলাল বা অক্ষয় দত্ত—এঁদের কেউই তো বৌদ্ধ ছিলেন না। বৌদ্ধ ছিলেন না ওড়িশাবাসী প্রাচীন গ্রন্থকার শিশুরাম, মুকুন্দরাম, মাগুনিয়া দাস অথবা বেঙ্কটাচার্যও। শিশুরাম দাস আর মাগুনিয়া দাস তাঁদের বর্ণিত বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট ভাষায় জগন্নাথের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন যে, কলিযুগে জগন্নাথ হস্তপদহীন বুদ্ধরূপে পুরীতে বিরাজ করবেন। দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী হিন্দুরাজারা ব্রাহ্মণদের সাহায্যে পুরী মন্দিরের বৌদ্ধত্বের সমস্ত প্রমাণ ও তথ্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে ধুয়েমুছে দেবার চেষ্টা করেছেন সর্বপ্রকারে, সে বিষয়ে আমাদের মনে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু পারেননি। উপরন্তু তাঁদেরই ধর্মের এক মহাকবি, যাকে আমরা কবি জয়দেব বলে জানি, তিনি পুরীতে গিয়ে দীর্ঘদিন বাস করে ভগবান বুদ্ধের এত বড় একজন ভক্ততে পরিণত হলেন যে, তিনি স্বয়ং বুদ্ধের জয়গাথা রচনা করে ফেললেন দশাবতার স্তোত্রম্ নাম দিয়ে।' একটু থেমে, অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে ডঃ কাকন্দক আবার বলতে লাগলেন—'আমি যা কিছু আজ বললাম সবই আধুনিক পুরাবিদ্‌দের সুদীর্ঘ গবেষণালব্ধ তথ্য। এর মধ্যে বিদ্বেষ বা পরধর্ম অসহিষ্ণুতার কোনো প্রশ্রয় নেই। আমার এ বক্তব্য শোনার পরও কি কেউ আর বিশ্বাস করতে পারবেন যে পুরীর জগন্নাথের মন্দির মূলতঃ বুদ্ধমন্দির নয়, বিষ্ণুমন্দির? কেউ কি বিশ্বাস করতে পারবেন—জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম বুদ্ধ ধর্ম সংঘ ছাড়া অন্য আর কিছু?'

জয়ন্তের মনে যে ভয়টি উস্‌খুস করছিল এতক্ষণ, সেটাই সত্য বলে প্রমাণিত হল এবার। ডঃ কাকন্দকের দুটি প্রশ্ন ভালভাবে শেষ হওয়ার আগেই কিন্নরীর তীব্রকণ্ঠে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল হলঘরের এতক্ষণের অস্বস্তিকর নৈঃশব্দ্য। আজ হাতে তার জপের থলিটি দেখা গেল না। কিন্তু শুভ্র ছোট্ট কপালটিতে জ্বলজ্বল করছে তিলক রেখা। সে বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়িয়ে ইংরেজীতেই বলল—'আমি পারব পরম শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুজী! সারা বিশ্বর সামনে দাঁড়িয়ে সগৌরবে আমি ঘোষণা করব—জগন্নাথের মন্দির মূলতঃ কখনই বৌদ্ধমন্দির ছিল না, জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম কখনই বুদ্ধ ধর্ম সংঘের পরিবর্তিত রূপ নয়।' অধ্যাপক গৃহিণী ফিসফিস করে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, 'কিন্নরী তো এমন উত্তেজিত হয়ে, এত চিৎকার করে কখনো কথা বলে না।' দীনেশ বলল—'কিছু একটা ঘটেছে বোধহয় ওর আসার সময় বাইরে গেট-এর আশেপাশে, যার ফলে চিরশান্ত মেয়েটাও এমন সাংঘাতিক রকমের উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। নিজের চোখেই তো দেখে এলাম ব্যায়ামাগারের জোয়ান ছেলেদের হাবভাব।' একটু পরেই দেখা গেল, অধ্যাপকের অনুমানই ঠিক। কিন্নরী উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলতেই, জেনারেল সেক্রেটারী অমিতাভ চৌধুরী একেবারে ফোঁশ করে উঠলেন—'ওসব চলবে না আজ। কাল আপনার জন্যে পণ্ড হয়েছে আমাদের দন্তমহোৎসবের পবিত্র সভা। আজ একটি

কথাও বলতে দেবো না আপনাকে। এটা ভদ্রলোকদের সভা। এখানে ভাষণ শুনবেন, চলে যাবেন। চেঁচামেচি, হৈ-চৈ, অসভ্যতা এ সভায় চলবে না।'

সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিকাণ্ডের মত জ্বলে উঠল কিন্নরীর দুই চোখ। গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো সুতীক্ষ্ণ স্বর—'ভদ্রলোকদের সভায় দাঁড়িয়ে যে আমি কথা বলছি, তা আমার অজানা নয়। কিন্তু ঐ যে বললেন এখানে অসভ্যতা চলবে না, একথা কি সত্যি?'

'নিশ্চয় সত্যি, একশো বার সত্যি।' জেনারেল সেক্রেটারীও বেশ উত্তেজিত। 'তাহলে কোন্ সভ্যতায় শিক্ষিত হয়ে আপনার স্বেচ্ছাসেবকেরা এ-ঘরে ঢোকার মুখে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল আমার জপের মালা জানতে পারি কি? এমন কদর্য আচরণকেও কি আপনি অসভ্যতা বলবেন না?' ডঃ বড়ুয়ার সারা মুখ মুহূর্তে লাল হয়ে উঠল ক্ষোভে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'সে কি অমিতাভ? কে কেড়ে নিয়েছে কিন্নরীর হাতের জপের মালা?'

আম্‌তা আম্‌তা করে উত্তর দিলেন জেনারেল সেক্রেটারী—'আমি এসব ব্যাপারের কিছুই জানিনে, স্যার।'

'কিন্তু ওসব কথা এখন থাক,' কিন্নরী নিজেই ফিরিয়ে দিল প্রসঙ্গের মুখ। বলল—'একটু আগে, শ্রদ্ধেয় ডঃ কাকন্দক ইতিহাসের নানাদিক তুলে ধরে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন—জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম মূলতঃ বৌদ্ধ ধর্ম যন্ত্রের বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ। এবং পুরীর জগন্নাথের মন্দির হচ্ছে প্রাচীনকালের একটি বৌদ্ধস্তূপের পরিবর্তিত রূপ। ওঁর বক্তব্যের উত্তরে আমি কি কিছু বলার অনুমতি পেতে পারি?' ডঃ কাকন্দক সোৎসাহে বলে উঠলেন—'কেন অনুমতি পাবে না? তবে আমি যা বলেছি সবই তো ইতিহাসের সত্য। এ সম্বন্ধে তোমার নতুন কী আর বলার থাকতে পারে।'

'বলার অনেক কিছু আছে, সম্মানিত ভিক্ষুজী।' অনেকটা শান্ত এবং স্বাভাবিক শোনালো এবার কিন্নরী-কণ্ঠ, 'আপনি যা কিছু বলছেন, তার মধ্যে ইতিহাস হয়তো কিছুটা আছে, কিন্তু সে ইতিহাসের অধিকাংশই কল্পিত অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত।'

'এর মানে?' ডঃ কাকন্দকের বিস্মিত প্রশ্ন। 'মানেটা আস্তে আস্তে বোঝাবার চেষ্টা করব আমি। অনুগ্রহ করে একটু ধৈর্য ধরে শুনুন।' সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী উৎকর্ণ হয়ে উঠল নিমেষে।

'প্রথমেই আমি আপনার প্রথম ঐতিহাসিক ভুলটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করব।' শুরু করল কিন্নরী, 'আপনি বলেছেন হিউয়েন-সাঙ চরিত্রপুর বা পুরীতে গিয়ে পাঁচটি বৌদ্ধস্তূপ দেখতে পেয়েছিলেন এবং জেনারেল কানিংহাম নাকি সেই বৌদ্ধস্তূপগুলির একটিই যে আজকের জগন্নাথের মন্দির, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছেন।'

'এটা ভুল? কানিংহাম নিজে লিখেছেন—' ক্ষুণ্নস্বরে কাকন্দক বলতে চাইলেন, কিন্তু তাঁকে একরকম থামিয়ে দিয়েই কিন্নরী বলে উঠল—'কানিংহাম যে ভুল করেছেন সেটা আমি বলছি না শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুজী, একথা বলেছেন পৃথিবী বিখ্যাত চীনা ভাষাবিদ

Beal সাহেব স্বয়ং তাঁর সি-যু-কি গ্রন্থে (Beal's Si-Yu-Ki or Records of Western Countrees, Vol. II, P. 206)। Beal প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন—হিউয়েন-সাঙ যখন পুরীতে যান, তখন ওখানে রাজা গাল্-এর তৈরী পাঁচটি সুউচ্চ মন্দির-প্রাসাদ বর্তমান ছিল। হিউয়েন-সাঙ ঐ পাঁচটি প্রাসাদের উচ্চচূড়া দর্শন করেই খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে ওগুলিকে বৌদ্ধস্তূপ ভেবেছিলেন ভ্রমবশে।'

'রাজা গাল্ আবার কে? বীল সাহেব তার নাম পেলেন কোথা থেকে!' পীতাম্বরধারী পণ্ডিতের প্রশ্ন।

'কেন, স্কন্দপুরাণীয় উৎকল খণ্ডে তো রাজা গাল্-এর কথা আছে। উৎকল খণ্ড বলছে, সত্যযুগে, অর্থাৎ ভাগবান বুদ্ধের জন্মের শত শত বছর পূর্বে, মালবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলাচলে যে মন্দিরে নীলমাধবের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার অবর্তমানে সুদীর্ঘকাল সে মহামন্দির সমুদ্রের বালুকায় সম্পূর্ণরূপে চাপা পড়ে গিয়েছিল। গাল্ নামক এক রাজা সেই মন্দির উদ্ধার করে তার সংস্কারসাধন করেন, এবং সেই মন্দিরেরই অদূরে পর পর পাঁচটি অভ্রলেহী প্রস্তর মন্দির নির্মাণ করান। পরে তাতে প্রস্তরময়ী মাধবের প্রতিমা স্থাপন করেন (উৎকল খণ্ড—২৬/৪৬)।'

'তুমি আধুনিকা মেয়ে হয়ে শেষে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের গালগল্পে বিশ্বাস করছ? ইন্দ্রদ্যুম্ন তো হিন্দুদের তৈরী কিংবদন্তীর এক নায়ক মাত্র। ইতিহাসে বা প্রাচীন কোনো শাস্ত্রে কি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে কেউ খুঁজে পাবে কোথাও?'

'কেন পাওয়া যাবে না, ডঃ কাকন্দক? মৈত্রী উপনিষদ খুলে দেখুন, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের নাম নিশ্চয়ই পাবেন। একেই জগন্নাথের প্রাচীন ইতিবৃত্তকাররা প্রথম ইন্দ্রদ্যুম্ন বলে অভিহিত করেছেন। এখন বুঝতে পারছেন, হিউয়েন-সাঙ ভ্রমবশে ঐ পাঁচটি বিরাট মন্দিরকেই স্তূপ বলে বর্ণনা করেছেন তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে! এবং তারই সঙ্গে এটাও প্রামাণিত হচ্ছে সুন্দরভাবে যে, উৎকলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হওয়ার বহু পূর্বেই, আজ যে স্থানে জগন্নাথের মন্দির, সেখানেই প্রস্তরময় মন্দিরের মধ্যে মাধবের প্রস্তরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। যে মাধম পরবর্তী যুগে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একদিন আজকের জগন্নাথে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। সুতরাং, ঐ যে আপনি একটু আগে বললেন—জগন্নাথক্ষেত্র আগে বৌদ্ধদের ছিল, পরে হিন্দুরা বৌদ্ধদের বিতাড়ণ করে ঐ বৌদ্ধমন্দির দখল করে নিল, সেটা সম্পূর্ণ ভুল। বরং ইতিহাসের প্রমাণ থেকে একথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, বৌদ্ধরাজারা যখন উৎকলের শাসনযন্ত্র নিজেদের হাতে পেয়েছিলেন, তখন তাঁদেরই বলদর্পী প্রভাবে প্রাচীন মাধবমন্দির যা আজকের জগন্নাথের মন্দির নামে পরিচিত, তা কিছুদিনের জন্যে হয়েছিল বৌদ্ধ প্রভাবে প্রভাবান্বিত। যা দেখে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ফাহিয়েন পুলকিত হয়ে লিখেছিলেন—জগন্নাথক্ষেত্র তখন অদূষিতভাবে বৌদ্ধ প্রভাব বিদ্যমান, ব্রাহ্মণদের আধিপত্য আর সেখানে নেই বললেই হয়। লক্ষ্য করে দেখুন, ফাহিয়েন তাঁর গ্রন্থে একথা লিখেছেন পঞ্চম শতাব্দীতে, যখন

গুপ্ত যুগের চরম উৎকর্ষের আলোয় ভারতের দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত। গুপ্ত যুগ ছিল বৌদ্ধধর্মের পক্ষেও সবচেয়ে প্রভাবশালী যুগ। আবার আমরা সপ্তম শতাব্দীতে রচিত হিউয়েন-সাঙ-এর গ্রন্থে পাচ্ছি—পুরীতে উনি গিয়ে দেখেন সেখানে বৌদ্ধধর্মের আর কোনো মর্যাদাই নাই। তাহলে, ফাহিয়েন এবং হিউয়েন-সাঙ-এর রচনা থেকে আমরা এটা স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে, জগন্নাথ ক্ষেত্রে পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে কোনো এক সময় ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল। অর্থাৎ জগন্নাথ মন্দির ছিল ব্রাহ্মণদেরই হাতে। পরে বৌদ্ধরাজারা যখন রাজচক্রবর্তী হলেন, তখন তাঁরা ঐ মন্দিরের দখল নিয়ে তাঁদের তত্ত্বাবধানে বৌদ্ধমতে জগন্নাথদেবের পূজার্চ্চনা শুরু করলেন। কিন্তু কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই বৌদ্ধদের সেই প্রভাব সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। তাই সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন-সাঙ বিষণ্ণ মনে লিখলেন—ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক জগন্নাথ ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে দূষিত হয়েছে। এ প্রমাণ আমরা পাচ্ছি—জগন্নাথ মন্দিরের প্রাচীনতম দিনপঞ্জী মাদ্‌লা-পঞ্জিকাতেও। প্রসিদ্ধ উৎকল পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র, কাব্যকণ্ঠ, ১৩১৮ বঙ্গাব্দে 'শ্রীজগন্নাথ মন্দির' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'আধুনিক ওড়িশার প্রাচীন ইতিহাস স্বরূপ মাদ্‌লা-পঞ্জিকা। মন্দিরকে লইয়াই মাদ্‌লা-পঞ্জিকার সৃষ্টি, তজ্জন্য যে সকল রাজাদিগের অধীনে জগন্নাথ মন্দিরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ছিল, তাঁহাদিগের অভিমত মাদ্‌লা-পঞ্জিকায় লিখিত আছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় জগন্নাথ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা লগ্ন হইতেই মাদ্‌লা-পঞ্জিকা রক্ষিত হইতেছে। *** উক্ত পঞ্জিকার লেখা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন হইতে শুরু করিয়া, ভারতের যে-যে রাজা যে-যে সময় রাজচক্রবর্তী হইয়াছিলেন, সেই সেই সময় তাঁহাদের অধীনে এ মন্দির ছিল। এইরূপ অশোক প্রমুখ যে-যে রাজা রাজচক্রবর্তী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধানে বৌদ্ধমতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অর্চনাদি হইবার কথা উক্ত পঞ্জিকায় লিখিত রহিয়াছে।'

'বৌদ্ধধর্মের চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলার জন্যেই মন্দিরের ঐ পঞ্জিকা অমন লিখেছে।' ভিক্ষুজীর গলার স্বরে একটু উষ্ণতার ছাপ।

'তা কেমন করে হবে? বৌদ্ধধর্মের চিহ্ন মুছে ফেলার ইচ্ছাই যদি থাকত মাদ্‌লা পঞ্জিকার, তাহলে বৌদ্ধরাজাদের প্রভাব সম্বন্ধে অত বিশদভাবে লিখতে যাবে কেন সে?'

একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন পীতবসন পরিহিত পণ্ডিত। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যেই। পরক্ষণেই তিনি উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন বেশ উচ্চস্বরে—'তবু আমি বলব, ওসব বৌদ্ধ প্রভাব-ট্রভাব বাজে কথা। মূলতঃ জগন্নাথের মন্দির বৌদ্ধদেরই সৃষ্টি। হিন্দুরা সে মন্দির জবরদস্তি কেড়ে নিয়েছে নিজেদের সংখ্যাধিক্যের জোরে। চোখ মেলে চেয়ে দেখো না একবার বোধি-গয়ার মন্দিরের দিকে। হিন্দুরা কেমন নির্লজ্জের মত সে মন্দির দখল করে বসে আছে আজ। পুরীর মন্দিরেরও ঠিক ঐ একই অবস্থা।'

'বোধিগয়ার আজ হিন্দু পূজারী পুজো করে, এ কথা সত্যি। কিন্তু এখানেও যে

কোনো ঐতিহাসিককে একটা জিনিস লক্ষ্য করতেই হবে। কেন আজও কোনো হিন্দু যখন পুজো বা পিণ্ডের জন্যে যায় বোধিগয়ায়, তখন সর্বাগ্রে তাকে সংকল্প গ্রহণ করতে হয় বোধিবৃক্ষের সামনে, করতে হয় বোধিদ্রুম ও বুদ্ধকে প্রণাম? তার কারণ, হিন্দুরা জানেন বোধিগয়া মূলতঃ বুদ্ধদেবের স্থান। কিন্তু, জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে কোনো হিন্দুকেই ওরকম সংকল্প গ্রহণ বা প্রণাম করতে হয় না। তার কারণ? জগন্নাথক্ষেত্র যে মূলতঃ হিন্দুতীর্থ সেটা সব যুগের হিন্দুদেরই ভালভাবে জানা ছিল, আজও আছে।'

'তাই বলে, ফার্গুসন, হান্টার, কানিংহাম-এর মত জগদ্বরেন্য গবেষকরা যা লিখে গেছেন, তা অবিশ্বাস করতে যাব কেন?' আরও কিছুটা উত্তপ্ত হয়েছেন কাকন্দক—বোঝা যাচ্ছে বেশ। 'কিন্তু ওঁরা ছাড়া আরও তো গবেষক রয়েছেন, ভিক্ষুজী, যাঁরা সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে গেছেন তাঁদের গবেষণার শেষে?'

'কোনো গোঁড়া হিন্দুর গবেষণাকে আমি বিশ্বাস করি না।' দক্ষিণ হাত সামনে তুলে প্রবলবেগে নাড়তে নাড়তে বললেন কাকন্দক। শান্তস্বরে কিন্নরী জানালো—আমি যে গবেষকের উদ্ধৃতি এখনই দেবো, তিনি কেবল অহিন্দুই নন, অভারতীয়ও। ১৯২৯-এ Puri Gatteers-এ (Chapter IV, Pages–102-3) প্রকাশিত তখনকার স্বনামধন্য পুরাবিদ L.S.S. O'Malley, I.C.S.-এর গবেষণার ফল। উনি লিখেছিলেন, There are weighty reasons for rejecting the theory of Buddhist origin. The legend of Buddha's teelh is after all only a legend, the historical basis of which has not been proved, and it is very doubtful whether Dantapura, the city of the tooth, can be identified with Puri. Modern Scholars hold that this town, the Dantapura of Mahabharata and the capital of Kalinga, should with greater probability be identified with pliny's Dandagula near the Godavari River.' একটু থেমে, ডঃ বড়ুয়ার দিকে তাকিয়ে কিন্নরী পুনশ্চ বলে চলল, 'এইখানে নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন আপনারা, পুরী যে দন্তপুর নয়, অর্থাৎ কতিপয় বিদেশী গবেষকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুরীতে যে বুদ্ধ-দন্ত কখনই রক্ষিত হয়নি, জগন্নাথের বৌদ্ধ থিওরী মেনে নেওয়া প্রত্নবিদ রাজেন্দ্রলাল স্বয়ং তো সে কথা মেনেছেনই, মেনেছেন এই প্রজ্ঞাপ্রবীণ I.C.S. গবেষক O'Malley-ও। এই I.C.S. আরও লিখেছেন—'Again, the similarity between the form of the emages and the Buddhistic symbols of on open Trisula on a wheel, though curious, is not convincing; for such symbols are as common to Hinduism as Buddhism, the Trisula being a well known symbol of Saivism and the wheel of Vaishnauism...... As regards the car festival, it is noticeable that chariots are used

not only in Puri for the worship of Jagannath, but also in Bhubaneswar. For the worship of Siva, in Jajpur for the worship of Goddess Viraja, in Simhachalam for the worship of Varaha Avatar and in many temples of the South. Moreover, the procession of Cars of the Gods is mentioned in one of Asoka's Edicts and is certainly pre-Bhuddhistic...... Lastly, one of the strongest arguments, the finding of relics, can be traced to the Vedic period as a very old custom.'

'অল ফ্যাব্রিকেটেড ফেবল্‌স্‌, অল বোগাস।' চিৎকার করে উঠলেন ডঃ কাকন্দক, 'ঐ I.C.S. সাহেব কিচ্ছু জানে না। জগন্নাথের সঙ্গে বৈদিক যুগের কোনো সম্পর্কই নেই। জগন্নাথ সৃষ্টিই হয়েছে বৌদ্ধযুগে। বৈদিক যুগের নাম উচ্চারণ করলেই তো কেবল চলবে না, প্রমাণ দিতে হবে। কোথায় সেই প্রমাণ?'

শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ পণ্ডিত যতই উত্তেজনা প্রকাশ করে ফেলেছেন, কিন্নরী যেন ততই আত্মস্থ ও শান্ত হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। স্বাভাবিক স্বরেই উত্তর দিল সে—'প্রমাণ আছে ভিক্ষুজী। আপনার কি বেদ-এর এই সূক্তটা পড়া আছে—'অদোযদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃপারে অপুরুষম্‌। তদা রভস্ব দুর্হণো তেন গচ্ছ পরস্তরম্‌॥'

ডঃ বড়ুয়া বললেন—'কিন্তু এ মন্ত্রটা একেবারেই অর্বাচীন, কুমারী কার্লেকার, এটা বেদের কোনো প্রাচীন গ্রন্থে নেই। স্মাত রঘুনন্দন বলেছেন—এই মন্ত্র তিনি পেয়েছেন অথর্ব্ববেদ থেকে। অথর্ব্ববেদ তো সর্বশেষে লিখিত হয়। ঐ গ্রন্থের অনেক মন্ত্রেরই প্রাচীনতা সম্বন্ধে গবেষকদের মনে নানা সংশয় রয়ে গেছে।'

'না, স্যার। মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য ঠিক বলেননি। রঘুনন্দন তাঁর পুরুষোত্তম তত্ত্বে' এবং পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি তাঁর লেখা 'বাচ্যস্পত্য' নামক সংস্কৃত অভিধান গ্রন্থে লিখেছেন বটে যে, ঐ মন্ত্রটি তাঁরা অথর্ব্ববেদ-এ দেখেছেন, কিন্তু আমি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দীর্ঘদিন অনুসন্ধান করেও—অথর্ব্ববেদের কোথাও খুঁজে পাইনি। যে সূক্তটি থেকে একটু আগে আমি আবৃত্তি করলাম ঐ মন্ত্রটি, সে সূক্তটি আছে পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদের মধ্যে।'

'আই ডোন্ট বিলিভ ইট' কাকন্দক সোজা ভাষায় প্রতিবাদ করলেন, 'তুমি কি স্মার্ত রঘুনন্দনের চেয়েও বড় পণ্ডিত যে তাঁর ভুল ধরবার চেষ্টা করছ, তোমার অর্ডাসিটি তো কম নয়?'

অনুত্তেজিত কণ্ঠে কিন্নরী দৈন্য প্রকাশ করল—'রঘুনন্দন ছিলেন সর্বজনস্বীকৃত প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত, তাঁর পায়ের নখের যোগ্যতাও আমার নেই, আমি জানি। তবু, ভুল যা, তাতো ভুলই ভিক্ষুজী। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১৫৫ তম সূক্তের তৃতীয় ঋক হচ্ছে এই মন্ত্রটা।'

'কিন্তু এ ঋক-এর সঙ্গে জগন্নাথের সম্পর্ক কোথায়?' ডঃ বড়ুয়া শুধালেন।

সবিনয়ে উত্তর দিল কিন্নরী—সম্পর্কটা জানতে গেলে, এবার আমাদের তাকাতে হবে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য্যের দিকে। এই ঋক্‌টির ভাষ্যে তিনি সংস্কৃতে যা লিখেছেন, তার অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—দূরবর্তী স্থানে বর্তমান (অধোক্ষজ), নির্মাতৃপুরুষ-রহিত (স্বয়ম্ভু বা অপৌরুষেয়) যে দারুময় পুরুষোত্তম নামক ভাগবদ্-বিগ্রহ সমুদ্রতীরে বিরাজমান, হে অমর স্তবকারিন্, সেই দারুব্রহ্মকে আশ্রয় করো এবং তাঁর উপাসনার দ্বারা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবলোকে গমন করো।' ক্ষণেকের বিরতির মধ্যে কী যেন একটু ভেবে নিল মেয়েটা। তারপর আবার বলল—'আপনারা কেউ যদি ঐ ঋক্‌টিকে কল্পিত বা প্রক্ষিপ্ত বলে তাচ্ছিল্য দেখাতে চান, তাহলে তিনি ভুল করবেন। কারণ আমরা সাতশো বছরের পুরানো হাতে-লেখা তালপাতার পুঁথি পেয়েছি উৎকল খণ্ডের। তাতেও ঐ বচনের অনুকূলে আমরা এই শ্লোকটা দেখতে পাচ্ছি—য এব প্লবতে দারুঃ সিন্ধুপারে হ্যপৌরুষঃ। তমূপাস্য দুরারাধাং মুক্তিং যান্তিং সুদুর্লভাম্॥ (উৎকল খণ্ড—২১/৩)। এই শ্লোকের পর লিখিত হয়েছে ব্রহ্মজ্ঞান নিধিঃ সাক্ষান্নারদঃ প্রত্যুবাচ তং। নহি প্রবৃত্তির্ধিষ্ণোস্তু বিনা বেদং প্রবর্ততে। পরেষাং যস্য বা সৃষ্টৌ শ্রুতি প্রামাণ্যবান প্রভুঃ। বিনা শ্রুতিং প্রবৃত্তে তৎ কস্তৎ প্রামাণ্য মৃচ্ছতি। তস্মাৎ স্মৃতি প্রসিদ্ধোহয়মবতারেহত্র ভূপতে। বেদান্ত বেদ্যং পুরুষং গীতং তং সামগীতিষু। প্রতিমাসেব জানীহি নিঃ শ্রেয়সকরীং নৃণাম। সন্ত্যেব শ্রুতয়ঃ পূর্ব্বমেত দর্চ্চা প্রকাশিকাঃ। এই প্রমাণ থেকেই আমরা অনায়াসে এটা অনুমান করতে পারি যে, যে সময়ে এই ভারতে বেদান্তবেদ্য উপনিষদে ব্রহ্মের মহিমা কীতর্তি হচ্ছিল, সেই সুপ্রাচীনকালেই অথবা তার কিছু পরে দারুব্রহ্মের প্রতিমা প্রকাশ লাভ করেছিল। এইবার বিবেচনা করে আপনিই বলুন তো—উপনিষদের যুগে, যখন ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব পর্যন্ত হয়নি, তখন যা দারুব্রহ্ম, যা আজকের জগন্নাথ, তা মূলতঃ বুদ্ধ হবেন কেমন করে?'

'কিন্তু ঐ যে পুরীর মন্দিরে দশাবতার চিত্রে বুদ্ধাবতারের জায়গায় জগন্নাথের মূর্তি আঁকা হয়েছে, কাশী এবং মথুরার পঞ্জিকাতেও বুদ্ধাবতারের জায়গায় জগন্নাথ মূর্তি মুদ্রিত, বৌদ্ধ প্রথামত বলা হচ্ছে জগন্নাথের বুকের মধ্যে রক্ষিত আছে বিষ্ণুর বক্ষপঞ্জর—এসবের ব্যাখ্যা করার চেষ্টাও তো করছ না তুমি? এইসব অকাট্য প্রমাণ তো আর পুরাণের গাঁজাখুরি গল্প দিয়ে নস্যাৎ করা যাবে না।'

একটু হাসল মেয়েটা। বলল—'পুরাণের সবটাকেই গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতে কোনো সত্যিকার ঐতিহাসিকই চাননি কখনও। রামায়ণ, মহাভারতের মত অন্যান্য পুরাণের মধ্যে থেকেও পক্ষপাতহীন ঐতিহাসিকরা ইতিহাসের অনেক উপাদানই সংগ্রহ করেছেন আজ অবধি। কিন্তু সে কথা এখন থাক। আপনার দেওয়া প্রমাণগুলিতেই ফিরে আসি। পুরীর জগন্নাথের মন্দির যে একসময় প্রবলভাবে বৌদ্ধ প্রভাবে পড়েছিল, এবং বুদ্ধদেবের আবির্ভাবেরও বহু পূর্বের এই হিন্দু তীর্থটি থেকে হিন্দুদের বিতাড়ণ

করে বৌদ্ধরা জগন্নাথের পূজার্চ্চনা পর্যন্ত আরম্ভ করেছিলেন বৌদ্ধমতে, তার প্রমাণ একটু আগেই আমি দিয়েছি মাদ্‌লা পঞ্জীর উদ্ধৃতি থেকে। ঐ বৌদ্ধ প্রভাবের সময়েই পুরীর মন্দিরগাত্রে দশাবতার চিত্রে বুদ্ধাবতারের স্থানে জগন্নাথকে অঙ্কিত করেছিলেন কোনো বৌদ্ধশিল্পী। নাহলে, ভারতের অন্যান্য সমস্ত প্রাচীন মন্দিরেই—দশাবতার চিত্রে বুদ্ধাবতারের জায়গায় ভগবান বুদ্ধের ধ্যানীমূর্তি দেখতে পাই আমরা কেমন করে? জগন্নাথক্ষেত্র দখলের পরে, জগন্নাথকে দারুব্রহ্ম বা বিষ্ণুরূপে পুজো না করে, বৌদ্ধরা পুজো করতে লাগলেন বুদ্ধরূপে। তাই, দশাবতারে বুদ্ধবতারের জায়গায় তাঁরা জগন্নাথকে করেছেন চিত্রায়িত। কাশী অর্থাৎ সারনাথ এবং মথুরা এই দুই স্থানই এককালে ছিল বৌদ্ধ প্রভাবিত অঞ্চল। তাই সেখানকার দুই একখানি আধুনিক পঞ্জিকাতেও আমরা দেখতে পাই কোনো অজ্ঞ চিত্রকর এঁকেছেন জগন্নাথের মূর্তি বুদ্ধাবতারের স্থানে। এতো একটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ইতিহাসে ডঃ কাকন্দক। এমনটা হামেসাই ঘটেছে। যখন যে রাজত্ব করেছে যেখানে, তখনই সেখানে সে নিজের রুচি অনুযায়ী সব কিছু করেছে। আর যারা পরাভূত, পদানত, তারা বিজেতার তুষ্টি সাধন করেছে কোন ব্যাপারই বিশেষ কোন প্রতিবাদ না করে। জগন্নাথক্ষেত্রের ব্যাপরেও ঠিক তেমনি ঘটেছে। পুরীতে যখন প্রতিষ্ঠা পান নীলমাধবরূপী-দারুব্রহ্ম যা বর্তমানে জগন্নাথ রূপে দিকে দিকে প্রতিভাত, তখন সে-সৃষ্টি ছিল হিন্দুরই। পরে, সেই জগন্নাথ ক্ষেত্রই কিছুদিনের জন্যে হয়েছিল বৌদ্ধদের করায়ত্ত। জগন্নাথ Cult-এর মধ্যে বৌদ্ধপ্রভাব এখনও দেখতে পাই অনেক ভাবে আমরা সেই কারণেই; কিন্তু সেই প্রভাবের সামান্য ছায়াপাত দেখেই যদি হান্টার, ফার্গুসন, কানিংহাম বলতে থাকেন যে জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম, আর পুরীর মন্দিরের মূলে ছিল বৌদ্ধধর্ম-এর প্রথম সৃষ্টি থেকেই, তাহলে কোনো নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকই তা মেনে নিতে রাজী হবেন না। উলোরার কাছে বুদ্ধমন্দিরের নাম জগন্নাথ মন্দির দেওয়া হলেই পুরীর মন্দিরকে বৌদ্ধ-ধর্মমূলক বলেত হবে, এমন যুক্তি কিন্তু সত্যিই হাস্যকর। কেনা জানে অজন্তা এবং ইলোরা ছিল একদিন বৌদ্ধধর্ম এবং শিল্পের লীলাভূমি? পুরীর জগন্নাথক্ষেত্র যখন বৌদ্ধদের অধীনে, যখন পুরীতে জগন্নাথকে বুদ্ধরূপে গ্রহণ করে বৌদ্ধরা পূজার্চ্চনা শুরু করেছিলেন, তখন তাঁদেরই প্রভাবে যদি বৌদ্ধ-অধ্যুষিত ইলোরার একটি বুদ্ধ মন্দিরের নামকরণ হয়ে থাকেই জগন্নাথের নামে তাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কি আছে?' 'কিন্তু বিষ্ণুপঞ্জর? কোন কিছুর পঞ্জরাস্থিকে পূজো করা কখনই হিন্দু প্রথা নয়, এটা বৌদ্ধ প্রথা। এটাকে অস্বীকার করার তো কোন উপায় নেই।' কাকন্দক খুশি খুশি মুখে এবার তাঁর তুণ থেকে অন্যতম মুখ্য তীরটি বের করে আনলেন।

পুনরায় হাসতে হাসতে জবাব দিল কার্লেকার—'কোন্ শাস্ত্রে পেয়েছেন এই বিষ্ণুর পঞ্জরাস্থির কথা, ভিক্ষুজী। কোনো প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এ কথা নেই। এটাও হচ্ছে বৌদ্ধ প্রভাবের সময়ে বৌদ্ধদের একটি রটনা। জগন্নাথ যে বুদ্ধ, সেটা প্রমাণ

করতে গিয়ে তাঁরা প্রচার করতে বাধ্য হয়েছিলেন—জগন্নাথের মধ্যে বুদ্ধাস্থির অবস্থিতির কথা আবার কখনো বৌদ্ধরাই প্রচার করেছিলেন। বুদ্ধদন্তের কথাও পরবর্তীকালে, অভিসন্ধিমূলক সেই বৌদ্ধরটনারই প্রতিফলন ঘটেছে হিন্দুপাণ্ডাদের জিহ্বায়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে লাগলেন বুদ্ধের বদলে বিষ্ণুর পঞ্জরের কথা। কিন্তু এসব উদ্ভট কথা কোনো প্রাচীন গ্রন্থেই খুঁজে পাবেন না আপনি, ভিক্ষুজী।' হঠাৎ ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন সিংহলী পণ্ডিত। রোষবিকৃত স্বরে তিনি প্রায় ফুঁশে উঠলেন—'কোথাও যদি খুঁজেই পাবো না, তবে জগন্নাথের নবকলেবর ব্যাপারটা কি? জগন্নাথের পুরনো মূর্তি বুকের মধ্যে থেকে পঞ্জরাস্থি বের করে নিয়ে সেটাকেই আবার ভরে দেওয়া হয় জগন্নাথের নতুন মূর্তির বুকে— একেইতো বলে নবকলের! তবে?''

'নবকলেবরে পুরনো মূর্তির ভেতর থেকে কিছু একটা বের করে নিয়ে নতুন মূর্তিতে সেটা রাখা হয়, একথাটা ঠিক। কিন্তু ঐ বস্তুটি যে পঞ্জরাস্থি বা দন্ত, এমন কথা কোনো প্রাচীন গ্রন্থে দেখেছেন কি?'

'আমি কেমন করে দেখবো? পুরীতে গিয়ে পুজারী, পাণ্ডা যাঁকে জিজ্ঞেসা করবে তিনিই বলবেন—সূতসংহিতা বা নীলাদ্রিমহোদয় পড়তে। এসব বই কি পড়বার সুযোগ পেয়েছো?'

'পেয়েছি, ভিক্ষুজী, নিশ্চয়ই পেয়েছি। সূতসংহিতা বা নীলাদ্রি মহোদয়ের রচনাকাল মনে হয় খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, সুতরাং এটা একেবারেই প্রাচীন নয়। আর এও মনে হয়, যাঁরা বলেন নিলাদ্রিমহোদয়ে নবকলেবরের কথা লেখা আছে, তাঁরা নিজেরা কখনই নীলাদ্রিমহোদয় পড়েন নি। পড়লে, কখনও এমন কথা বলতে পারতেন না? 'তার মানে?'

'শুনলে বিশ্বাস করতে পারবেন কি—বিপুলাবয়ব গ্রন্থ নীলাদ্রিমহোদয় জগন্নাথ মন্দিরের দেবদেবীর পূজার্চ্চনা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছে বটে, কিন্তু অতবড় গ্রন্থে কোথাও নবকলেবর-উৎসবের নামটিও উচ্চারণ করা হয় নি।'

—'সে কি কথা?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। এ তো গেল অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা গ্রন্থের কথা।

স্কন্দপুরাণীয় পুরীমাহাত্ম্য রচিত হয় নিলাদ্রিমহোদয়ের অনেক আগে, ১৩০০ খৃষ্টাব্দের সামান্য পূর্ব্বে অথবা পরে। সেই পুরীমাহাত্ম্যেও পুরীর বড় দেউলের সমস্ত ক'টি যাত্রা বা উৎসবের উল্লেখ থাকলেও, নবকলেবরের কথা কিন্তু অনুচ্চারিতই রয়ে গেছে। সুতরাং যখন প্রাচীন কোন গ্রন্থেই নবকলেবরের নাম উল্লেখ করা হয় নি, তখন আমরা নিশ্চয়ই ধরে নিতে পারি 'নবকলেবর' জগন্নাথ-সৃষ্টির বহু পরেকার একটি অর্ব্বাচীন উৎসব। এবং তারই সঙ্গে এটাও স্বীকার করে নিতে পারি যে, আজকের জগন্নাথদেব সভ্যতার ঊষাকালে যখন আদিবাসী এবং হিন্দুপূজিত দারুব্রহ্ম, নীলমাধব অথবা পুরুষোত্তম ছিলেন, যখন ছিলেন বৌদ্ধপূজিত বুদ্ধরূপী জগন্নাথ, তখনও এই নবকলেবর-

উৎসব, আজকের আমরা যেমনটি দেখি তেমনভাবে অনুষ্ঠিত হত না। নবকলেবর আজকের রূপ পেয়েছে অনেক পরে। অতএব বিষ্ণুর পঞ্জরাস্থি বা বুদ্ধের দন্ত রক্ষিত হয় নতুন মূর্তির মধ্যে বলে যে কথা প্রচলিত আছে, তার সবটাই মন গড়া।'

'তবে ওটা কি জিনিস? যে বস্তুটি পুরনো মূর্তির ভেতর থেকে নিয়ে নতুন মূর্তিতে ঢোকানো হয়?'

'ঠিক কি জিনিসি, তা বলতে পারবো না। ওটা নিয়ে গবেষণা চলেছে এখন পূরীতে। ফলাফল জানতে পারা যাবে হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই। যে দুটি গ্রন্থ থেকে বর্তমানে নবকলেবর-উৎসবের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন জগন্নাথ মন্দিরের পুরোহিতরা ; তাদের একটির নাম বনযাগ-বিধি আর অপরটি হচ্ছে চলশ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা-বিধি। এ দুটি গ্রন্থের রচনাকাল, জার্মানীর Heidelberg University-র আধুনিকতম গবেষক ডঃ জি.সি. ত্রিপাঠারী মত অনুযায়ী ১৬০০ থেকে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। দেখা যাচ্ছে এ দুটিও অপ্রাচীন। তবু, এ গ্রন্থ দুটি থেকেই আপনার ঐ প্রশ্নের জবাব যা পাওয়া যাচ্ছে, তা কিন্তু পঞ্জরাস্থি বা বুদ্ধদন্ত একেবারেই নয়। গ্রন্থে, যে বস্তুটি জগন্নাথের পুরনো মূর্তি থেকে নবতর মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাকে বলা হয়েছে 'ব্রহ্ম-পদার্থ'। সুতরাং পঞ্জরাস্থি বলে ঐ বস্তুটিকে চালিয়ে, জগন্নাথকে বৌদ্ধধর্মমূলক বলে প্রমাণ করার সব চেষ্টা বৃথাই হল মনে হয় আপনাদের—এক্ষেত্রেও।'

অনেকক্ষণ নীরব থাকার পরে, ডাঃ বড়ুয়া স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে এই প্রথম কথা বললেন—'তুমি তো দেখছি জগন্নাথ মন্দিরের ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করেছো। প্রচুর। তা, ব্রহ্ম-পদার্থটি যে কি, সে সম্বন্ধে তোমার ধারণা আমরা যদি জানতে চাই, তুমি কি বলবে?'

সসম্ভ্রমে কার্লেকার উত্তর দিল—নিশ্চয়ই বলবো, স্যার, নিশ্চয় বলবো। তবে, আমাকে আর ক'টা দিন সময় দিন। কয়েকজন জার্মাণ এবং ভারতীয় স্কলার গত কয়েক বছর ধরে অনেক অনুসন্ধান চালিয়েছেন এই নবকলেবরের ওপর। এখনও, তাঁদেরই দেওয়া সূত্র ধরে পুরীতে রিসার্চ করছে আশ্চর্য্য মেধাবী এবং প্রতিভাবান এক যুবক, নাম—অনিন্দ্য আপ্পারাও। তার গবেষণা এখন শেষ পর্য্যায়ে, অনিন্দ্যর গবেষণা শেষ হলেই, আমি নিশ্চয়ই আপনাকে জানাবো 'ব্রহ্মপদার্থ' সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত কি।'

'কি অসভ্য মেয়েটা দেখছেন, স্যার? এতবড় সভায়, ডঃ বড়ুয়ার সামনে শুনাচ্ছে কি না ননম্যাট্রিক একটা লোফারের কথা? অনিন্দ্যকে বলছে—আশ্চর্য্য মেধাবী আর প্রতিভাবান? আজ আর ওর রক্ষা নেই।' জয়ন্তের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল পদ্ম। চমকে উঠল জয়ন্ত। 'কেন? রক্ষা নেই কেন?'

'ঐ দেখছেন না কে দাঁড়িয়ে আছে ঐ গেটের পাশে ইতালীয়ান সিল্কসার্জের চুস্ত পায়জামা আর শেরোয়ানী পরে? ঐ ছেলেটাই হল মুকুন্দলাল অগ্রবাল। বিরাট বড়লোকের সন্তান। কার্লেকারের সঙ্গে একই কলেজে পড়তো। ও-ই বিয়ের প্রস্তাব

দিয়েছিল মেয়েটাকে। কেমন টুকটুকে গায়ের রং, কি স্মার্ট ঐ মুকুন্দ, দেখতেই তো পাচ্ছেন। সোজা ওরই মুখের ওপর না বলে দিয়েছে কিন্নরী। তবু, আশা ছাড়তে পারেনি ছেলেটা। কারণ, কিন্নরীর বাবা বলেছেন—কন্যার জগবন্ধু-ব্রত শেষ হলে, তবেই বিয়ের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করতে পারবেন তিনি তার কাছে। কিন্তু এরই মধ্যে কলকাতায় ছড়িয়ে পড়েছে ঐ ডিবচ্ অনিন্দ্যর সঙ্গে কিন্নরীর ঘনিষ্ঠতার কথা। অগ্রবালও শুনেছে সে-কাহিনী। এখানকার ব্যায়ামাগারের চীফ পেট্রন তো ও-ই। হাজার হাজার টাকা ও খরচ করে ব্যায়ামাগারের জন্যে। সেই ব্যায়ামাগারের ছেলেদের মুকুন্দই নিয়ে এসেছে আজ কিন্নরীকে অপদস্থ করতে। শুনলেনই তো একটু আগে, ওর রূপের থলি কেড়ে নিয়েছে ব্যায়ামাগারের ছেলেরা। এখন আবার সভায় দাঁড়িয়ে নির্লজ্জের মত ঐ অগ্রবালের প্রতিদ্বন্দ্বী অনিন্দ্যর প্রশস্তিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে মেয়েটা, এইবার দেখুন এর ফলে কি হয়। মুকুন্দকে ভয় পায় না, এমন লোক খুব কমই আছে এ-অঞ্চলে।'

শিরদাঁড়া শক্ত হয়ে উঠল জয়ন্তের। সর্ব্বনাশ! বলছে কি মেয়েটা? এতগুলি মাস্‌ল্‌ম্যান আজ এখানে হাজির হয়েছে তাহলে ধনকুবেরের ঐ প্রতিহিংসাপরায়ণ পুত্রেরই নির্দ্দেশে—কেবলমাত্র একটি নিরস্ত্র সঙ্গীহীন তরুণীর সম্ভ্রমে আঘাত হানবার জন্যেই?'

'অপরেশকে একবার ডাকো তো আমার কাছে।' জয়ন্ত বলল পদ্মকে। পদ্ম ডায়াসের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অপরেশকে হাতের ইসারায় ডাকল। অপরেশ কাছে আসতেই জয়ন্ত শুধালো—'তোমার মত ছেলে এখানে থাকতে ঐ অগ্রবাল কিন্নরীর অসম্মান করবে কতকগুলি ডাম্বেল-মুগুর ভাঁজা ছেলেকে দিয়ে, এটা তোমরা বরদাস্ত করতে পারবে?' অপরেশ তা-না-না করে বলল—'না স্যার, অসম্মান কেন করবে, প্রতিবাদ জানাবে। দেখছেন না ডঃ ভিক্ষু কাকন্দক, ডঃ অনিল কান্তি বড়ুয়ার মত প্রজ্ঞাবানদের মুখের ওপর কেমন এলোপাথারি যা তা বলে তর্কাতর্কি করছে ঐ কিন্নরী। আবার, অনিন্দ্য আপ্পারাও-এর প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। অনিন্দ্যকে জানেন স্যার? একটা ব্রেনলেস্, পেনীলেস্ হ্যাগার্ড। বিদ্যের দৌড় যার ক্লাস টেন পর্য্যন্ত।'

এই সময় কাকন্দকের গলায় প্রশ্ন শোনা গেল পুনর্ব্বার। 'শিশুরাম, মুকুন্দরাম, মাগুনিয়া দাস, বেঙ্কটাচার্য্য—এদের লেখা পুঁথি কি তুমি পড়ো নি? এঁরা তো জগন্নাথকে বুদ্ধই বলেছেন?'

সঙ্গে সঙ্গে কিন্নরীর জবাব—'কিন্তু এঁরা তো কেউই প্রাচীন গ্রন্থাকার নন, সবাই সেদিনকার লোক। এঁরাও লোকের মুখে মুখে বৌদ্ধদের তৈরী কিম্বদন্তী শুনে তাঁদের গ্রন্থে বুদ্ধ আর জগন্নাথকে এক করে দেখিয়েছেন।'

'মাগুনিয়া দাস, শিশুরাম এঁদের লেখা বই কখনো পড়োনি তুমি। হয় তো নামও শোননি এঁদের এর আগে।'

হাসিমুকুলিত মুখে কিন্নরী জানালো—'আপনি অকারণে উত্তেজিত হয়ে আমার

পড়াশোনার গভীরতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করছেন। শিশুরাম এবং মাগুনিয়া দাস মালবদেশের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে বলেছেন, যখন দীর্ঘ অপেক্ষায় ক্লান্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন বৃদ্ধ শিল্পীর কাছে প্রদত্ত তাঁর বচনের কথা বিস্মৃত হয়ে ধৈর্য্যচ্যুত এবং সন্ধিগ্ধ মনে জোর করে দরজা খুলে ফেললেন সেই কক্ষের, যে-কক্ষে বসে জগন্নাথের দারুমূর্তি নির্মাণ করেছিলেন বৃদ্ধশিল্পী, তখন, তিনি বিস্মিত হয়ে দেখলেন—সিংহাসনের ওপর দারুব্রহ্ম জগন্নাথ বিরাজ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর হস্ত-পদ-অঙ্গুলি কিছুই নাই। বৃদ্ধশিল্পীও হয়েছেন অন্তর্হিত। তখন সত্যলঙ্ঘন করেছেন ভেবে অনুশোচনায় বিপর্য্যস্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন কুশশয্যায় শয়ন করলেন প্রায়শ্চিত্তের জন্যে। মধ্যরাত্রে জগন্নাথ রাজাকে দর্শন দিয়ে যা বললেন তা মাগুনিয়া দাসের ভাষায়—মুই বৌদ্ধরূপ হই। কলিযুগরে থিবু রহি। সুবর্ণ হাত যোড় করি। গড়াহিদেব দণ্ডধারী।। অর্থাৎ, তোমার কোন চিন্তা নাই। কলিযুগে আমি হস্তপদহীন বুদ্ধরূপে এখানে থাকবো। তুমি সোনা দিয়ে আমার হাত গড়ে দিও।'

'তবে?' চিৎকার করে উঠলেন বৃদ্ধ কাকন্দক, 'এখন কি হল? এখন তো মেনে নিতেই হবে যে, জগন্নাথ আসলে বুদ্ধ?'

''আমি তো আগেই বলেছি, আপনাকে, কয়েকজন উৎকল কবি তখনকার বৌদ্ধ-সৃষ্ট উপাখ্যানে প্রভাবান্বিত হয়েই ঐরকম কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। এর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কোথাও নেই। কিম্বদন্তী তো আর ইতিহাস নয়। বুদ্ধ আর জগন্নাথ যে এক নন এবং দশাবতার আর জগন্নাথের মধ্যে যে অনেক প্রভেদ, সেকথা তো স্পষ্ট করেই লেখা আছে উৎকল খণ্ডে (উৎকল খণ্ড, ৫১ অঃ) পড়ে দেখতে পারেন।' 'কিন্তু, কিন্নরী', অনিলকান্তি বাবু বললেন, 'ঐ মহাপ্রসাদ এর ব্যাপারে পুরীতে কেউ যে কোন জাতিবিচার করে না, এর মূলে যে বৌদ্ধধর্ম কাজ করেছে, সে কথা তো তুমি স্বীকার করো?

'না, স্যার, মহাপ্রসাদ গ্রহণের ব্যাপারে যে উদারভাব, তার কারণ অন্য, বৌদ্ধধর্ম নয়। যদি বৌদ্ধপ্রভাবেই মহাপ্রসাদে এমন জাতপাত বিচারহীনতা এসে থাকবে, তবে এমন মহাপ্রসাদ আহারের আয়োজন বোধি-গয়াতে নেই কেন? সারনাথে নেই কেন? আপনি জানেন আশা করি, এক মহাপ্রসাদ ছাড়া অন্য সমস্ত ব্যাপারেই পুরীতে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতই, যথেষ্ট জাতি-বর্ণ বিচার বর্তমান। তাছাড়া, যদি সত্যি কথা বললে কেউ আমাকে ভুল না বোঝেন, তাহলে আমি একথাও বলবো যে, ভগবান বুদ্ধ স্বয়ংও জাতপাত বিচারে একে বারে যে পক্ষপাত শূন্য ছিলেন, তা নয়।'

যদিও দু' পক্ষেরই ইংরেজীতে বাদবিতন্ডা চলছিল এতক্ষণ. কিন্তু তেমন উচ্চগ্রামে নয়। কিন্নরীর শেষ কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেক্‌চারষ্ট্যাণ্ডের ডেস্ক-এর ওপর সশব্দে একটা চাপড় মেরে আর্তনাদ করে উঠলেন ভিক্ষু ডঃ কাকন্দক—হোয়াট ননসেন্স ইউ ট্‌ক? মহান উদার সদ্ধর্মের প্রবর্তক ভগবান তথাগত জাতিবর্ণ-বিচারে

পক্ষপাত শূন্য ছিলেন না? এতক্ষণ তো খুব ঐতিহাসিক সত্য-ঐতিহাসিক সত্য বলে চিল্লে গলা ফাটাচ্ছিলে। অমিতাভ বুদ্ধের সম্বন্ধে যা বললে, তাকি ঐতিহাসিক সত্য? এই দন্তমহোৎসবের পূন্য সভায় দাঁড়িয়ে, বুদ্ধদেবের নামে তুমি জঘন্য অপবাদ দিচ্ছ, তোমার সাহস তো কম নয়?' খোলা জানালার বাইরে শিক ধরে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু শ্রোতার কণ্ঠে উত্তেজিত আবেদন শোনা গেল এইবার—'টার্ণ হার আউট, ভিক্ষুজী, পাষণ্ডীকে বের করে দিন এক্ষুণি।'

শান্তস্বরে কিন্নরী বলল—'আমি ঐতিহাসিক সত্যই বলছি ডঃ কাকন্দক।'

ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে গর্জে উঠলেন সিংহলী পণ্ডিত, 'কোনো ইতিহাসে পেয়েছো এই মিথ্যা অপবাদের কথা? নিশ্চয়ই বৌদ্ধবিদ্বেষী কোনো হিন্দু লেখকের লেখা গ্রন্থে?'

'আজ্ঞে না। আমি এখনই বলছি কোনো প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ গ্রন্থে পেয়েছি আমি এই ঐতিহাসিক সত্যকে। কিন্তু সে কথা বলার আগে, ডঃ কাকন্দক, সবিনয়ে দুটি কথা আপনাকে জানানো দরকার বলেই মনে করছি যে! আপনি বলছেন—আমি ভগবান বুদ্ধের নামে অপবাদ দিচ্ছি। আপনি কি ভুলে গেলেন—আমার ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম্ম, আর আমার ব্রতের নাম জগবন্ধু ব্রত? এই বৈদিক সনাতন ধর্ম্ম যখনই অন্য কোন ধর্ম্ম বা উপধর্মের সংস্পর্শে এসেছে, তখনই সেই ধর্ম্ম বা উপধর্মের মূলনীতিকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছে গভীরভাবে। তারপর একদিন দেখা গেছে, ঐ ধর্ম বা উপধর্মের যা কিছু ভালো, যা কিছু গ্রহণীয়, তাই সে নিজের হৃদয়ে গ্রহণ করেছে সশ্রদ্ধ চিত্তে? এতবড় ইলাষ্টিক ধর্ম পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। এই সনাতন ধর্ম্মেরই অনুসারী পরম বৈষ্ণব, কবি জয়দেব, ভগবান বুদ্ধের ক্ষমা, প্রেম, অহিংসা এবং সহনশীলতাকে সনাতন ধর্ম্মের স্থিতির দেবতা বিশ্বের পালন কর্তা ভগবান বিষ্ণুর অপার মমত্ববোধ, সর্ব্বজীবেসমদর্শীতা এবং সর্ব্বংসহা ভাবের সঙ্গে তুলনা করে অবৈদিক ধর্মের প্রচারক বুদ্ধদেবকেও বিষ্ণুর অবতার বলে ঘোষণা করতে একটুও দ্বিধাবোধ করেননি তাঁর দশাবতার স্তোত্রম্-এ? যে সনাতন ধর্মের অনুসরণকারীরাই একদিন ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহম্মদের গুণাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সংস্কৃত ভাষায় সৃষ্টি করেছেন আল্লোপ-নিষদের। আল্লোপ-নিষদ গ্রন্থে যে সনাতন ধর্মীরা উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগে অনায়াসে লিখতে পেরেছন—আল্লোহরসুল মহমদরকং বরস্য অল্লা অল্লাম্। আদল্লাবুকমে ককম্ অল্লাবুকনিখাতকম্। মোহম্মদ আল্লার রসুল। অর্থাৎ আল্লাহ আলেকময়, অক্ষয়, কে, চিরপরিপূর্ণ এবং স্বয়ম্ভু; সেই মহাসমুদ্রের মত হৃদয় সনাতন ধর্মের, অনুসারী হয়ে, আমি দেবো—বিশ্বের একটি মহোত্তম ধর্মের প্রবত্তক অলোকসামান্য করুণার আধার ভগবান বুদ্ধকে অপবাদ?'

মুহূর্তের জন্যে নীরব হল মেয়েটা। মনে হল, চোখ দুটো তার যেন ছল্ ছল্ করছে ক্ষুণ্ণ অভিমান বুকে নিয়ে একটু পরেই পুনশ্চ মুখর হল সে—'আর, এও কি আপনার মনে নেই, শ্রদ্ধের ভিক্ষুজী, যে, আমি গত দুই বছর ধরে জগবন্ধু ব্রত-চারণ করে চলেছি?

আমার প্রাণের প্রভু জগবন্ধু তো সামান্য টীলা বা ডুংরী নন, পরেশনাথ বা ত্রিকূটের মত ছোট পাহাড়ও নন। তিনি যে হিমালয়। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, বৌদ্ধ, জৈন—এইসব ক'টি ধর্মকে বুকে নিয়ে গগণচুম্বী জগদ্বন্ধু দেবতাত্মা হিমালয়ের মতই যে চির প্রশান্তিতে পুরীর বড় দেউলের ঐ রত্নবেদীর ওপর আসন গ্রহণ করে রহস্যময় এক স্বর্গীয় হাসির ছটায়—দিকবিদিক উদ্ভাসিত করে রেখেছেন মানব সভ্যতার ব্রহ্মমুহূর্ত থেকেই। সর্ব্বধর্মের সমন্বয় ঘটেছে যে দেবতার অন্তরাত্মায়, তাঁরই ব্রত উদ্‌যাপন করছে যে, সে কি কখনো পারে অন্য কোন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করতে?'

'ওসব ফ্যাচফ্যাচানি শুনতে চাই নে আমি। আমি জানতে চাই—কোন্ বৌদ্ধ গ্রন্থে লেখা আছে—বুদ্ধদেব জাতপাত বিচারের ব্যাপারে পক্ষপাতশূন্য ছিলেন না?'

নিরুত্তের, স্বাভাবিক স্বরে উত্তর দিল তিলকাঙ্কিতা তন্বীটি—'মহাবগ্‌গ' সমস্ত বৌদ্ধধর্মানুরাগীদের পরম শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ মহাবগ্‌গে (১/৪৭) আমরা দেখছি ভগবান বুদ্ধ নির্দ্দেশ দিচ্ছেন—'কোনো দাস অর্থাৎ শূদ্র প্রব্রজ্যা নেবে না। যে শূদ্রকে প্রব্রজ্যা উপদেশ দেবে, সে দুস্কট পাপে লিপ্ত হবে।' এ থেকেই কি বোঝা যাচ্ছে না যে, বুদ্ধদেব নিজেও উঁচু জাত, নীচু জাত মানতেন কিছুটা? কিন্তু এসব কথা এখানেই থাক। অতবড় একজন জগদ্বরেণ্য মহাপুরুষ, যাঁকে একদিক থেকে অদ্বিতীয়ই বলা যেতে পারে, তিনি যা করেছেন, তা হয়তো কাল এবং পরিবেশের প্রয়োজনেই করেছেন। আড়াই হাজার বছরের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে তাঁর কাজের বিচার করতে যাওয়া আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই হবে না। তবে, খোলা মন নিয়ে, বিদ্বেষবিহীন প্রাণে বলছি ডঃ কাকন্দক, কেবলমাত্র তিনটি আধুনিক কবির রচনা ছাড়া, অর্থাৎ ওড়িয়া ভাষায় লেখা মাগুনিয়া দাসের 'ক্ষেত্রপুরাণ', শিশুরাম দাসের 'দারুব্রহ্ম' এবং তেলেগু ভাষায় রচিত বেঙ্কটাচার্য্যের 'জগন্নাথমাহাত্ম্য' ছাড়া, অন্য আর কোনো গ্রন্থে কেউ জগন্নাথকে বুদ্ধ বলেননি। এঁরা তিনজনই ছিলেন জগন্নাথক্ষেত্রে বৌদ্ধপ্রভাবের বহু পরেকার কবি। এঁদের জন্মের অনেক আগে রচিত প্রাচীন ব্রহ্মপুরাণ ও নারদপুরাণ পড়ে দেখুন, সেখানে মালবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের কাহিনী আছে ঠিকই, কিন্তু জগন্নাথকে বুদ্ধ বলা হয়নি কোথাও।'

মেয়েটির যুক্তির প্রাখর্যের মুখোমুখি হয়ে প্রজ্ঞাপ্রবীন কাকন্দক যতই অনুভব করলেন—এ কন্যার মধ্যে ধর্মান্ধতার ছিটেফোঁটাও নেই, যা আছে তা অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অতলস্পর্শী গভীরতা ছাড়া আর কিচ্ছুই নয়, ততই এক দুঃসহ পরাভবের গ্লানি কোথা থেকে ধেয়ে এসে আচ্ছন্ন করে দিতে চাইল তাঁর মস্তিষ্ককে, তাঁর সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রের শাখাপ্রশাখাকে। সেই গ্লানি-বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে এবার তিনি শেষ চেষ্টা করলেন নিজের হৃত মর্যাদার পুনরুদ্ধারের। উচ্চতম গ্রামে গলা চড়িয়ে বিক্রিত মুখে বলে উঠলেন—'জগন্নাথ বুদ্ধ না হলে তার অমন মূর্তি এলো কোথা থেকে? আকাশ থেকে? বৌদ্ধযন্ত্রগুলির চিত্র দেখিয়ে জেনারেল কানিংহাম তো প্রমাণ করেই দিয়েছেন—

জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা হচ্ছেন বৌদ্ধদের বুদ্ধ সংঘ আর ধর্ম। ধর্মযন্ত্রের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিলেই তো আর এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না কারও। বলি, একমাত্র পুরীর জগন্নাথ ছাড়া তোমাদের বিষ্ণুর এমন হস্তপদহীন অদ্ভুত মূর্তি আর কি কোথাও আছে যে জগন্নাথকে বিষ্ণু বিষ্ণু করছ?' 'ঠিক এই একইরকম প্রশ্ন আমিও তো আপনাকে করতে পারি, ভিক্ষুজী—একমাত্র পুরীর জগন্নাথ ছাড়া সারা দুনিয়ার আর কি কোথাও ভগবান বুদ্ধের এমন হস্তপদহীন অদ্ভুত দারুরূপ আছে যে, আপনি জগন্নাথকে বুদ্ধ বলে জাহির করছেন আজকের এই সভায়?'

কিন্নরীর পালটা প্রশ্নে কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন সিংহলী তামিল ভিক্ষু। হঠাৎ কোনো জবাব দেবেন, সে ক্ষমতাও বোধ করি হারিয়ে বসলেন তিনি।

মেয়েটা আবার সরব হল। বলল—'কানিংহাম, ফার্গুসন, হান্টার—এঁরা না হয় বিদেশী গবেষক, জগন্নাথের ব্যাপারে তাঁদের গবেষণায় ত্রুটিবিচ্যুতি থাকাটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রাজা রাজেন্দ্রলাল এবং অক্ষয় দত্তের মত পুরা-পণ্ডিতদের মনেও তো এই প্রশ্নটা জাগেনি একবারও—কেন বিশ্বের সর্বত্র যেখানে যত বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে, তাদের কারুর সঙ্গে জগন্নাথমূর্তির কোনো মিল নেই, এবং কেন তা সত্ত্বেও জগন্নাথকে বুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন বৌদ্ধরা? কানিংহাম বৌদ্ধধর্ম দেখিয়ে চিৎকার জুড়ে দিলেন—পুরী মন্দিরের মূর্তিত্রয় বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ ছাড়া অন্য কিছু নয়, অমনি তা সত্য বলে মেনে নিতে হবে? ধর্মযন্ত্র এবং জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের মূর্তি পাশাপাশি রেখে দেখুন, কোনোই মিল নেই। হান্টার, ফার্গুসনের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে রাজেন্দ্রলাল আর অক্ষয় দত্ত তো বলেই বসলেন—জগন্নাথ ব্যাপারটাই বৌদ্ধ ধর্মমূলক। অর্থাৎ মূলতঃ ঐ মন্দির বৌদ্ধদেরই কীর্তি, হিন্দুরা পরে ওটাকে দখল করে নিয়ে বৌদ্ধ-ধর্ম-সংঘকে জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম বানিয়ে পুজো করছে। এমন হাস্যোদ্রেককর অনৈতিহাসিক কথা অতি সাধারণ ইতিহাসজ্ঞও সমর্থন করতে এগিয়ে আসবেন না কখনই। ফার্গুসন, কানিংহাম, হান্টার, রাজেন্দ্রলাল কি তাহলে বলতে চান যে, বৌদ্ধধর্মের অবসান এবং রাজা যযাতিকেশরীর অভ্যুদ্বয়ের সন্ধিক্ষণেই হিন্দু জগতে জগন্নাথের আবির্ভাব? যে জগন্নাথ ক্ষেত্রে যুগযুগান্তর ধরে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমস্ত ভারতীয় হিন্দুদের এক প্রধান পুণ্যস্থান বলে গণ্য, যে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের উল্লেখ আমরা পাই বৈদিক যুগের বিভিন্ন গ্রন্থে, রামায়ণে, মহাভারতে, প্রাচীন পুরাণসমূহে, তার আবির্ভাবক্ষণ হচ্ছে রাজা যযাতিকেশরীর অভ্যুদয় মুহূর্তে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় নবম অথবা দশম শতাব্দীতে? এমন পাগলের প্রলাপকে যে বিশ্বাস করবে সে আর যাই হোক, ঐতিহাসিক নিশ্চয়ই নয়।'

এই সময় ঝাঁ করে জানালার বাইরে থেকে একটা ইটের টুকরো এসে লাগল কিন্নরীর গায়ে। সেই ইটের টুকরোটা পায়ের কাছ থেকে হাতে তুলে নিয়ে, জানলার

দিকে একবার মুখ ঘুরিয়ে তাকালো সে। দেখতে পেল, জানলার অদূরে, ঘরের মধ্যেই দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুকুন্দলাল অগ্রবাল, ঠোঁটের কোণে দুর্বৃত্তের হাসি। হাতের ইটের টুকরোটা মাটিতে ফেলে দিয়ে আবার আরম্ভ করতে গেল কিন্নরী, কিন্তু হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে, ডঃ বড়ুয়া এবার উঠে দাঁড়ালেন। ভয়ঙ্কর গম্ভীর হয়ে উঠেছে তাঁর চোখ-মুখ, দুদিকের চোয়ালে দেখা দিয়েছে কাঠিন্য। মেঘমন্দ্রের স্বরে তিনি বললেন—'অমিতাভবাবু, আপনি তমোনাশ সংঘের জেনারেল সেক্রেটারী। আপনি এ ঘরে উপস্থিত থাকতেও এমন অসভ্যতা শুরু হয়েছে কেন এখানে? জানলার ওপার থেকে ইট এসে পড়ছে কিন্নরীর গায়ে, আমি নিজে দেখেছি। আপনি এখনও বসে আছেন? যান, খোঁজ করুন কারা করছে এমন অসভ্যতা, কী তাদের উদ্দেশ্য?' অমিতাভ চৌধুরী হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। বড়ুয়া আবার তাঁর আসনে উপবিষ্ট হতেই, সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার তাঁর দিকে তাকিয়ে পুনরায় মুখ খুলল কার্লেকার, 'শবর সর্দার বিশ্ববাসু যে মূর্তিটির পুজো করতেন বলে বলা হয়েছে, যাকে বলা হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে নীলমাধব, সে মূর্তি ছিল কিন্তু সংখ্যায় একটি। আজকের মত তিনটি নয়। মালবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রথম দর্শন পান নীলমাধবেরই। সেই নীলমাধবই পরবর্তীকালে কখনো দারুব্রহ্ম, কখনো পুরুষোত্তম, আবার কখনো বা জগন্নাথ নামে পূজিত হয়ে আসছেন তাঁর কোটি কোটি ভক্তবৃন্দের দ্বারা। সুতরাম, জগন্নাথ আরম্ভে যখন একটিমাত্র মূর্তিই ছিলেন, তখন আর ঐ ধর্মযন্ত্রের তিনটি প্রতীক, বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের কথা ওঠেই বা কেমন করে? জগন্নাথ যে মূলতঃ বুদ্ধ নন, তার সহজ প্রমাণ তো এখানেই পাওয়া গেল।'

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কাকন্দক গর্জে উঠলেন—'পাওয়া গেলেই হল? প্রমাণ করতে হবে না—বাকি দুটি মূর্তি ঐ বলরাম আর সুভদ্রা কোত্থেকে এলো, কবে থেকে এলো।' 'বলব, সব বলব, ভিক্ষুজী, একটু ধৈর্য ধরুন। ভুলে যাবেন না, আপনি রহস্যনাথ জগন্নাথের রহস্যঘন যবনিকা সরিয়ে সত্যের অনুসন্ধানে যে প্রবৃত্ত হচ্ছেন। আপনার ধৈর্যের বাঁধকে শক্ত করতেই হবে যে।' ক্ষণেকের বিরতি। তারপরেই পুনরারম্ভ—'কবে বলরাম এবং কখন সুভদ্রা কেমনভাবে এসে রহস্যরাজ জগন্নাথের পাশটিতে নিজেদের আসন করে নিলেন, তা বলছি একটু পরে। তার পূর্বে এ-কথাটি জানিয়ে রাখি—জগন্নাথের যে মূর্তি আজ দেখছেন, তেমন হস্ত-পদ-অঙ্গুলিহীন মূর্তি কিন্তু ছিল না জগন্নাথের মাত্র পাঁচশো বছর আগেও।' 'বলো কি? জগন্নাথ সম্বন্ধে এমন কথা আবার পেলে তুমি কোথায়?' ডঃ বড়ুয়া প্রশ্ন করলেন।

একটু হাসল কিন্নরী। অনেক গ্রন্থেই এ সত্য লিখিত হয়েছে, স্যার। নারদপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণের মত প্রাচীন গ্রন্থ তো বলেইছে চতুর্ভুজ জগন্নাথ এবং বলরামের মূর্তির কথা, তারই সঙ্গে কপিলসংহিতা এবং উৎকলখণ্ডেও জগন্নাথ-বলরামে চতুর্ভুজ মূর্তিরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে বার বার। আর ঐ সবকটি গ্রন্থেই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সুভদ্রার

দ্বিভূজা মূর্তির।' গলার শিরা ফুলিয়ে ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবার কাকন্দক—'এই বৌদ্ধবিদ্বেষী পাপিয়সীটার একটা কথাও বিশ্বাস করবেন না ডঃ বড়ুয়া। যা বলছে সবই বানিয়ে বলছে এ।'

কিন্নরী কিন্তু থামল না। ডঃ বড়ুয়ার দিকে তাকিয়ে সে বলেই চলল—'গবেষকরা গবেষণা করে বুঝতে পেরেছেন কপিলসংহিতা রচিত হয়েছিল শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের পরে। সেই কপিলসংহিতাতেও যেহেতু আমরা জগন্নাথ-বলরামের চতুর্ভূজ এবং সুভদ্রার দুই বাহুর বর্ণনা পাচ্ছি, সেহেতু আমরা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পেরেছি যে—আজ থেকে মাত্র পাঁচশো বছর আগে পর্যন্ত পুরীর মন্দিরে এই তিনটি মূর্তির এমন হস্ত-পদ-অঙ্গুলিহীন অবস্থা ছিল না। চৈতন্যের জীবনচরিতাকাররাও সকলেই লিখে গেছেন যে, আমাদের গৌরগুণমণিও জগন্নাথের চতুর্ভূজ মূর্তিই দর্শন করেছিলেন পুরীতে। এসব গ্রন্থের বর্ণনাগুলিকে ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর সমস্ত আধুনিক গবেষকই প্রায় একমত যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত পুরী মন্দিরের জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার মূর্তি ছিল বর্তমানে ভুবনেশ্বরের প্রাচীন অনন্তবাসুদেবের মন্দিরে অবস্থিত প্রস্তরময়ী জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তির মতই। ঐ মন্দিরে আজও জগন্নাথ-বলরাম চতুর্ভূজ, সুভদ্রা হচ্ছেন দ্বিভূজা। তাহলে, ইতিহাসের প্রমাণ থেকেই আমরা জানতে পারছি—পুরীর মন্দিরে অবস্থি জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রাকে আজকে যেরূপে দেখছি আমরা, সেরূপে ঐ তিন মূর্তি রূপায়িত হয়েছেন চৈতন্যদেবেরও পরে। অর্থাৎ ১৫৩৩-এর পরে কোনো এক সময়ে। এদিকে 'বিষ্ণুরহস্য' গ্রন্থের অন্তর্গত পুরুষোত্তম মাহাত্ম্যেও জগন্নাথের দেহের উরু, হাঁটু, পা, পায়ের আঙুল এবং হাতের বিশদ বিবরণ রয়েছে। এখন আপনিই বলুন ডঃ বড়ুয়া—জেনারেল কানিংহাম যে বর্তমানের হস্ত-পদহীন ত্রিমূর্তি দেখেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কালির আঁচড় দিয়ে দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করলেন তার বৌদ্ধধর্ম যন্ত্রের থিওরীর কথা, সে থিওরী দাঁড়াচ্ছে কোথায়? যেরূপে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রাকে দেখে কানিংহাম বললেন, ঐ মূর্তিগুলি বুদ্ধ-সংঘ এবং ধর্ম ছাড়া আর কিছু নয়, সেরূপই তো ছিল না জগন্নাথের মাত্র পাঁচশো বছর আগেও। তাহলে এই সুপ্রাচীন জগন্নাথদেব এবং তাঁর মন্দিরকে বৌদ্ধ ধর্মমূলক বলাটা কত বড় ভুল, এখন আপনারাই বিচার করে বলুন।'

স্তব্ধ সমস্ত সভাকক্ষ, শব্দহীন। বোঝা যাচ্ছে—শ্রোতৃবর্গের সকলেই উৎকর্ণ হয়ে আছে আশ্চর্য বিদগ্ধ এই জগন্নাথের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত প্রাণ রূপৈশ্বর্যময়ী তরুণীটির মুখনিঃসৃত আরও কিছু অজানা তথ্য শোনার প্রত্যাশায়। ডঃ কাকন্দককে দেখে মনে হচ্ছে—কেমন যেন মুস্ড়ে পড়েছেন তিনি। কিন্নরীর ওপরে ভাব যেন ভর করেছে আজ। সে বলেই চলল—'কোথায় গেল আমার প্রেমের প্রভু জগবন্ধুর সেই চতুর্ভূজ? কোথায় গেল প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত তাঁর সেই ভুবন-ভোলানো রূপ? এ প্রশ্নের জবাবও খুঁজে পেয়েছেন আধুনিক কিছু গবেষক এবং ইতিবৃত্তকার।'

'কি জানা গেছে গবেষণায়? কোথা থেকে এলো জগন্নাথের এই বর্তমান রূপ?' বড়ুয়া সাহেব প্রশ্ন করেই আগ্রহাতিশয্যে ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে।

'বলছি সে কথা। তার আগে শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুজীর সেই প্রশ্নটির জবাব আমি দেব, যাতে উনি জানতে চেয়েছেন—সুভদ্রা এবং বলভদ্র ঐ রত্নবেদীতে আসন গ্রহণ করলেন কি করে এবং কেমনভাবে। আপনারা সবাই জানেন আদিবাসীরা পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই দেবতা হিসেবে পুজো করত গাছ অথবা পাথরকে। গাছ অর্থাৎ দারু। ইতিহাসে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আজকে যে বিশ্ববন্দিত দেবমূর্তি কোটি কোটি মানুষের কাছে জগন্নাথরূপে পরিচিত মূলতঃ তা ছিল আদিবাসী এক শবর গোষ্ঠীর আরাধ্য দারু-দেবতা। সেই দেবতাই নানাকালে নানা সম্প্রদায়ের হাতে পূজিত হলেন কখনো দারুব্রহ্ম, কখনো নীলমাধব, কখনো পুরুষোত্তম, আবার কখনো জগবন্ধু রূপে। প্রথমে এই দেবমূর্তি একটিই ছিল প্রাচীনতম পুরী-মন্দিরে। সেটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, অনুমান করা হয় মালবরাজ প্রথম ইন্দ্রদ্যুম্ন। তারপর, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে উৎকল-রাষ্ট্রীয় গগনে আবির্ভাব ঘটল রাজা জনমেজয়ের পুত্র যযাতিকেশরীর। প্রাচীন উৎকল-ইতিহাস বলছে, এই যযাতিকেশরীই ভগ্নদশাগ্রস্ত প্রাচীন পুরুষোত্তম মন্দিরের সংস্কারসাধন করেন এবং পুরীর সেই মন্দিরে নতুনভাবে পুরুষোত্তম ও শক্তিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করে—দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাধি লাভ করেছিলেন।' 'আর আমরা জানি, ঐ যযাতিকেশরীই বাহুবলে বৌদ্ধদের তাড়িয়ে বৌদ্ধমন্দিরকে পরিণত করেছিলেন হিন্দু ধর্মক্ষেত্রে। এটাই ঐতিহাসিক সত্য।' ভিক্ষু কাকন্দকের উক্তি। কিন্নরী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, ভিক্ষুজী, আবার আপনি ভুল করছেন। আপনি বলতে চাইছেন, জগন্নাথক্ষেত্রের প্রথম সৃষ্টিমুহূর্ত থেকে যযাতিকেশরীর আবির্ভাব পর্যন্ত আজকের এই জগন্নাথ মন্দির ছিল বৌদ্ধতীর্থ? যযাতি এসেই সেটিকে দখল করে নিলেন এবং তারই ফলে ঐ মন্দির চলে গেল হিন্দুদের হাতে? কিন্তু, এটাকে আপনি ঐতিহাসিক সত্য বলছেন কেমন করে? দশম শতাব্দীর আগেও পুরী মন্দিরে যে হিন্দু দেবতাই পূজিত হতেন, তার প্রমাণ তো ইতিহাসে আমরা পাচ্ছি অনেক জায়গাতেই, পাচ্ছি পুরাণেও। পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত বিষ্ণুপুরাণে (১/১৫/৫২) আছে সাধু কন্ডুর কাহিনী। যিনি অপ্সরাদের মোহে পড়ে কিছুকাল সম্ভোগের জীবনযাপন করার ফলে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে সাগর তীরবর্তী পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন নিজের পাপমোচনের জন্য। এই একই সাগরতটস্থ পুরুষোত্তমক্ষেত্র এবং সাধু কুণ্ডুর কথা আমরা পাই ভাগবতপুরাণেও (৪/৩০/১৩)। এ তো গেল পুরাণের কথা। ইতিহাসের চোখে দেখতে গেলে, প্রাচীন নাট্যকার মুরারী রচিত গ্রন্থ 'অনর্ঘরাঘব'-তেই প্রথম নিশ্চিতভাবে বর্ণনা পাই সমুদ্রতীরে অবস্থিত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের এবং রথযাত্রাও। এই নাট্যকার মুরারীর জীবনকাল সম্বন্ধে সব গবেষকই প্রায় একমত হয়েছেন। ঐতিহাসিকরা (A. B. Keith, Sanskrit Drama, Oxford University Press, P. 225) মুরারীকে

৯০০ খৃষ্টাব্দের সামান্য আগের বা পরের মানুষ বলে চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং, দেখতে পাচ্ছেন কাকন্দকজী, দশম শতাব্দী পর্যন্ত জগন্নাথক্ষেত্রে বুদ্ধদেব আরাধ্য দেবতা ছিলেন—আপনার সে থিওরী কোথায় ভেসে যাচ্ছে এখন।'

'কিন্তু, ঐ পুরুষোত্তমক্ষেত্র যে আজকের পুরী, তার প্রমাণ পেয়েছ কি?' কাকন্দক ভাঙবেন তবু মচকাবেন না।

'কেন পাব না। সাগরতটে অবস্থান যে পুরুষোত্তমের, যাঁর রথযাত্রায় লক্ষ লক্ষ লোকের হয় সমাবেশ, তিনি যে একমাত্র আজকের এই জগন্নাথই, সে বিষয়ে কোনো পুরাবিদের মনেই আজ আর কোনো সন্দেহ নেই K. N. Mahapatra, Jagannath Puri as a centre of culture through ages' in Orissa Historical Research Journal, Vol. 4, 1998, P. 297)। এই সঙ্গে এইখানে আর একটি জিনিসও কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে সবাইকে। কি পুরাণে, কি ইতিহাসে, কোথাও কিন্তু ঐ সময় পর্যন্ত জগন্নাথের নামটিও উচ্চারণ করা হচ্ছে না। তার মানে, আজকে যিনি জগন্নাথ, ভক্তদের হৃদয়ে তিনিই তখনো বিরাজ করেছিলেন পুরুষোত্তমরূপে, জগন্নাথরূপে নয়।

'ওসব পুরাণ, নাটকের কল্পিত কথা শুনিয়ে আমাকে বিশ্বাস করাতে পারবে না। ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যাবে না ঐ যযাতির রাজত্বের আগে পুরীর ঐ হিন্দুমন্দিরের কথা, ঐ পুরুষোত্তমের কথা।'

'আদি শঙ্করাচার্য্য পুরীতে এসেছিলেন কবে শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুজী? সেটা ছিল খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী, তাতো আপনি জানেন। ইতিহাসে পাচ্ছেন, সেই সময়ে পুরীর মন্দিরে পূজিত হতেন হিন্দুদেবতাই। তাহলে, এক্ষেত্রেও দেখছেন—যযাতির আগেও আজকের পুরীর বড়দেউল ছিল হিন্দু পূজারীদেরই হাতে। প্রমাণ আরও অনেকই আছে। কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে interesting লেগেছে মাইহারের ঐ শিলালিপিটির মধ্যেকার প্রমাণটাই। মধ্যপ্রদেশের সাতনা জেলার মাইহারে একটি সরস্বতী মন্দির ঐ শিলালিপিটায় আছে। ভারত বিখ্যাত দুই পুরাতত্ত্বজ্ঞ দীনেশচন্দ্র সরকার এবং ভি. এস. সুব্রহ্মন্যম (Ep. Indica'র XXXV খণ্ডে, ১৯৬৩-৬৪) ঐ শিলালিপিটি edit করেছেন। তাঁরা বলেছেন, পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত মাইহারের ঐ মন্দির-লিপিটি দশম শতকের মাঝামাঝি সময়ে লাগানো হয়েছিল। শিলাপিপিতে একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে—দামোদর নামে জনৈক ব্রাহ্মণপুত্রের নীলাচল-ভ্রমণের কথা। দামোদর পূর্বজন্মে ছিল স্বর্গে দেবী সরস্বতীর পুত্র। সে দেবগুরু বৃহস্পতিকে যখন পরাভূত করে এক তর্কযুদ্ধে, তখন বৃহস্পতির অভিশাপে তাকে মর্ত্যে এসে জন্ম নিতে হয়। সরস্বতীর অনেক কাকুতি-মিনতি তুচ্ছ করতে না পেরে, অবশেষে বৃহস্পতি বললেন—'তোমার পুত্রকে দীর্ঘকাল মর্ত্যে থাকতে হবে না। যৌবনের প্রথমেই সে উৎকল দেশে যাবে পুরুষোত্তম দর্শনে। সেখানে গিয়ে পুণ্যার্থী হয়ে যখন সমুদ্রে স্নান করতে যাবে, তখনই

সে জলে ডুবে মৃত্যুমুখে পতিত হবে এবং তারপরেই আবার প্রত্যাবৃত হবে স্বর্গে, মাতা সরস্বতীর সান্নিধ্যে। মর্ত্যের জীবনে তরুণ দামোদরের পিতা ছিলেন দেবধর। তিনি তাঁর পুত্রের অকালমৃত্যুতে এত শোকাতুর হয়ে পড়লেন যে, শেষপর্যন্ত পুত্রের স্মৃতিরক্ষায় তিনিই নির্মাম করালেন মাইহারের ঐ সরস্বতী মন্দিরটি। এখন আমাদের দেখতে হবে মাইহারের inscription-এ আমরা কী পাচ্ছি। আগেই বলেছি D. C. Sircar এবং V. S. Subramanyam—ঐ শিলালিপিটিকে দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের বলে বর্ণিত করেছেন Paleographical ground-এ। এই inscription সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সরকার এবং সুব্রহ্মণ্যম্ উভয়ে বলেছেন—The reference to Damodar's pillgrimage to Puri is very interesting...... It is now clear from the present record that the God (Purushottama) was enjoying the same celebrity as early as the middle of the tenth century and probably sometime earlier (P. 174) ওঁদের অনুমান অনুযায়ী দশম শতাব্দীর মাঝামাঝির কিছু পূর্বেও উৎকলের সমুদ্র তটস্থ্ পুরুষোত্তম তীর্থের অবস্থিতি নিশ্চয় ছিল। এই inscription-এর ওপর লিখতে গিয়ে আর একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আধুনিক গবেষক শ্রী জি. সি. ত্রিপাঠী তাঁর On the concept of Purushottama in the Agams প্রবন্ধে বলছেন—Well, if Purushottama was so famous in such a distant region as Maihar in the middle of tenth century that the people under took long and perilous journeys to see Him, He must have been there for quite sometime. এসব থেকেই আমরা অনায়াসে ধরে নিতে পারি যে, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগেও পুরীর পুরুষোত্তম দেবালয় হিন্দুদের হাতেই ছিল, বৌদ্ধদের হাতে নয়। তাহলে, আপনি যে বলছিলেন, ভিক্ষুজী যযাতির রাজত্বকালের পূর্ব পর্যন্ত আজকের জগন্নাথ মন্দির ছিল বৌদ্ধমন্দির এবং যযাতিকেশরী এসে বাহুবলে অধিকার করে নেন ঐ মন্দির বৌদ্ধদের বিতাড়িত করে, সেকথা কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়। কিন্তু, কথায় কথা বেড়ে যাচ্ছে, কাজের কথা শেষ করতে পারছি না কিছুতেই। আমাকে এখনও ভিক্ষুজীর সেই প্রশ্ন—বলরাম এবং সুভদ্রা কবে এবং কেমন করে আবির্ভূত হয়েছিলেন পুরীর পুরুষোত্তম মন্দিরে—তার জবাব দিতে হবে। জবাব দিতে হবে আমার পূজনীয় শিক্ষাগুরু ডঃ বড়ুয়ার সেই প্রশ্নটিরও—প্রাচীন গ্রন্থসমূহে বর্ণিত পুরুষোত্তম-জগন্নাথের চতুর্ভূজ মূর্তি কোথায় গেল এবং কোথা থেকে এলো জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার বর্তমানের হস্ত-পদ-অঙ্গুলিহীন না-পশু, না-দেবতা, না-মনুষ্য এই রূপ? যে রূপ দেখে, ভালবাবে ইতিহাসের অনুসন্ধান না চালিয়েই, তাঁর 'রায়' জারি করেছিলেন কানিংহাম—জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামকে বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ বলে। তবে ঠিক সেই সময়ের terminus post quem বলা খুবই কঠিন, যখন একটি

আদিবাসী পূজিত দারুদেবতা পরিবর্তিত হলেন জগন্নাথরূপে। কিন্তু, এই আদিবাসী-দেবতা হিন্দু দেবতায় পরিণত হওয়ার পদ্ধতিটি যে ছিল খুবই মন্থর, সে বিষয়ে আমরা প্রায় নিশ্চিত। এই পরিবর্তন এবং বিবর্তনের বিশদ বিবরণ এতই দীর্ঘ যে, এখানে, আজকের এই সভায় তার সমস্তটা বলে শেষ করা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে এইটুকু বলা যায়, যখন শৈব-ধর্ম ওড়িশার উপকূলবর্তী ভূখণ্ডে বিশেষভাবে ছিল প্রতিপত্তিশালী, তখনই এই বিবর্তন-প্রক্রিয়া গতিলাভ করেছিল এবং নরসিংহ-কাল্টের সংমিশ্রণে ক্রমেই তার পরিবর্তন ত্বরান্বিত হতে শুরু হয়েছিল। নরসিংহ কেবল শৈব-স্বীকৃত দেবতাই নন, বৈষ্ণবদেরও আরাধ্য দেবতা এবং এই নরসিংহের সঙ্গে ভৈরবও সম্বন্ধিত। কারণ, নরসিংহকেই অন্যকিছু ভক্ত 'ভৈরব-একপদ' নামে পুজো করে থাকেন কোনো কোনো অঞ্চলে।'

হঠাৎ শ্রোতৃবর্গকে হতচকিত করে দিয়ে হো হো করে উচ্চ হাস্যরোলে ঘর ভরিয়ে দিলেন ভিক্ষু কাকন্দক। হাসতে হাসতেই বললেন—'রাবিশ! যতসব গাঁজাখুরি কথা শোনাতে শুরু করেছে এই মেয়েটা এবার। বলছে, নরসিংহই নাকি ভৈরব একপদ। আবার আজকের জগন্নাথও নাকি নরসিংহ-কাল্টের দ্বারাই প্রভাবিত। কোথায় পেয়েছ এইসব উদ্ভট থিওরী?'

'কেবল আমি কেন, আপনিও পাবেন এই একই থিওরী, যদি পুরীর জগন্নাথ মূর্তির সংস্কার সাধনের সময় যে মন্ত্র উচ্চারিত হয় মন্দিরের পূজারীদের কণ্ঠে, সেটা একটু মন দিয়ে শোনেন। তখনই বুঝতে পারবেন—জগন্নাথের সঙ্গে নরসিংহের সম্পর্ক আছে কিনা। কিন্তু, সময় চলে যাচ্ছে, রাত বেড়ে যাচ্ছে, সভায় যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন, নিশ্চয়ই তাঁরাও ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছেন। আমাকে আমার বক্তব্য বলতে দিন ভিক্ষুজী। প্রথমে বলব সুভদ্রাদেবীর কথা। ঋগ্বেদেই আমরা বিষ্ণুর মাহাত্ম্যের কথা পাই। মনে হয় বিষ্ণুমতাবলম্বী আর্যরা যখন উৎকল রাজ্যে প্রবেশ করেন, তখন সেখানে অনার্য আদিবাসীদের আধিপত্য দেখতে পান। পৃথিবীর নানা স্থানেই আদিম অসভ্য জাতিরা যে কাঠ এবং পাথরে পুজো করতে অভ্যস্ত ছিল, সেকথা আগেই বলেছি। এখনও সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে এই দারু আর প্রস্তর পুজোর প্রমাণের অভাব নেই। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্র-পুত্র দুর্ধর্ষ শবর জাতির উল্লেখ আছে। উৎকল এবং দক্ষিণ কোশলে বহু পূর্বকাল থেকেই শবররা অত্যন্ত প্রবল ছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকরা নানা বিচার বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আর্যগণ উৎকলে গিয়ে প্রথমে ঐ শবরদেবকে সমুদ্রতীরবর্তী বিভিন্ন স্থানে কাঠ আর পাথরের পুজো করতেই দেখেছিলেন। ক্রমে, কোনো পরাক্রান্ত শবর বা অনার্যের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যান ঐ আর্যরা এবং পরে তাঁরাও দারু আর প্রস্তর পুজো আরম্ভ করেন। আজকের সুভদ্রাদেবী সেইরকমই একটি দারুস্তম্ভ (Post) মূর্তি স্তম্ভেশ্বরী বা খাম্বেশ্বরীর রূপান্তর মাত্র। এখনও আস্কাতে এই খাম্বেশ্বরী মূর্তি আছে।

ইতিহাস বলছে বর্তমানে আস্কায় যে হিন্দু পূজিতা শাক্তদেবী খাম্বেশ্বরী আছেন, অতীতে একদিন তিনিই ছিলেন আদিবাসীদের আরাধ্য দেবতা।'

'সুভদ্রাকে বৌদ্ধদের 'ধর্ম' নয় বলে প্রমাণ করতে গিয়ে, এসব কী প্রলাপ বকতে শুরু করেছ তুমি? সুভদ্রা হচ্ছেন শাক্তদেবী? জগন্নাথ যদি বিষ্ণু হয়, তবে সুভদ্রা শাক্ত হবে কেমন করে?'

'সুভদ্রা নাম অনেক পরে দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন ইতিহাসে আমরা বার বার দেখতে পাচ্ছি—এঁকেই বলা হয়েছে লক্ষ্মী, বলা হয়েছে কমলা। অর্থাৎ পুরুষোত্তমের শক্তি।'

'তাহলে তো আরও মজাদার কথা বলছ তুমি বিষ্ণুর শক্তি কমলা বা লক্ষ্মী হতে পারেন, তোমার ঐ শাক্তদেবী খাম্বেশ্বরী হতে যাবেন কেন? সুভদ্রা যে শাক্তদের দেবী ছিলেন একদিন—তার প্রমাণ তুমি আবিষ্কার করলে কোথায়?'

'ওঁকে যে মন্ত্রে পুজো করা হয়, সেই মন্ত্রে।' স্বাভাবিক স্বর কিন্নরীর। 'তার মানে? আমি বৌদ্ধ বলে আমাকে যা খুশি তাই বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছ তুমি?' আবার বেশ চটে উঠছেন কাকন্দক, 'আমি হিন্দু দেবদেবীর পূজা-পদ্ধতির কিছুই জানি না ভাবছ? সুভদ্রা কখনই জগন্নাথের শক্তি ছিলেন না। পুরীর মন্দিরে সুভদ্রা জগন্নাথের ভগ্নীরূপেই পুজো পেয়ে থাকেন হিন্দুদের কাছ থেকে। আর যে সুভদ্রা বিষ্ণু অর্থাৎ কৃষ্ণ অর্থাৎ জগন্নাথের ভগ্নী, তাঁর পুজো হবে শাক্তমন্ত্রে—এই কথা তুমি বিশ্বাস করতে বলছ আমাদের?'

'কিন্তু তাই যে হয় ভিক্ষুজী, আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন না জগন্নাথ মন্দিরে। সুভদ্রাদেবীর পুজো হয় ভুবনেশ্বরী মন্ত্রে। ভুবনেশ্বরী মন্ত্র হচ্ছে শাক্তমন্ত্র। মন্ত্র ছাড়াও সুভদ্রার পুজোপ্রকরণে আমরা এমন অনেক কিছুই দেখতে পাই, যা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বর্তমানে আমরা যে দেবীমূর্তিকে সুভদ্রা বলছি, সুদূর অতীতে তিনি ছিলেন শাক্তদেরই পূজিতা প্রতিমা। খাম্বেশ্বরী এবং জগন্নাথ পুরীতে এসেছিলেন একই আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে, জগন্নাথ—আগে, সুভদ্রা পরে। Heidelberg University-র আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তিন গবেষক—A. Eschmann, H. Kulke এবং G. C. Tripathi তাঁদের 'The Formation of the Jagannath Triad' প্রবন্ধে তাই লিখেছেন—Both, the figures of Khambeswarii and Jagannatha developed from the same tribal subestrat, it could be shown, these types of tribal cults must have in pre-Yayati times, been present on the sea-shore of Orissa। এই গবেষকরাই এঁদের ঐ একই প্রবন্ধতে আবার এও লিখেছেন—However, there are important reasons to believe that... if something was imported by Yayati, it was the figure of Subhadra। ইতিহাসে দুইজন যযাতিকে আমরা পাই।

যযাতি প্রথম এবং যযাতি দ্বিতীয়। প্রথম যযাতি রাজত্ব করতেন দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে, আর দ্বিতীয় যযাতি ছিলেন এগারো শতকের মাঝামাঝি সময়ের মানুষ। সবদিক থেকে বিবেচনা করে ঐতিহাসিকরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, প্রথম যযাতিই হচ্ছেন উৎকলের সেই রাজা যিনি জগন্নাথের জন্যে প্রথম রাজকীয় মন্দির নির্মাণ করান।

শোনপুর অঞ্চল থেকে মাটির নীচে লুকিয়ে রাখা জগন্নাথের দারুমূর্তি উদ্ধার করে এনে তাঁর নির্মিত মন্দিরে প্রথম নবকলেবর—উৎসবান্তে, পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং তিনিই সর্বপ্রথম শাক্তপূজিকা খাম্বেশ্বরী দেবীকে পরম শ্রদ্ধাভরে বরণ করে নিয়ে আসেন নীলাচলে পুরুষোত্তমের লীলাসঙ্গিনী শাক্তিরূপে। শুনলে হয়তো বিস্মিত হবেন সকলে যে, যযাতি জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে বংশে সে বংশের সকলেই ছিলেন কিন্তু শৈব মতানুসারী। তবে তিনি যে অঞ্চল থেকে এসেছিলেন, সে অঞ্চল ছিল বিষ্ণু-ভক্তদের প্রভাবে প্রভাবিত অনেক আগে থেকেই, তাই গবেষক এবং ইতিবৃত্তকারদের অভিমত যে, এই প্রথম যযাতিকেশরীই বৈষ্ণব-ভাবের প্লাবনকে পৌঁছে দিয়েছিলেন উৎকলের সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত।'

'তা, বংশ যাঁর শৈব, ভাবে যিনি বৈষ্ণব, তিনি হঠাৎ শাক্তদেবীকে নিয়ে এসে পুরুষোত্তমের পাশে বসালেন কেন?' প্রশ্ন করলেন ডঃ বড়ুয়া। 'শৈব ছিলেন বলেই তো শাক্তদেবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন যযাতিকেশরী। শিবের শক্তিই তো দুর্গা, কালী। খাম্বেশ্বরী বা স্তম্ভেশ্বরী আদিবাসীদের দারুস্তম্ভ দেবতারূপে প্রথমে পূজিত হলেও—পরবর্তীকালে হিন্দুরা সেই কাষ্ঠনির্মিত প্রতিমাকেই কোথাও দুর্গা, কোথাও বা কালীমন্ত্রে পুজো করতে লাগলেন। এখনও যে পুরীমন্দিরে সুভদ্রাদেবীর পুজো হয়ে থাকে ভুবনেশ্বরী মন্ত্রে, তারও মূলে রয়েছে এই একটিমাত্র কারণই। তাছাড়া, আরও কিছু লক্ষ্য করার আছে—এই অকস্মাৎ শক্তিরূপী মাতৃমূর্তিকে পুরীমন্দিরের রত্নবেদীতে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে। আমরা ওড়িশার রত্নগিরি এবং ললিতাগিরিতে যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক বৌদ্ধ নিদর্শন পেয়েছি, তা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, খৃষ্টীয় সপ্তম থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত সমস্ত উৎকলই ছিল সেই বজ্রযানতন্ত্রের দুর্দান্তপ্রতাপ এবং বিপুল প্রভাব যে তন্ত্রে নারীপ্রতিমা বা শক্তিপুজো ছিল একটি প্রধান অঙ্গ। আর, যযাতিকেশরী সুভদ্রাকে এনে প্রতিষ্ঠিত করলেন দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে। সুতরাং, ঐতিহাসিকরা মনে করেন, যযাতি হয় তো ঐ বজ্রযান স্কুল-এর দ্বারাও কিছুটা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। গুপ্তযুগের শেষের দিক থেকেই হিন্দু এবং বৌদ্ধ সমস্ত পুরুষ দেবতারই সঙ্গে একটি করে শক্তিপ্রতিমা যুক্ত করার একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছিল ভারতের প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই' কিছুক্ষণের জন্য নীরব হল কিন্নরী। আর, জয়ন্ত লক্ষ্য করল, ঠিক এই সময়েই মুকুন্দলাল অগ্রবাল আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়াল হল-এ ঢোকার দরজার কাছে। একটি গরিলার মত দেখতে যুবকের কাঁধে হাত রেখে তার কানে কানে কী যেন সব বলল। কোনো আদেশ বোধ হয়। পরমুহূর্তে গরিলাটা দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর

থেকে। মুকুন্দ আবার ধীর পদক্ষেপে ফিরে গেল পূর্বে যেখানে দাঁড়িয়েছিল জানলার ধারে, সেখানে। জয়ন্তের হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটু আগে পদ্মের বলা সেই কথাটা—'আজ আর কিন্নরীর রক্ষা নেই স্যার।'

'স্মরণাতীত কাল থেকেই মাতৃপূজা যে প্রচলিত ছিল ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে, তার প্রমাণ আমরা পাই প্রাচীন ইতিহাসে বহুভাবেই।' কিন্নরী পুনশ্চ বলতে শুরু করল, 'প্রথমে শৈবরা এবং পরে ভগবত বা বৈষ্ণবরাও সচেষ্ট হন সেই দেবীশক্তিকে নিজেদের তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করতে। শৈবরা বসালেন রুদ্রশিবের পাশে অম্বিকাকে তাঁর ভগ্নী হিসেবে শুক্লযজুর্ব্বেদে (Vaj. Samhita–III, 27)। ঐ সংহিতাতেই আবার ঐ অম্বিকা (মা)-কেই উল্লেখ করা হয়েছে অম্বা, অম্বালিকা (এ দুটির অর্থও মা) এবং সুভদিকা নামে। কোনো উপনিষদে দেখতে পাচ্ছি উমা-হৈমবতীকে, যার অর্থ হচ্ছে হিমালয়-কন্যা। পরবর্তী সময়ে এই উমা এবং অম্বিকাকেই আবার দেখা যাচ্ছে শিবপত্নীরূপে। শৈবদের পরে বৈষ্ণবরাও উদ্যোগী হলেন আদিবাসীদের মাতৃশক্তিকে টেনে আনতে ভগবান বিষ্ণুর পাশে। খৃষ্টাব্দ শুরুর পরবর্তী শতকগুলিতে এইরকম প্রয়াস প্রচেষ্টার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের চোখে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রচিত বলে অনুসিত 'হরিবংশে' যশোদার সেই কন্যাটির কাহিনী আমরা দেখতে পাই, যে কন্যাকে রেখে আসা হয়েছিল কৃষ্ণের পরিবর্তে, কংসের কারাগারে। এই কন্যাটিকে বর্ণনা করা হয়েছে বিষ্ণুর পত্নী নিদ্রারূপে ('হরিবংশ', অধ্যায়-৪৭, ২৪, ২৫, ৫৪, বিষ্ণুপুরাণ প্রথম খণ্ড, ৭০, ৭১, ৭২, তৃতীয় খণ্ড-২০)। বিষ্ণু ধরাধামে কৃষ্ণাবতাররূপে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বক্ষণের তাঁর শক্তি 'নিদ্রাকে' বলেছিলেন—তুমি যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করার পরে যখন কংসের কারাগারে স্থানান্তরিত হবে, তখন কংস তোমাকে পাথরে আছাড় মেরেও হত্যা করতে পারবে না। তুমি উর্ধাকাশে চতুর্ভুজা দেবীমূর্তিরূপে দৃষ্টা হবে। সেইরূপ নিয়েই কংসকে ভর্ৎসনা করবে তুমি। স্বর্গে প্রত্যাবৃত হওয়ার পরেই আবার মর্ত্যে অবতরণ করে, তুমি নিজেকে বহুরূপে এবং বহু প্রতীকে (বিরূপ) বিভক্ত করে ছড়িয়ে দেবে সারা পৃথ্বীতে। তখন পর্বতচূড়ার বাসিন্দারা তোমার পুজো করবে দ্বীপে, পর্বতগুহায়, গভীর অরণ্যে, তোমার আরাধনা করবে শবররা, বর্বররা, পুলিন্দের দল। মানুষরা তখন তোমায় ডাকবে বিন্ধ্যাবাসিনী বলে [Hari Vaunsa–11/2/40–42, II [Anyastava 3/3–8]। মার্কেণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যকে (যেটা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দে রচিত বলে মনে করা হয়) শাক্তরা আজ অবধি তাঁদের অবশ্য পাঠ্যগ্রন্থ বলে ভেবে থাকেন। এর প্রভাব মাতৃপূজারী শাক্তদের ওপরে অপরিসীম। এই দেবীমাহাত্ম্যের শাক্তদেবীকে পাই আমরা বিষ্ণুর পত্নী নিদ্রারূপেই (১/৭০)। এ-গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে বার বার দেবী দুর্গাকে সম্বোধন করা হয়েছে নারায়ণী বলে (১১/৮-২৩)। নারায়ণী অর্থাৎ নারায়ণের স্ত্রী। সুতরাং, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে যযাতিকেশরী যে পুরুষোত্তম-বিষ্ণুর পাশে তাঁর শক্তি হিসাবে শাক্তপূজিত দেবী

খাম্বেশ্বরীকে এনে বসালেন, এতে বিস্ময়ের বিশেষ কিছু নেই। আর সেই শাক্ত মাতৃমূর্তিকে পুরুষোত্তমের শক্তি করা হল বলেই, সে মূর্তির নাম প্রথমে দেওয়া হয়েছিল—লক্ষ্মী বা কমলা, যার বর্ণনা পাই আমরা পুরীর মন্দির নিয়ে লেখা অনেক প্রাচীন গ্রন্থেই।'

আবার ক্রোধ প্রকাশ করলেন কাকন্দক—'খুব তো জগন্নাথকে পুরুষোত্তম-পুরুষোত্তম বলে চালিয়ে, নিজের গাঁজাখুরী সব থিওরী প্রমাণ করার চেষ্টা করে চলেছ গোঁজামিল দিয়ে। তবে, দুনিয়াশুদ্ধু লোক যে জগন্নাথ-জগন্নাথ করে পুরী মন্দিরের মুখ্য দেবতাকে, সে নামটা কি আকাশ থেকে পড়ল?'

একটু হাসির চমক দেখা দিল কিন্নরীর ওষ্ঠাগ্রে। সে বলল, 'আমার সমস্ত কথাকে গাঁজাখুরি বলে উড়িরে দিতে পারেন আপনি ভিক্ষুজী, কারণ সে অধিকার আপনার আছে, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ। কিন্তু, আপনার পাশেই বসে আছেন বৌদ্ধ ইতিহাসের দিকপাল ডঃ বড়ুয়া, তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমি যা কিছু বলেছি এবং বলছি, কোনটাই ইতিহাসের বাইরের কথা নয়। মন্দিরের প্রাচীন ইতিহাসে যে দেবতাকে আমরা পুরষোত্তর রূপে বর্ণিত হতে দেখেছি সর্ব্বত্র, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর কিছু আগে অথবা পরে লিখিত স্কন্দপুরাণীয় পুরুষোত্তম মাহাত্ম্যে—সেই দেবতাকেই 'জগন্নাথ' নামে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে (১৯০৯-এ বোম্বাই-এর ভেঙ্কটেশ্বর প্রেস থেকে প্রকাশিত 'পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য'—১/২৪, ৩/২৬, ৪/৫৫, ৪/১০২, ৫/৪৭, ৬/৭৩, ৭/৩০, ৮/১৮, ৮/৩৯, ৮/৫৪, ৮/৬৯, ১০/৯৬, ১০/১৬০ এবং আরও বহু শ্লোকে)। জগন্নাথ নামটিকে যে তেরোশা খৃষ্টাব্দের কিছু আগে-পরেই পুরী নন্দিরের পুরুষোত্তমের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রমেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল, সে বিষয়ে সব গবেষকই প্রায় নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাঁরা আজও নিশ্চিত হতে পারেন নি একটি বিষয়ে। সেটা হল, পুরুষোত্তমের এই জগন্নাথ নামটি প্রথম রেখেছিলেন কাঁরা? বৌদ্ধ, শৈব অথবা বৈষ্ণবরা। কারণ, কিছু বৌদ্ধ গ্রন্থে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভগবান বুদ্ধকে বলা হয়েছে জগন্নাথ। শৈবশাস্ত্রে শিব বর্ণিত হয়েছেন জগন্নাথরূপে কোন কোন স্থানে, আবার বৈষ্ণব শাস্ত্রও বিষ্ণুকে বলছেন জগন্নাথ।'

'কোনো শাস্ত্রের কোনো কথাতেই কান দেবার দরকার নেই। জেনে রাখো আসল কথাটা। জগন্নাথ নাম আমরা বৌদ্ধরাই দিয়েছি, কারণ, পুরীর জগন্নাথ ভগবান বুদ্ধ ছাড়া অন্য কেউ নন।'

কিন্নরীর এত যুক্তি, এত তর্ক শোনার পরেও কাকন্দকের মুখ থেকে তাঁর এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হতে শুনে, শ্রোতৃবর্গ চাপা হাসির গুঞ্জন তুলল চারিধারে। ফলে, ভিক্ষু কাকন্দকের রক্তিম হয়ে উঠল সমস্ত মুখমণ্ডল। উচ্চতর গ্রামে কণ্ঠ তুলে তিনি জিজ্ঞেসা করলেন—'বলরাম হচ্ছেন বৌদ্ধ সঙ্ঘের প্রতীক, এটা আমরা সবাই জানি। সেই বলরামের কথা কিন্তু এড়িয়ে যাচ্ছ তুমি। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে—বলরামের ব্যাপারে গোঁজামিল দেবার মত আজগুবি সংগ্রহ টুকুও তোমার নেই।'

'হ্যাঁ। এবারে বলবো বলরামের আবির্ভাব কবে ঘটেছিল পুরীর মন্দিরে, তার কথা। তবে বলবো তা অত্যন্ত সংক্ষেপে। কারণ এর পরে আমায় জবাব দিতে হবে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু অনিলকান্তি বাবুর প্রশ্নের। প্রাচীন শাস্ত্রে বর্ণিত চতুর্ভূজ জগন্নাথ-বলরাম এবং দ্বিভূজা সুভদ্রার আজকের এই হস্তপদ অঙ্গুলিহীন রূপ এলো কোথা থেকে। এদিকে রাত বেড়ে যাচ্ছে হু হু করে, আকাশে শোনা যাচ্ছে বজ্র-মেঘের গুরু গুরু রব। সুতরাং বলরামের কথাই আরম্ভ করা বোধহয় ভাল এখন।'

এই সময়, হঠাৎ, ডঃ বড়ুয়া অত্যন্ত আগ্রহান্বিত স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'বলরাম সম্পর্কে তুমি বলবে, সেটা শোনার জন্যে হলভর্তি মানুষ বিশেষ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন, আমি জানি। সেটা তো তোমাকে বলতেই হবে। কিন্তু তার আগে, আমার একটি ছোট্ট প্রশ্নের কি তুমি উত্তর দেবে? জগন্নাথের পুজার মন্ত্রে কি শাক্ত মন্ত্রের কোনো প্রভাব দেখতে পেয়েছো?'

'পেয়েছি, স্যার!' বিনয়নম্র কণ্ঠে উত্তর দিল কার্লেকার—'জগন্নাথের পুজোর সময় যে দশ-Syllabic এবং আঠারো সিলেবিক গোপালমন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাতে জগন্নাথকে দুর্গা বলা হয়ে থাকে। দুর্গা অধিষ্ঠাত্রী দেবী' এই কথাটি উচ্চারিত হয় জগন্নাথের সব পূজাপদ্ধতিতে। এর সঙ্গে আরও একটি intersting ব্যাপারও জানিয়ে রাখি, স্যার। আপনি কি 'গৌতমীয় কল্প' গ্রন্থের নাম শুনেছেন?'

ঘাড় নেড়ে অধ্যাপক বড়ুয়া জানালেন—'না, তিনি শোনেননি।'

'এই 'গৌতমীয় কল্প' মনে হয় ১৫০০ খৃষ্টাব্দেও বেশ জনপ্রিয় ছিল। কারণ, আমরা দেখতে পাচ্ছি—গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিতে 'গৌতমীয় কল্প' থেকে অনেক জায়গাতেই উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। গৌতমীয় কল্প বলছে—যিনি কৃষ্ণ, তিনিই দুর্গা। যিনি দুর্গা, তিনিই কৃষ্ণ। এ দুই-এ কোনো পার্থক্য নেই। যে এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য-জ্ঞান করবে, তার মোক্ষলাভ হবে না কখনো (The Commentary of Sri Jiva Goswami on Sri Brahima Samhita [Gaudiya Madras/ Ch. V. Sl-3)। আবার শ্রীচৈন্যদেব ত্রিবাঙ্কুর থেকে পঞ্চরাত্র-দর্শনের যে ব্রহ্মসংহিতাটি আবিষ্কার করে পুরীতে এনে ১৫১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর অনুসারী ভক্তবৃন্দকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ঐ গ্রন্থটি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করতে (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৯/২১৮-২৪), তাতে দ্ব্যর্থহীনভাবে দুর্গাকে বর্ণনা করা হয়েছে গোপাল কৃষ্ণের শক্তিরূপে। অতএব, পুরীর মন্দিরে বিষ্ণু-জগন্নাথের পাশে যযাতিকেশরী যে স্তম্ভেশ্বরী অথবা খাম্বেশ্বরী শাক্তমূর্তিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—সেটা কিছুই অস্বাভাবিক কাজ নয়। চোড়গঙ্গা যখন ১১৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমানের এই সুবিশাল জগন্নাথ মন্দিরের নির্মাণকার্য শুরু করেছিলেন, তখন তিনি মন্দিরের একঘোড়া মূর্তিই, অর্থাৎ কৃষ্ণ-জগন্নাথ এবং লক্ষ্মী-কমলারই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার প্রমাণ আমরা নানাভাবেই পাই। এখন,

ভিক্ষুজী জানতে চেয়েছেন—বলরাম প্রবেশ করলেন পুরীর বড় দেউলে—কবে এবং কেমনভাবে। আমরা পঞ্চরাত্র দর্শনের 'ব্যূহ' থিওরীতে দেখতে পাচ্ছি—বাসুদেবকে বলা হয়েছে সর্বশক্তিমান ভগবান। বলা হয়েছে এই বাসুদেবই তিনটি পৃথক পৃথক রূপের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন। সেই তিনটি রূপ হচ্ছে সংকর্ষণ, প্রত্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ। সংকর্ষণের মধ্যে জ্ঞান ও বলের প্রকাশ, প্রদ্যুম্নের মধ্যে ঐশ্বর্যের এবং বীর্যের আর অনিরুদ্ধের মধ্যে—শক্তির এবং তেজের। এই সংকর্ষণের কাজ হচ্ছে সৃষ্টিকে ধ্বংস করা। সংকর্ষণ নিজের অপ্রতিরোধ্য 'বল্'-এর (বলরাম, বলভদ্র) সাহায্যে সমস্ত সৃষ্টিকে ছিনিয়ে নেন (সম + কর্ষ। সংহার শব্দের অর্থও ধ্বংস করা, নাশ করা), নাশ করেন—বলেছে বিশ্বকসেনাসংহিতা (F. O. Schrader, Introduction to the Panchahatra and the Ahirbudhuya Samhita, Madras–1961) এবং সনৎকুমার সংহিতা। শিব হচ্ছেন প্রলয় বা ধ্বংসের দেবতা। তাই শিবের আর এক নাম সংকর্ষণ। এবং বলরাম ও বলভদ্রকেও বলা হয় সংকর্ষণ। সুতরাং পুরীর মন্দিরের ঐ বলভদ্র বা বলরাম যে শিবেরই আর এক রূপ, সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত। ব্রহ্মপুরাণ এক জায়গায় ঘোষণা করছে (23/132) যে, শিবরুদ্রকে 'হলায়ূধ' বলেও ডাকা হয় নানা সময়ে। বলরামের অন্য একটি নাম হলধর বা হলায়ূধ—একথা তো সকলেরই জানা। ওদিকে বিষ্ণুপুরাণও বলছে (11–5/19) সংকর্ষণ-রুদ্র বের হয়ে আসেন বলরামের মুখগহ্বর থেকে প্রতি কল্পান্তে—সৃষ্টিকে ধ্বংস করার জন্যে। কিন্তু কেন হঠাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দে বলভদ্ররূপী শিবকে এনে বসানো হল পুরীর মন্দিরের মণিকোঠরে রত্নবেদীতে মূলতঃ শাক্তদেবী ঐ সুভদ্রার পাশে? এই প্রশ্নের উত্তর চমৎকারভাবে দিয়েছেন—ভারত-জার্মানী মিলিত উদ্যোগের গবেষকবর্গ। The relationship between Krishna and Durga. Durga as the Sakti (Nidra, Yoganidra, Yogamaya) of Visnu/Krishna......... was clear to the reformer (or the reformers) who introduced the image of Balabhadra in the temple in the 13th century in order to suppress (or to sublimate) the erotic element between the male and the female deity of the Purushottam Temple. They introduced Balabhadra adaitionally into the sanctum inorder to (a) change the character and the concept of the two deities from husband and wife to brother and sister, (b) to introduce indirectly a new deity whose worship was very popular and widespread in Orissa, namely Shiva who is identified with Samkarsana/Balarama in the Vaishnava Agamas, and finally, (c) to re-interpret to re-assert and emphasize the original character of the female deity who had been Stambheswari/Durga but was being worshipped at this time as Lakshmi. This introduced Durga in the Jagannatha

Temple and satisfied Her millions of followers in Orissa (A. Eschmann, H. Kulke and G. C. Tripathi's—The Formation of the Jagannath Triad).

জনপূর্ণ সভাগৃহ নিঃশব্দ নিঃস্পন্দ। রাত ৯টা উত্তীর্ণ। তবু কৌতূহলের যেন আর শেষ নেই শ্রোতৃবর্গের। তিলকচর্চিতা, রক্তিম গৌরবর্ণা, ঢলো ঢলো আঁখি—মেয়েটির মুখ থেকে তাঁরা আরও অনেক কিছু জানতে চান জগন্নাথ সম্বন্ধে শুনতে চান আরও অনেকক্ষণ।

ডঃ বড়ুয়াই প্রথম ভঙ্গ করলেন নিস্তব্ধতা। বললেন—'তোমার জগন্নাথ অনুসন্ধান যে কত গভীর, তা জানতে পেরে আজ আমি একইসঙ্গে বিস্ময় ও গর্ব অনুভব করছি। বিস্ময়বোধ করছি, তোমাকে তোমার এই দুরূহ গবেষণায় যে গাইড করছে তুমি বলছ, সেই যুবক অনিন্দ্য আপ্পারাও-এর মেধা এবং অতুলনীয় অনুসন্ধিৎসার কথা ভেবে। আর গর্ব অনুভব করার কারণ—তোমাকে, কিছুদিনের জন্যে হলেও, ছাত্রীরূপে পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল তো।'

সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল এবার কার্লেকারের চোখে-মুখে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে বলে উঠল—'আপনি যে দয়া করে আমায় কিছুদিন আপনার মত জ্ঞানতপস্বীর চরণপ্রান্তে বসে পালি শিখবার সুযোগ দিয়েছিলেন, তারজন্যে আমারও গর্বের সীমা নেই, স্যার। তাহলে, আজ এই সভায় জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম সম্বন্ধে এতক্ষণ আমি বিভিন্ন গবেষকের গবেষণালব্ধ যে সিদ্ধান্তগুলি নিবেদন করলাম, তাদের সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে এই—

(১) আদিবাসীদের আরাধ্য দারুদেবতা আর্যদের সংস্পর্শে এসে প্রথমে হলেন দারুব্রহ্ম, নারদপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণ থেকে এ সত্যের রূপক আভাস পাওয়া যায়। পরে, খৃষ্টীয় অষ্টম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত এই দারুব্রহ্মই সর্বস্তরের ভক্তসাধারণের হৃদয়ে পূজিত হতে লাগলেন দেবাদিদেব পুরুষোত্তমরূপে। এই পুরুষোত্তম ছিলেন বজ্রযানিক এবং তান্ত্রিক ধ্যানধারণায় বিষ্ণুর মূর্ত প্রতীক। বিষ্ণু আর কামদেবের মিলিত বিগ্রহ। এই কারণেই মনে হয়, জগন্নাথের পূজাতে কামবীজ 'ক্লীম্' রয়ে গেছে আজও।

(২) এই পুরুষোত্তমের মধ্যে বিষ্ণুর প্রেম ও রতির সবকটি গুণই বিধৃত। এর ফলেই বিষ্ণুর সঙ্গে সঙ্গে প্রেমকলায় অনন্য বলে পরিচিত কৃষ্ণ নামেও অভিহিত করা শুরু হল পুরুষোত্তমকে। পুরী মন্দিরে কৃষ্ণের প্রবেশ ঘটে, অবশ্য, প্রথমে বিষ্ণুর এক অবতারমাত্র রূপেই (সারদাতিলকা-বর্ণিত স্থিতি লক্ষ্যণীয়)।

(৩) কিন্তু, সমগ্র পুর্ব ভারত কৃষ্ণ-সংস্কৃতি এবং কৃষ্ণ পূজার প্লাবনে যখন উত্তাল হয়ে উঠল পরবর্তীকালে দক্ষিণ ভারতীয় বিষ্ণু-আরাধনার সংমিশ্রণে, তখনই পুরুষোত্তম নামের লোকপ্রিয়তার ভিত্তিতে ফাটল দেখা দিল। পুরুষোত্তমকে ক্রমেই কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু বলতে রাজী হতে দেখা গেল না কাউকেই। কৃষ্ণের রতিলীলার সবকিছুই

ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল পশ্চাৎপটের পেছনে, সামনে উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠল অসিতবীর্য, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, সর্ববিশ্বত্রাতা এক অদ্বিতীয় দেবতার শ্রীকৃষ্ণ রূপ। পুজো শুরু হয়ে গেল সেই কৃষ্ণেরই।

(৪) যে পুরুষোত্তম হলেন কৃষ্ণ, ক্রমে সেই কৃষ্ণই আবার আশ্চর্য এক জনপ্রিয় নামে আখ্যায়িত হতে লাগলেন। সে নাম—জগন্নাথ। পুরাণে, সাহিত্যে, কাব্যে ধীরে ধীরে উধাও হল পুরুষোত্তম নাম। পরিবর্তে, জগন্নাথ নামের ঘটল আবির্ভাব ঝঞ্ঝার বেগে আসসমুদ্র হিমাচল জুড়ে। সারা দেশের জন-জনার্দ্দন আজ পুরী মন্দিরের মুখ্য উপাস্যকে একমাত্র জগন্নাথ নামেই জানেন ও মানেন।

(৫) একটিমাত্র আরাধ্য দেবতা বিরাজমান ছিলেন যে নীলাদ্রি মন্দিরে, সেই মন্দিরেই একদিন আবির্ভূতা হলেন শাক্তদেবী স্তম্ভেশ্বরী পশ্চিমাঞ্চল থেকে, বিষ্ণু বা কৃষ্ণের নীলাসহচরী লক্ষ্মী বা কমলারূপে, যাঁকে প্রতিষ্ঠা করেন রাজা যযাতিকেশরী, এবং যিনি অভিহিত হতে থাকেন পরবর্তীকালে সুভদ্রা নামে।

(৬) বিষ্ণু পুজোর প্রথম ঢেউ এসেছিল উৎকলে বিষ্ণুভক্ত মালবরাজ প্রথম ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। দ্বিতীয় তরঙ্গ বহন করে এনেছিলেন শৈব বংশজাত যযাতিকেশরী স্বয়ং আর তৃতীয় লহরী দেখা দিয়েছিল উৎকলের মাটিতে প্রায় একই সঙ্গে দুই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পদার্পণে। এঁদের একজন ছিলেন অসমসাহসী রণনিপুণ শাসক অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গা (১০৫৭-১১৪৭), অপরজন দেশবরেণ্য ধর্মসংস্কারক আচার্য রামানুজ (১০৫৬-১১৩৭)। তৃতীয় বৈষ্ণবতরঙ্গভঙ্গের এই দুই ভগীরথ উৎকলের জগন্নাথ সংস্কৃতিরও মুখ্য রূপকাররূপে ইতিহাসে চিত্রিত। বিশেষ করে মহারাজা অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গাদেব। ইনিই যখন আজকের এই আকাশছোঁয়া জগন্নাথের মন্দির নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেন, তখনও পুরীর মন্দিরের রত্নবেদীতে কেবলমাত্র একটি পুরুষ ও একটি নারীদেবতার জন্যেই আসন সংস্থাপন করেছিলেন, তিন দেবতার জন্যে নয়। তৃতীয় দেবতা, অর্থাৎ সংকর্ষণ বলারামের আবির্ভাব ঘটল—অনেক পরে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।'

ডঃ বড়ুয়া বললেন—'অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে আসছে ক্রমে পুরীর জগন্নাথের ইতিহাস আমার কাছে। এইবার তুমি বলো, কোথা থেকে এলো বর্তমান জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার এমন অদ্ভুত মূর্তি? এ মূর্তিগুলির সঙ্গে কোনো দেবতা, মানুষ বা পশুর চেহারার কোনো মিল নেই কেন?'

'বলব, স্যার, এবার অবশ্যই।' কিন্নরী আবার শুরু করল, 'আগেই আমি বলেছি, স্যার, নারদপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, উৎকলখণ্ড, কপিলসংহিতা পড়লে যে কোনো গবেষকের এই ধারণা জন্মাবেই যে, পুরীর মন্দিরে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা মূর্তি একদা, ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসুদেব মন্দিরে যেমন জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার প্রস্তরময়ী প্রতিমা আজও বিদ্যমান,

ঠিক তেমনটিই ছিল। পার্থক্য শুধু এইটুকুই যে পুরীর শ্রীমূর্তি তিনটি ছিল দারুনির্মিত এবং অনন্তবাসুদেব মন্দিরের প্রতিমাত্রয়—প্রস্তরময়ী। অনন্তবাসুদেব মন্দিরের জগন্নাথ-বলরাম মূর্তি আজও চতুর্ভূজ, সুভদ্রা—আমরা নারদপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণে যেমন জগন্নাথের চতুর্ভূজের বর্ণনা পাচ্ছি, তেমনি পাচ্ছি চতুর্দশ শতকে রচিত উৎকলখণ্ডেও। শ্রীচৈতন্যের জীবনচরিত প্রণেতাগণও লিখে গেছেন যে, চৈতন্যদেব যখন নীলাচলে যান, তখনও জগন্নাথ-বলরামের চতুর্ভূজ মূর্তিই দর্শন করেছিলেন তিনি বড়দেউলে। এমনকি শ্রীচৈতন্যের পরে রচিত কপিলসংহিতাতেও আমরা জগন্নাথ-বলরামের চতুর্ভূজ মূর্তিরই বর্ণনা পাচ্ছি সুন্দরভাবে। চৈতন্য তিরোভাব ঘটেছিল ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং, এখন আমরা এই সিদ্ধান্তে অনায়াসেই পৌঁছতে পারি বিনা দ্বিধায় যে, পুরীর মন্দিরে জগন্নাথ-বলরামের চতুর্ভূজ সম্পন্ন দুই অনুমূর্তির অবস্থান ছিল খৃষ্টীয় ১৫৩৩ অথবা তার কিছু পরে পর্যন্ত। তারপর, হঠাৎ এক ঐতিহাসিক নগ্ন এবং বীভৎস ঘটনার ঘূর্ণাবর্তে পড়েছিল নীলাদ্রিনাথের ঐ নীলাচল-মন্দির, যারই ফলে—মূর্তিগুলির ঘটেছিল অস্বাভাবিক বিকৃতি।'

'সে আবার কোন্ ঘটনা? এমন বীভৎস ঘটনা—যার ফলে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার মূর্তিরই বিকৃতি ঘটে গেল একেবারে? ইতিহাসে এমন ঘটনার কথা আমরা কোথাও পাইনি।' কাকন্দক বেশ বিদ্রূপের সুরেই বললেন। 'পাননি, তার কারণ—জগন্নাথদেবের পশ্চাৎপটে যে দীর্ঘ ইতিকথা পবিত্র হিমালয়ের বুকে জমে থাকা বরফের মতই জমাট বেঁধে আছে, সে-ইতিকথার বরফ গলিয়ে সত্যকে বোঝার চেষ্টা করেননি আপনি গবেষকের মমত্ব নিয়ে, ডঃ কাকন্দক। তাই আপনি জানেন না—পুরীর বিশ্ববিশ্রুত মন্দিরের ঐ জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রামূর্তিকে চুরমার করবার জন্যে কতবার চেষ্টা হয়েছিল অতীতে।'

'কে আবার কবে জগন্নাথকে চুরমার করতে চেয়েছে। এমন একটা থিওরী তোমার উদ্ভট ভাণ্ডারে হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু ইতিহাসে এমন ঘটনার উল্লেখ কোথাও নেই। এসব তোমার ফ্যাব্রিকেটেড এবং মোটিভেটেড কথা। জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা যে বৌদ্ধদের বুদ্ধ-সংঘ আর ধর্ম—এ-সত্যকে শ্রোতৃবর্গের সামনে নাকচ করার চেষ্টাতেই ইতিহাসের নাম করে এমন বিকৃত তথ্য পরিবেশনের চেষ্টা তোমার।' যেখানে মুকুন্দলাল অগ্রবাল দাঁড়িয়েছিল, তারই ঠিক পাশের জানলার বাইরে থেকে সমস্বরে সমর্থন শোনা গেল—'হিয়ার, হিয়ার। কার্লেকারকে বসিয়ে দেওয়া হোক।'

যেদিক থেকে চিৎকার ভেসে আসছিল, সেদিকে একবার কেবল তাকাল কার্লেকার, তারপরেই আবার শুরু করল—'একবার উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র দেব যখন দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে লিপ্ত, তখন বাংলার মুসলমান সুবাদার সসৈন্যে উৎকল আক্রমণ করেন। মুসলমান সৈন্যরা সেবার শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত তাদের নিষ্ঠুর লুঠতরাজ চালিয়েছিল সেই সময়ে, জগন্নাথ দেবের সেবকবৃন্দ দারুব্রহ্ম মূর্তি গুপ্তভাবে চিল্কাহ্রদে নিয়ে গিয়ে এক গিরি-

গহ্বরে লুকিয়ে রেখেছিলেন। পরে, প্রতাপরুদ্র যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেই, মুসলমান আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করে, তাড়াতাড়ি সেই দেবমূর্তিগুলি উদ্ধার করে আনেন এবং পুরীর মন্দিরে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর, রাজা মুকুন্দদেব যখন উৎকলের সিংহাসনে, তখন ঘটল দেবদ্বেষী কালাপাহাড়ের আবির্ভাব এই উৎকল ক্ষেত্রে। বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ঝটিকাবেগে অত্যাচারী কালাপাহাড় এসে হাজির হলেন যাজপুরে। সেখানে বীর উৎকল সেনারা প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন তাঁকে। তুমুল যুদ্ধ হল যাজপুর রণাঙ্গণে। এই যুদ্ধেই মৃত্যুবরণ করলেন উৎকলাধিপতি মুকুন্দদেব। তাঁর মৃত্যুর ভয়াবহ সংবাদ পুরীতে পৌঁছতেই জগন্নাথের সেবকগণ এবারও দারুমূর্তিগুলি গোপনে নিয়ে গিয়ে ঐ চিল্কাহ্রদের নিকটেই পারিকুদে এক গর্তের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন। রণঢংকা নিনাদে দিকবিদিক প্রকম্পিত করতে করতে দুর্ধর্ষ যুদ্ধবাজ কালাপাহাড় গিয়ে ঢুকলেন জগন্নাথ মন্দিরে সদলবলে। লক্ষ্য তাঁদের যুগ যুগ পূজিত জগন্নাথের পরম পবিত্র দারুমূর্তি। কিন্তু দেখলেন—রত্নবেদী শূন্য। সেখানে কোনো মূর্তির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। তখন ক্ষিপ্তপ্রায় কালাপাহাড় হিংস্রকণ্ঠে হুকুম দিলেন তাঁর অনুচরদের—যেখান থেকে হোক যেমন করে হোক জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা মূর্তি খুঁজে বের করতে......' এই পর্যন্ত বলা হয়েছে কার্লেকারের, বাইরে ভয়ঙ্কর চিৎকার শুরু হয়ে গেল—'সব মিথ্যে কথা, সব মিথ্যে কথা। জগন্নাথকে মুসলমান আক্রমণকারীদের ভয়ে কখনো সরানো হয়নি। জগন্নাথকে স্পর্শ করার শক্তি কোনো যবনের থাকতে পারে না। জগন্নাথ চিরদিন পুরীর মন্দিরের মণিকোঠাতেই ছিলেন। কার্লেকার জগন্নাথের অসম্মান করছে। আমাদের ধর্মকে অপমান করছে।'

অনিলকান্তি তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'আপনারা চুপ করুন। কিন্নরী কার্লেকারকে তার কথা শেষ করতে দিন। ও তো ইতিহাসের কথাই শোনাচ্ছে আপনাদের—'

কিন্নরী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—'শুধু কি কালাপাহড়ের ভয়ে জগন্নাথকে সরানো হয়েছিল, স্যার? কালাপাহাড় আক্রমণ করেছিলেন ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে ১৫৭৮-এ সাহেনশা আকবরের আদেশে প্রথমে মুনিম খাঁ এবং তারপরে খাঁ জাহান সসৈন্য উৎকলে গিয়ে পাঠানদের যখন সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত এবং পরাভূত করল, তখনকার সেই বিধ্বংসী যুদ্ধের সময়েও জগন্নাথদেবের মূর্তিকে দুই-তিনবার স্থানান্তরিত করেই রক্ষা করা হয়েছিল। আবার এ ঘটনার বহু পরে ঔরঙ্গজেবের ক্রুর দৃষ্টিও পড়েছিল শ্রীক্ষেত্রের এই জগন্নাথ মন্দিরের ওপরেই। ঘোর সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন বাদশাহ ঔরঙ্গজেব জগন্নাথের মন্দির মাটিতে মিশিয়ে দেবার আদেশ দিয়েছিলেন নবাব ইকরাম খাঁকে।'

হঠাৎ, এই প্রথম, মুকুন্দলাল মুখ খুলল রোষ-কর্কশ কণ্ঠে, 'এটা কি ইতিহাসের কথা হচ্ছে ডঃ বড়ুয়া, স্যার? আমারও তো ইতিহাসই ছিল এম.এ.-তে। ঔরঙ্গজেব পুরীর মন্দির ধ্বংস করতে বলেছিলেন, এমন কথা তো কোথাও পাইনি।'

উত্তেজনাহীন স্বরে কার্লেকারই জবাব দিল—'কেমন করে পাবে? তুমি তো ফার্সিভাষা জানো না। তাই প্রসিদ্ধ ফার্সি রোজনামচা তবশিরৎ-উল-নাজিরিন পড়বার সুযোগই পাওনি। ঐ রোজনামচায় বলা হয়েছে—যখন ঔরঙ্গজেব জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস করার হুকুম দিয়েছিলেন নবাব ইক্রাম খাঁ-কে, তখন ঐ মহামন্দির ছিল মহারাজা দ্রব্যসিংহদেবের অধীনে। মহারাজা স্বয়ং মীরমুহম্মদকে অনুরোধ করেন নবাবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিতে এবং রাজী হন নিজে ঐ মন্দির ভেঙে বিরাট মূর্তি সম্রাট ঔরঙ্গ জেবের কাছে পাঠাতে। সেই অনুযায়ী মহারাজ বড় দেউলের সিংহদ্বারে রক্ষিত একটি রাক্ষসমূর্তিও দ্বারের সম্মুখস্থ দুইটি তোরণ ভেঙে ফেলেন। এবং একটি মস্ত চন্দনকাঠের মূর্তি ও দেবের নেত্রস্থানে রক্ষিত দুইটি প্রধান হীরক বীজাপুরে বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের কাছে পাঠিয়ে দেন। রোজনামচার এই বর্ণনা শুনলে মনে হয় না কি যে, দেবদ্বেষী সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সর্বগ্রাসী হিংস্র দৃষ্টি থেকে পুরী জগন্নাথদেবও রক্ষা পাননি, এবং কেবল খোর্দারাজ দ্রব্যসিংহের কৌশলেই সে যাত্রায় দারুমূর্তিগুলি রক্ষা পেয়েছিল?'

'তুমি এবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাও কিন্নরী। একটু আগে বলছিলে কালাপাহাড়ের কথা। জগন্নাথহীন রত্নবেদী দেখে ক্ষেপে গিয়েছিল নাকি কালাপাহাড়। হুকুম দিয়েছিল—যেখান থেকে হোক, যেমন করেই হোক দারুমূর্তিগুলো খুঁজে আনতে। তারপর?'

বলেই দুঃসহ কৌতূহলে পুনর্বার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন প্রজ্ঞাপ্রবীণ ডঃ বড়ুয়া।

কার্লেকার বলল—'তারপরেরকার কথা তো বলতে আমায় হবেই স্যার। না বললে, কেমন করে বোঝাবো আমি—কোথা থেকে এলো জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার আজকের এই হস্ত-পদ-অঙ্গুলিবিহীন রূপ। দুর্দান্ত কালাপাহড় শত শত দেবমূর্তি আর দেবমন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ বা অঙ্গহীন করে করে জগন্নাথের মন্দিরে প্রবিষ্ট হয়ে যখন দেখলেন তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন, দেবদেউল থেকে মুখ্য দেবতাই হয়েছেন অপসৃত, তখন তাঁরই আদেশে সৈন্যরা প্রথমে সমগ্র শ্রীক্ষেত্রে অধিবাসীদের ওপরে চালালো অকথ্য অত্যাচার, চালালো লুণ্ঠন আর নারীধর্ষণ। শেষে, দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল তারা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত—জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা মূর্তির সন্ধানে। হায়, এ যাত্রায়, জগন্নাথের পরমভক্ত সেবকরা অনেক চেষ্টা করেও, এই নেকড়েদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারলেন না—তাঁদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় ঐ দারুমূর্তিগুলিকে। কালাপাহাড় চিলকা হ্রদের নিকটবর্তী পারিকুদ থেকে দারুব্রহ্মকে বের করে এনে, টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিলেন কোলাঘাটের অদূরে গঙ্গাতীর পর্যন্ত। সেখানে স্তূপাকারে কাঠ সাজিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করা হল। যখন লেলিহান অগ্নিশিখায় চারিদিক আলোকিত হয়ে উঠল, ঠিক তখনই দারুব্রহ্ম মূর্তিকে নিক্ষেপ করা হল সেই অগ্নিগর্ভে। দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল কোটি কোটি ভক্তের আরাধিত দারুব্রহ্ম জগন্নাথের পূতঃমূর্তি। সেই বীভৎস বহ্নি উৎসবকে ঘিরে তখন হিন্দুবিদ্বেষী কালাপাহাড়ের অসুর প্রকৃতির অনুচরদের সে কী উৎকট উল্লাস। হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ দেবতাকে নিঃশেষে জ্বালিয়ে দিতে পেরেছে ভেবে, মহানন্দে নৃত্য করতে

করতে কালাপাহাড়ের দল সেই দগ্ধ মূর্তিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল গঙ্গার বুকে। মাদ্‌লা পঞ্জী এই ঘটনার বিবৃতি দিতে গিয়ে বলছে—দারুব্রহ্মকে অগ্নিমধ্যে প্রদান করামাত্র তার সর্বাঙ্গ খসে খসে পড়ল ও সে মৃত্যুমুখে পতিত হল। সেই সময় সবার অলক্ষ্যে অনতিদূরে দাঁড়িয়ে এই বীভৎস দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন জগন্নাথগতপ্রাণ এক ভক্ত, নাম তাঁর বেসর মোহান্তি। হয়তো ইতিহাসের অমোঘ বিধানেই সেদিনকার সেই দৃশ্যপটে বেসর মোহান্তির সেই আকস্মিক আবির্ভাব। কালাপাহাড়ের সৈন্যদল অদৃশ্য হতেই, বেসর মোহান্তি উন্মত্ত গতিতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গঙ্গার জলে তাঁর জীবনসর্বস্ব জগন্নাথের দগ্ধ দারুমূর্তিকে উদ্ধার করার জন্যে। গঙ্গাবক্ষে ভাসমান দগ্ধ-বিকৃত দারুব্রহ্মকে একবার নিজবক্ষে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে হাহাকার করে উঠেছিলেন তিনি, হায় চতুর্ভূজ নীলমাধব! হায় লক্ষ ভক্তের নয়নের মণি পুরুষোত্তম জগন্নাথ। দস্যুদের হাতে পড়ে, এ তোমার কী দুর্দশা হয়েছে! তারপর, রাত্রির অন্ধকারে, অতি গুপ্তভাবে সেই দগ্ধ-বিকৃত দেবমূর্তিকে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলেন বেসর মহান্তি উৎকলেরই কুজঙ্গ-দুর্গাধিপতি খণ্ডাইত-গৃহে। ইতিহাস থকে আমরা জানতে পারছি—বেশ কয় বছর জগন্নাথের দগ্ধ-বিকৃত মূর্তি ঐ দুর্গাধিপের গৃহেই সযত্নে রক্ষিত ছিল। খোর্দারাজ রামচন্দ্রদেবের রাজত্বকালে, রাজা স্বয়ং সাড়ম্বরে দারুব্রহ্মকে পুরীতে ফিরিয়ে এনে, নবকলেবর উৎসবের শেষে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই মূর্তিরই, রত্নবেদীর সিংহাসনে। আগের মতই ষোড়শোপচারে জগন্নাথদেবের পুজো চলতে লাগল সত্যি, কিন্তু, দারুমূর্তিগুলির আগেকার সেই নয়নাভিরাম রূপ আর ফিরিয়ে আনা গেল না। যে অবস্থায় বেসর মোহান্তি সেগুলি গঙ্গাবক্ষে পেয়েছিলেন, সেই কাঠামোর ওপরেই নববর্ণ লেপন ও সংস্কার সাধন করে, বর্তমান রূপে রূপান্তরিত করা হয়েছিল দারুব্রহ্মকে। তাই নারদপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, উৎকলখণ্ড, কপিলসংহিতার রচয়িতারা যে চতুর্ভূজ জগন্নাথ-বলরাম ও দ্বিভূজা সুভদ্রার অনুপম রূপের বর্ণনা দিয়েছেন, যে চতুর্ভূজ জগন্নাথের নয়নালোভন রূপৈশ্বর্যে জগবন্ধু প্রেমে উন্মাদ হয়েছিলেন নদীয়ার গৌরগুণমণি, সেরূপে আজ আর আমরা দেখতে পাইনা জগৎপতি-জগবন্ধুকে। নীলাচলে শ্রীচৈতন্য শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে। আর, দেবদ্বেষী কালাপাহাড় পুণ্য জগন্নাথক্ষেত্র তছনছ করেছিলেন, দগ্ধ করেছিলেন শ্রীমূর্তিকে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে।'

কার্লেকারের কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, দেড় পোয়া ওজনের একটা মস্ত আপেল প্রচণ্ড বেগে এসে লাগল তার ডান চোখের ঠিক ওপরের কপালে। উঃ বলে মৃদু আর্তনাদ করে, হাত দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরে, বসে পড়ল কিন্নরী সেখানেই যেখানে দাঁড়িয়ে সে তার বক্তব্য পেশ করেছিল এতক্ষণ। এই অকল্পিত পূর্ব ঘঠনার আকস্মিকতায় সভাগৃহ প্রথমটায় যেন হতবাক হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে। হতচকিতের ভাবটা কাটতেই ডঃ বড়ুয়া দৌড়ে নেমে গেলেন মঞ্চ থেকে কার্লেকারের কাছে। জেনারেল সেক্রেটারী অমিতাভও তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগলেন—'ফার্স্ট এইড বক্স কোথায়,

ফার্স্ট এইড বক্স?' শ্রোতার দল মুহূর্তে ঘিরে দাঁড়ালো কিন্নরীকে। কিন্তু ওদিকে আর এক নাটক শুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে অন্যত্র। পদ্ম এবং অধ্যাপক গৃহিণীকে বিস্মিত করে দিয়ে জয়ন্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়াল তড়িৎ ক্ষিপ্রতায়। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে সবেগে পথ করে নিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল সে ধীর পদবিক্ষেপে পলায়মান মুকুন্দলাল অগ্রবালের ওপরে। দুই হাতের দশটা আঙুল দিয়ে চেপে ধরল অগ্রবালের সার্টের কলারটা তারপর চিৎকার করে উঠল সারা হলকে কাঁপিয়ে দিয়ে, 'নির্লজ্জ কাপুরুষ কোথাকার। একটা নিরস্ত্র নিরীহ যুবতীকে আপেলের বাড়িতে জখম করে, রাস্তার কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে পালানো হচ্ছে? এক্ষুণি তোমাকে আমি পুলিশের হাতে দেব।'

অপ্রত্যাশিতভাবে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত ভদ্রলোকের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে, মুকুন্দ প্রথমটা বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। দার মুখ দিয়ে মাত্র দুটি কথাই বেরোতে শোনা গেল—'আমি, মানে আমি?' 'হ্যাঁ, তুমি। আমি নিজের চোখে দেখেছি তোমাকে আপেল ছুঁড়ে মারতে। বড়ঘরের শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত যুবক তুমি, যে অন্যায় করেছ, সেটা স্বীকার করার মত সাহস পর্যন্ত নেই তোমার মধ্যে?'

তিন-চারজন জুলু-হোটেনটটের মত চেহারার মস্তান এসে মুহূর্তে শাসাতে আরম্ভ করল জয়ন্তকে, 'কেন বড়দা শিভালরি দেখাচ্ছেন, এখনি আপনার ধড়টা ধপাস করে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাবে, সেটা কি খুব ভাল হবে? আমাদের অগ্রবালদার কত বড় ইজ্জত, তা জানেন?'

নিদারুণ ক্ষোভে আর উত্তেজনায় কলাপাতার মত কাঁপতে কাঁপতে হুঙ্কার ছাড়ল জয়ন্ত—'না জানি না। যুবকের দেহে শক্তি দিয়েছেন ঈশ্বর নারীর সম্মান রক্ষা করার জন্যে। যে যুবক তরুণীর ইজ্জতের মর্যাদা পর্যন্ত দিতে পারে না, তার ইজ্জতের কোনো দাম নেই আমার কাছে। হয় ও ক্ষমা চাক্ ওর সহপাঠিনীর সামনে, নইলে পুলিশে ওকে আমি দেবই।' 'দ্যাখো, বড়দা, তুমি কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছ মাইরি। অগ্রবালদা ঐ আপেল ছোঁড়েনি কখনও। তুমি ঐ রূপসী মেয়েটার রূপে মজে অগ্রবালদার নামে কেচ্ছা গাইছ। এ কিন্তু বরদাস্ত করব না আমরা।' মস্তানের দল সমস্বরে আস্ফালন জুড়ে দিল।

জয়ন্ত আরও কষে কলারটা চেপে দরে ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করল—'কী? ছোঁড়োনি তুমি আপেল?'

মুখ নীচু করে অগ্রবাল জানালো—'হ্যাঁ, ছুঁড়েছি।'

'তবে ক্ষমা চাইছ না কেন এখনও রাস্ক্যাল?' কলার ধরে ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনি দিয়ে গর্জে উঠল জয়ন্ত।

হঠাৎ সেইদিকে চোখ তুলে তাকিয়ে, রক্তাক্ত কপালটাকে চেপে ধরেই উঠে দাঁড়াল কিন্নরী। তাড়াতাড়ি জয়ন্তের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করল—'কি হয়েছে মাস্টারমশাই, ওকে অমনভাবে কষ্ট দিচ্ছেন কেন?'

'কেন, তা ওকেই জিজ্ঞেস করো। আপেল ছুঁড়ে তোমার কপাল ফাটিয়েছে কে? এই স্কাউন্ড্রেলটা। আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'ও ভুল করেছে মাস্টারমশাই, ওকে ছেড়ে দিন।' কিন্নরীর কণ্ঠে মিনতির সুর।

'ভুল? তোমার কপাল থেকে এখনও রক্ত পড়ছে, কিন্নরী। আর তুমি ওকে ছেড়ে দিতে বলছ? বলছ—ও ভুল করেছে? ওর ভুলের মাশুল ওকে দিতেই হবে। ওকে আমি পুলিশে হ্যান্ড ওভার করবই। সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষিত ছেলে হয়ে ওর এই ব্যবহার?'

'আমি যে জগবন্ধু-ব্রতচারণ করছি, মাস্টারমশাই। ব্রতচারিণীর মনে কারোর আচরণেই যে কোনো ক্ষোভ আসা উচিত নয়। যদি আসে, ব্রতে কিছুতেই সফল হতে পারব না আমি। আমার প্রভু জগন্নাথ যে জগৎপিতা। যে যত বড় ভুলই করুক, মহাপ্রভু জগবন্ধুর কাছে ক্ষমা সে পাবেই, যদি অনুতপ্ত হয় সে নিজের কৃতকর্মের জন্যে। চেয়ে দেখুন, মুকুন্দ অনুতাপের জ্বালায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে আর লজ্জা দেবেন না মাস্টারমশাই।

ডঃ অনিলকান্তি বড়ুয়া, জেনারেল সেক্রেটারী অমিতাভ চৌধুরী, অধ্যাপক দীনেশ ভট্টাচার্য্য প্রমুখকে কিন্নরীর সঙ্গে এদিকে আসতে দেখেই হোটেনটট-জুলুমার্কা ব্যায়ামবীররা এক এক করে কোথায় যে উবে গেল কর্পূরের মত মুহূর্তের মধ্যে—তাদের আর চিহ্ন পর্যন্ত দেখা গেল না সারা হলঘরের কোনো কোণে।

নিঃশব্দে হাত নামিয়ে নিল জয়ন্ত অগ্রবালের কণ্ঠদেশ থেকে। জয়ন্তকে দেখিয়ে কিন্নরী বলে উঠল—'মুকুন্দ, এঁর নাম তুমি চম্পাদিদি আর আমার মুখে অনেক শুনেছ। এঁর লেখা—'কণ্টক পথে' বই তুমি আমার কাছ থেকে নিয়ে পড়ে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলে—একবার পরিচয় করিয়ে দিতে মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে। ইনি সেই সুরাটের চম্পাদির মাস্টারমশাই—যিনি একা কয়েক হাজার মারমুখী শ্রোতার সামনে, শ্রীরাধাকে নিয়ে ওঁর দীর্ঘ গবেষণার ফল ঘোষণা করেছিলেন নির্ভীকভাবে। আজ, এই মুহূর্তে, সেই মাস্টারমশাই স্বয়ং তোমার সামনে দাঁড়িয়ে। ওঁকে প্রণাম করো।'

মুকুন্দ অগ্রবাল চকিতে মুখ তুলে একবার তাকালো জয়ন্তের দিকে। তারপরে, হেঁট হয়ে প্রণাম করবার চেষ্টা করতেই জয়ন্ত তাকে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরল বুকে। অগ্রবালের পিঠে সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে সে অনুচ্চস্বরে বলল—'আমি তোমার মনের খবর জানি, মুকুন্দ। জানি কার্লেকারকে তুমি একান্ত করে পেতে চাও তোমার জীবনে। কিন্তু ভাই, একটা স্যত যে জানা হয়নি তোমার আজও। গায়ের জোরে নারীর দেহ দখল করা হয়তো যায়, তার হৃদয় জয় করা যায় না। রাবণ সীতাকে বাহুবলে হরণ করে যে ভুল করেছিল, তুমিও কেন সেই ভুলের দিকেই পা বাড়াচ্ছ? অন্তরে-বাইরে শ্রীরামচন্দ্রের মত হৃদয়বান হও, সীতা নিজে থেকেই অর্ঘ্য দেবে তখন তোমার পায়ে।'

।। তৃতীয় অধ্যায় ।।

বিস্মৃত পরিজন

কাবুলের কাছে আলিসাঙ্গ নদী-তীরে
ক্ষ্যাপা কী যে খুঁজে ফিরে।

অ-ভারতীয় মাটিতে দাঁড়িয়ে কোনো অ-ভারতীয় যুবতী যদি হাতের উপর হাত ঠুকে এক শিক্ষিত ভারতীয়কে হঠাৎ বলে বসে—'আপনি জানেন না, তাই অমন কথা বলছেন। চীন দেশের নাম যে আজ চীন হয়েছে, সে নামটি ভারতেরই দেওয়া।' তাহলে একবার ভেবে দেখুন তো, কাবুলে সদ্য পৌঁছানো জয়ন্তের কি বিস্মিত না হয়ে আর উপায় আছে? 'চীন' দেশের নামের মূলে ২৫০ খৃঃ পূর্বাব্দের 'ছিন' বা 'জিন' বংশ, অথবা ৩০০ খৃষ্টাব্দের 'সিন' বা চিন' বংশেরই প্রভাব যে রয়েছে, সেই ধারণা বদ্ধমূল ছিল জয়ন্তের মনে। তাই সৈয়দ সাহেবের (সৈয়দ মুজতবা আলীর) বিশিষ্ট ভক্ত অধ্যাপক রহিম দিল্ খাঁ যখন ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত নিয়ে চীনের সঙ্গে মন কষাকষির কথা বলতে বলতে, হয়তো খেয়াল বশেই, অকস্মাৎ প্রশ্ন করে বসলেন—'তুমি তো ভাই, আলী সাহেবের মতই বেশ কয়েকটি বিদেশী ভাষা নিজের দখলে নিয়েছ। আচ্ছা, বলতে পারো, চীন নামটি এলো কোথা থেকে, তখন জয়ন্ত চীন নামটির সম্ভাব্য উৎপত্তি সম্বন্ধে নিজের বদ্ধমূল ধারণাটুকুই ব্যক্ত করেছিল কেবল। আর, সঙ্গে সঙ্গে অ-ভারতীয় নারীকণ্ঠের উপরোক্ত প্রতিবাদ এসে আছড়ে পড়ল জয়ন্তের কানে। চমকে পেছনে চেয়ে দেখে সালোয়ার-পাঞ্জাবী আর ওড়নায় মোড়ানো জনৈকা ক্ষীণ কটী বছর কুড়ি-একুশের তন্বী তার অগ্নিক্ষরা রূপ নিয়ে জয়ন্তের দিকে চেয়ে হাসছে। কিন্তু জয়ন্ত তো অধ্যাপক রহিম দিল্-এর সঙ্গে কথা বলছিল চোস্ত উর্দুতেই। মেয়েটি বুঝল কেমন করে সে বাঙালী? নাহলে, সে বাংলায় কথা বলবে কেন জয়ন্তের সঙ্গে, যদিও উচ্চারণে পস্তু ঘেঁষা টান রয়েছে যথেষ্টই!

হাসতে হাসতেই মেয়েটি পুনশ্চ বলল—'মাফ করবেন। বাঙালী তো নই, তাই বাংলার আক্‌সেন্টে ভুল থেকেই যাচ্ছে, আমি জানি। তবু অনেকদিন পরে বাংলায় কথা বলার লোভটুকু সামলাতে পারিনি। কিন্তু, চীন নামটি যে ভারতেরই দেওয়া, সেটা বলে আমি অন্যায় করিনি কিছু, এটা তো মানবেন?'

ততক্ষণে বিস্ময়ের ধাক্কাটা অনেকখানি সামলে নিয়েছিল জয়ন্ত। সেও হেসেই উত্তর দিল—'প্রমাণ করুন, আপনি যা বলেছেন সেটা সত্যি। তবে তো মানব।'

'কি জানেন, আপনার মত অনেকেরই ধারণা আছে, আপনাদের মনু সংহিতা আর মহাভারত চীনের ছিন্ বা সিন্ বংশের সময়ে বা তারও পরবর্তীকালে রচিত। আর তাই ঐ দুটি অতি প্রাচীন গ্রন্থে চীন শব্দের উপস্থিতি নাকি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এ ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল। চীনা পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের অধিকাংশই নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, চীন শব্দ বহু প্রাচীন এবং ঐ নাম ভারতবাসীদেরই দেওয়া (প্রাচ্য বিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষ, ষষ্ঠ ভাগ, পৃঃ ৩৬২)। ছিন বংশের বহু আগেই বাইবেলের প্রাচীনতম অংশে চীনদেশ সিনিম্ (Sinim) নামে বর্ণিত হয়েছে (Edkius' Chinese Buddhism, P. 93n; Indian Antiquary, Vol. XIII, P. 317n), আর হিন্দু প্রদত্ত চীন নামই টলেমি সিনাই (Sinai) নামে বর্ণনা করেছেন। মহাভারতে বলা হয়েছে—স

কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ বৃতঃ প্রাগ্‌-জ্যোতিষেহভবৎ (ভারত ২/২৬/৯) অর্থাৎ মহারাজ ভগদত্ত চীন ও কিরাত সৈন্যসহ যুদ্ধ করতে এসেছিলেন। এ থেকে এটাও প্রমাণিত হচ্ছে—সেই ভারত যুদ্ধের সময়েই ভারতের সঙ্গে চীনের সংশ্রব ছিল বেশ ঘনিষ্ঠ।'

অভারতীয় এক তরুণী অজ্ঞ এক ভারতীয় যুবকের সামনে প্রমাণ করতে চাইছে যে, চীন নামটা ভারতেরই দেওয়া—সেটা তো বিস্ময়ের কথা বটেই। কিন্তু, মুসলমান অধ্যুসিত কাবুলের বুকে দাঁড়িয়ে, সে দেশেরই কোনো কন্যার মুখ থেকে মহাভারত, মনুসংহিতার কথা শুনতে পাওয়া, শুনতে পাওয়া সংস্কৃত ভাষায় উদ্ধৃতি—এ যে কত বড় একটা হতবুদ্ধিকর কাণ্ড, তা বলে বোঝানোর অপেক্ষা রাখে না নিশ্চয়ই।

কাবুল নগরের দক্ষিণ দিকে সোরবাজার অঞ্চলে 'চার ছাতা' নামে—আলি মর্দ্দান খাঁ নির্মিত যে নয়নানন্দন কারুকার্য খচিত চিত্র-বিচিত্রিত ইমারতটি দেখে একটু আগে বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল জয়ন্ত, তার চেয়ে অনেক বড় বিস্ময় নিয়ে আবির্ভূতা হল এই মেয়েটি। রক্তোজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের দেহে। কালো গভীর চোখ দুটি আকর্ণ বিস্তৃত। ভারতীয় ঢং-এ এলো খোঁপায় আবদ্ধ চুলের রাশি। চোখে-মুখে কোনো সঙ্কোচ, কোনো আড়ষ্টতার চিহ্নমাত্র নেই। অথচ কোথায় যেন একটা কোমলতা, একটু পেলবতা লুকিয়ে আছে ওর কথাবার্তায়, আচারে-ব্যবহারে—যে বস্তুটা আফগান নারীদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভবই বলা যেতে পারে। 'আপনি বাংলা শিখলেন কার কাছে?' জয়ন্ত জানতে চাইল। 'বীরেন মুখার্জির কাছে। আপনি চেনেন তাঁকে?'

'না।'

'ঐ যে কলকাতার হেস্টিংস-এ মস্ত বাড়ি করেছেন পোস্টমাস্টার জেনারেল পরেশনাথ মুখার্জি, ইনি তাঁর ই ছেলে। বিলেত থেকে ইঞ্জিনিয়ারীং পাশ করে প্রথমে ইম্পিরিয়্যাল ওয়ার ওয়েজে চাকুরী নিয়েছিলেন। এখন ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের সঙ্গে যুক্ত! দিল্লী-কাবুল এয়ার লাইন তো তাঁরই তৈরী।' গড় গড় করে বলে গেল মেয়েটি।

রহিম দিল বললেন—'তোমার মুখ-চোখ দেখে বুঝতে পারছি, বেশ একটু আশ্চর্য বোধ করছ মেয়েটিকে দেখে। প্রাচীন গান্ধারের অনুসন্ধানে এসেছ কাবুলে, নবীনা এই গান্দারি তারই ভূমিকা মাত্র।'

'গান্দারি? তার মানে?'

'গান্দারি শব্দটি নতুন লাগছে, না? প্রাচীন ঐতিহাসকি হেরোদোতাস্‌ হেকত্রৈয়স্‌ আর টলেমি যে এ অঞ্চলের লোকদের গান্দারি (Gandarii or Gandarai) বলেই উল্লেখ করেছেন তাঁদের লেখা ইতিহাসে। মেয়েটি কিছুতেই নিজেকে আফগান বলে পরিচয় দেবে না। বলবে, ও গান্দারি।' 'আশ্চর্য!' জয়ন্ত তাকাল একবার মেয়েটির দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ছ-ফুট লম্বা, পাগড়ীধারী, শুভ্র শশ্রূ-সম্বলিত প্রবীণ অধ্যাপক বলে উঠলেন 'এখনই আশ্চর্য হচ্ছ? ওকে যতই দেখবে, ততই বেশি আশ্চর্য হতে হবে আরও, তার জন্যে তৈরী রাখো তোমার মনকে মুখার্জি সাহাব।'

'মহাভারত, মনুসংহিতাও কি পড়েছেন ঐ বীরেনবাবুরই কাছে?' জয়ন্তের কৌতূহলী প্রশ্ন। 'না। আলিসাহেবের কাছে তো যাতায়াত করত রোজ। উনিই ওকে সংস্কৃত শিখিয়েছেন, সংস্কৃত গ্রন্থ দিয়ে তোমাদের শাস্ত্রপাঠে সাহার্য করেছেন।'

'আলি সাহেব বলতে কি সৈয়দ মুজতবা আলিকে বোঝাচ্ছেন?' 'হ্যাঁ। উনি কাবুল ছেড়ে চলে যাওয়াতে ওর ভারী অসুবিধা হয়েছে। প্রথম ক'দিন তো কান্নাকাটিও করেছে খুব।'

মেয়েটি হঠাৎ বেশ উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, 'আলিসাহেব, মুজতবা আলি—এসব বলে ডাকা ঠিক নয় ওঁকে।' অধ্যাপক জানতে চাইলেন—'তবে কি বলে ডাকা উচিত আলি সাহেবকে?'

'আমি ওঁকে যাজ্ঞবল্ক্য বলে ডাকি। ডাকি ব্রহ্মর্ষি বলে।' হো হো করে গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন রহিমদিল এবার। 'আপনি হাসছেন? অতবড় উদার প্রাণ, অমন পরম প্রজ্ঞাবান পুরুষটিকে যাজ্ঞবল্ক্য বলব না তো—বলব কাকে?' মুহূর্তের জন্যে থামল মেয়েটি। তারপর যেন অনেকটা আপন মনেই বলল ধীরে ধীরে—'কাবুল নদীকেই ঋগ্বেদে যে কুভা বলা হয়েছে, সেটা তো আমাকে প্রথম জানিয়েছেন ঐ প্রাজ্ঞ পুরুষটিই!'

কো-তাকৎ সা এবং কো-খোজা-সফর—এই দুই গিরিশ্রেণী মিলিত হয়ে যেখানে একটি কোণের সৃষ্টি করেছে, সেই সমতল ভূমির উপরেই, কাবুল এবং নগর-নদীর সঙ্গমস্থলে, কাবুল নগরটি গড়ে উঠেছে। গজনীর দূরত্ব এখান থেকে ৮৮ মাইল, খিলাৎ-ই-খিলজাই-এর দূরত্ব ২২৯ মাইল, আর, পেশোবারের দূরত্ব ১৭৫ মাইল। বহু পূর্বে এ নগরের চারিদিকে ইটের প্রাচীর ছিল, এখনও জায়গায় জায়গায় তার ধ্বংসাবশেষ সুস্পষ্ট। তখন ছিল সাতটি ফটক বা দরোয়াজা, এখন দাঁড়িয়ে আছে মাত্র দুইটি। এ দুটির নাম লাহরি এবং সরদার।

নগরে প্রবেশের জন্যে কয়েকটি সেতু আছে, তাদের মধ্যে পুল-ই-কিস্তি নামে সেতুটিই প্রধান। সেই পুল-ই-কিস্তির ওপরে দাঁড়িয়েই জয়ন্ত ভাবছিল—ঐ আশ্চর্য মেয়েটির কথা। তিনদিন আগে তারসঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল। তারপর থেকে তার সম্পর্কে অনেকের মুখে অনেক কথাই শুনেছে জয়ন্ত। কেউ বলেন—অসম্ভব প্রতিভাবতী আর বুদ্ধিমতী ঐ মেয়েটি। কেউ বলেন, কাবুলের চেয়ে কান্দাহারে থাকতেই নাকি ওর বেশি ইচ্ছা। গোয়েন্দা বিভাগের এক হোমড়া-চোমড়া অফিসার গত পরশু পুরাতত্ত্ববিদ ডঃ দোস্ত মুহম্মদের বাড়িতে বসে জয়ন্তকে তো হুঁশিয়ারী দিয়েই বসলেন—'খুব সাবধান হয়ে ওর সঙ্গে মেলামেশা করবেন। পুলিশের নজর আছে ঐ দুর্দান্ত সাহসী যাযাবরীটার ওপরে।'

'যাযাবরী বলছেন কেন?' জয়ন্ত প্রশ্ন করেছিল গোয়েন্দা অফিসারটিকে। উত্তরে, মোম দিয়ে পাকানো গোঁফে আস্তে আস্তে মোচড় দিতে দিতে অফিসার বলেছিলেন—'রাত্রি-দিন ঘুরে বেড়ায় একা কাবুল আর কান্দাহারের দুর্গম যত জায়গায়। কোহিবাবা,

হিন্দুকুশ, পঞ্চশির, সাফেদ-কো—এইসব পর্বতশ্রেণীর গভীর অরণ্যে ও একাই চলে যায় নিরস্ত্র হয়ে। এখান থেকে ৩৮০ মাইল দূরে কান্দাহার। শুনেছি ও এক খচ্চরের পিঠে চেপে সেখানে যায়। সেখানেও বর্তমান কান্দাহার শহরের ৪ মাইল দূরে ডলজিনাক পর্বতের পাদদেশে—যেখানে সুদূর অতীতে একদিন গান্ধার রাজ্যের অবস্থিতি ছিল, তারই ধ্বংসস্তূপগুলির আনাচে কানাচে একাই ঘুরে বেড়ায় শুক্লপক্ষের চতুর্দশী আর পূর্ণিমার রাত্রে। 'এখন আপনিই বলুন, যাযাবরদের মত এমন চক্কর খেয়ে বেড়ায় যে মেয়ে, তাকে যাযাবরী বলে কি আমি কোনো অন্যায় করেছি?'

'কিন্তু, কেবল এমন ঘুরে বেড়াবার জন্যে, পুলিশ ওর উপর নজর রাখবে কেন?' জয়ন্ত জিজ্ঞেস করেছিল আবার। চুরুটের ধোঁয়ায় পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া ঠোঁট দুটো একটু বেঁকিয়ে হাসলেন একবার অফিসার। তারপর বললেন—'ওকে সন্দেহ করার দুটি কারণ আছে পুলিশের। প্রথম কারণ—ওর লাবণ্যভরা তারুণ্য। আফগানিস্তানের যুবতীদের তারুণ্য থাকে, কিন্তু লাবণ্য এমন থাকে না। এদেশের মেয়েদের রূপের মধ্যে একটা কাঠিন্য, একটু রুক্ষ্মভাব থাকবেই—যেটা এই মেয়েটির মধ্যে একেবারেই নেই সুতরাং পুলিশ আজ অবধি নিশ্চিত হতেই পারছে না যে, ওর গায়ে আফগান রক্ত আছে কিনা। তার ওপর ওর এই বেআব্রু হয়ে বেপরোয়া ঘুরে বেড়ানো—এটাও আফগান নারীর রীতির পরিপন্থী।'

'আর, দ্বিতীয় কারণ?'

'দ্বিতীয় কারণটি আরও বেশি সন্দেহ উদ্রেককর। আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের তরফ থেকে যারা নজর রাখে ঐ মেয়েটির ওপরে, তারা অনেকবার দেখতে পেয়েছে—আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী আলীসাঙ্গ (Alisang) নদী পার হয়ে ওকে অপর তীরে চলে যেতে।'

'তাতে অপরাধটা কোথায়, তাতো বুঝতে পারছি না।' জয়ন্ত বলল।

'আপনার পক্ষে না বুঝতে পারাটাই স্বাভাবিক, কারণ আপনি এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা নন।' ছুঁচের মত সরু ডগাসুদ্ধ মোচ নাড়িয়ে জবাব দিয়েছিলেন গোয়েন্দা অফিসার।

আর সেই সময়ে কথা বলেছিলেন এতক্ষণের নির্বাক শ্রোতা পুরাতত্ত্ববিদ্। তিনি বুঝিয়ে দিলেন—'উনি ঠিকই বলেছেন। আলীসাং নদীর ওপারে কিছুটা গেলেই যে ছোট্ট একটি দেশ আছে, তার নাম কাফিরিস্তান। সেখানকার অধিবাসীরা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর, অসভ্য। আরও মারাত্মক হচ্ছে ওদের মুসলমান-বিদ্বেষ। কোনো মুসলমান যদি ভুল করে ঐ অঞ্চলে গিয়ে পড়ে, তবে তার আর রক্ষা নেই। তাকে হত্যা করবেই ঐ কাফিরের দল।'

'অবশ্য, আমরাও ছাড়ি না।' বীরত্বব্যঞ্জক সুরে এবার কথা বললেন অফিসার, 'ওদেরও কেউ যদি ছিটকে এসে পড়ে ওদের চারপাশের যে কোনো মুসলিম রাজ্যের মধ্যে, তবে তাকেও আমরা জবাই না করে ছাড়ি না। কখনো কখনো ওদের দুই-এক জনকে বন্দী করে নিয়ে এসে, ক্রীতদাসের কাজও করিয়ে নেওয়া হয় সারা জীবনভোর।'

'তা, ঐ মেয়েটি যে আলীসাং নদীর ওপারে চলে যায় একা একা, কই, ওকে তো কেউ মেরে ফেলে না!' জয়ন্ত জিজ্ঞেস করেছিল।

'ঐ একই প্রশ্ন তো আমাদেরও ভাইসার্ব। মুসলমানের দেশে কাবুল থেকে যে মেয়ে আলীসাঙ্গের ওপারে গিয়ে থেকে আসছে কখনো বিশদিন, কখনো বা একমাস, সে বেঁচে ফেরে কেমন করে? মেয়েটা জাতে তবে কি? ও কি আফগান নয়? আর, তাই কি তার রূপে এমন অ-আফগানসুলভ কোমলতা?' সের আলি বললেন। দোস্ত মুহম্মদ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—'না, না, মেয়েটিকে অ-আফগান বা অ-মুসলমান ভাবা ঠিক হবে না। যে কোনো সাধারণ আফগানের চেয়ে ওর মুখের পস্তু উচ্চারণ অনেক বেশি চোস্ত, অনেক সাবলীল এবং ভব্য। কোরাণ থেকে, শারিয়াৎ থেকে, হাদিস থেকে উদ্ধৃতি দেয় ও যখন তখন।'

'তবে ও আলীসাঙ্গের ওপারে কোথায় যায়? কেন যায়? কার বাড়িতে বাস করে অতদিন ধরে? মুসলমান হয়েও, কাফিরিস্তান থেকে ফিরে আসে কেমন করে জীবন নিয়ে? গোয়েন্দা অফিসারের প্রশ্নের সারিগম ক্রমেই উর্দ্ধমুখী। 'কাফিরিস্তানের অধিবাসীরা কি তবে মুসলমান নয়।' জয়ন্ত জানতে চাইল।

'নিশ্চয়ই নয়। ওরা মুসলমান নয় বলেই তো ওদেরকে কাফির বলি আমরা, আর, ওদের দেশের নাম দিয়েছি কাফিরিস্তান।' গোয়েন্দা সাহেবের জবাব।

'তাহলে, কাফিরিস্তানের লোকেরা কোন্ ধর্মাবলম্বী?'

'কোনো ধর্মই মানে না মনে হয় ওরা। ওদের ধর্ম কেবল মুসলমান হত্যা।'

পুরাতত্ত্ববিদ অনুত্তেজিত কণ্ঠে অফিসারের দিকে চেয়ে বললেন—'তাই কি হয়? একটা না একটা ধর্ম ওরা নিশ্চয়ই মানে। যেহেতু আমরা ওদের দেশে ঢুকতে সাহস পাই না, তাই ওদের ধর্ম যে কি, তার খবরও রাখি না।'

এই সময় হঠাৎ ঝড়ের বেগে ঘরের পর্দা সরিয়ে প্রবেশ করেছিল সেদিন যাকে নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা চলছিল, সেই মেয়েটি। ঢুকেই কোনোদিকে না চেয়ে পুরাতত্ত্ববিদের সামনে একটা মোটা বই খুলে ধরে ভীষণ উত্তেজিতভাবে সে বলে উঠেছিল—'তুমি কেন বলেছিলে—কেবল বৌদ্ধদের ধর্মশাস্ত্রেই লেখা আছে—গান্দার একটি পুণ্যস্তান। এই তো, এই দেখো না—জৈনদের অরিষ্টলেমি পুরাণের এই হরিবংশতেও তো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে গান্দারকে একটি পুণ্যস্থান বলেই। তবে? তবে তো জৈনধর্মের লোকেদের কাছেও গান্দার ছিল একটি তীর্থের মত।'

দোস্ত মুহম্মদ সাগ্রহে ঝুঁকে পড়েছিলেন স্থূলকার গ্রন্থটির ওপর। পড়তে শুরু করেছিলেন সদ্যাগতার নির্দেশিত লাইনগুলি। আর, কিছুক্ষণ অস্বস্তিতে উস্‌খুস্ করে বিরক্তি-বিকৃত মুখে, নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন সেদিন সেই ঘর থেকে ঘোর সুবজ রং-এর ফেজ পরিহিত গোয়েন্দা অফিসার।

পুল-ই-কিস্তির ওপরে দাঁড়িয়ে এইসব কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে পশ্চিমের আকাশটা দিনান্তের রবিকে বিদায় দিতে গিয়ে সরম-রক্ত-রাগে রক্তিম হয়ে উঠেছে, বুঝতেই পারেনি তা জয়ন্ত। সেতুর অপর প্রান্ত থেকে উটের সারি মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছে শহরের দিকে। কতকগুলির পিঠে চক্ চক্ করছে নতুন ক্যানেস্তারা টিন, সেগুলি উটের কুঁজের চারপাশে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে এঁটে দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি উট বয়ে আনছে বস্তার বোঝা। জয়ন্ত শুনেছে—ঐ টিনেই নাকি বামিয়ান আর হাজারা থেকে ঘি আসে এই কাবুলে। আর, ঐ বস্তাগুলি বয়ে নিয়ে আসছে উত্তর বদাকসন, জালালাবাদ, লাসখন ও কুনার থেকে চাল। রাত্রিতে উটগুলো গিয়ে পৌঁছবে কাবুলের সোরবাজারে অথবা দরোয়াজা লাহরিবাজারে। সেখানে খালাস হবে ঐসব মাল। বেচারা উটের দল তখন বিশ্রাম পাবে কয়েক ঘণ্টার জন্যে। ডুবন্ত দিনমণির রক্তাভয় শ্রেণীবদ্ধ উটগুলিকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল দূর থেকে। ক্রমেই উটগুলি নিকট থেকে নিকটতর হল। আর, তারই সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠল জয়ন্তের চোখের সামনে আর এক অবিশ্বাস্য চিত্র। ঐ উটগুলির মধ্যে একটি উটের পিঠে বস্তার স্তূপের ওপর বসে আছে—গোয়েন্দা অফিসারের বর্ণিত সেই সন্দেহ উদ্রেককর ভয়ঙ্কর দুঃসাহসী যাযাবরী মেয়েটা।

জয়ন্তের দিকে দৃষ্টি পড়তেই, হাত তুলে সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল সে—'কি বাঙালীবাবু, পুল-ই-কিস্তিতে একা একা দাঁড়িয়ে কি করছেন?' এই বলেই, চলন্ত উটের পিঠ থেকে ঝপাৎ করে নীচে লাফিয়ে পড়ে, ছুটে এসে দাঁড়ালো সে একেবারে জয়ন্তের পাশটিতে। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল—'আমার মত আপনি বুঝি সূর্যাস্ত দেখতে খুব ভালবাসেন?'

জয়ন্ত হাসল। বলল—'সূর্যাস্ত দেখতে আবার ভাল লাগে না কার? কিন্তু, আপনি আসছেন কোথা থেকে এমন উটের পিঠে চেপে?'

'বাবরের সমাধিতে গিয়েছিলাম।'

'কোন্ বাবর? মোঘল সম্রাট বাবর?'

'হ্যাঁ।'

'বাবরের সমাধি আছে বুঝি এখানে?'

'তাও জানেন না? শহরের বাইরে বাবর আর তৈমুরের সমাধি বুঝি এখনো দেখেনইনি?'

'না। বাবরের সমাধিতে বুঝি রোজই যান?'

'রোজ নয়, প্রায়ই। যাই, বাবরের নামে বাবরেরই কাছে শিকায়েৎ জানাতে।'

'সেকি? কিসের নালিশ?'

'ইতিহাসের পাতায় এত বড় একটা মিথ্যে কথা কেন লিখে রেখেছে আজকের ঐতিহাসিকরা বাবরের নামে।'

'কোন্ মিথ্যে কথা?'

'ইতিহাস বলছে, সম্রাট বাবর নাকি লিখে গেছেন, কাফিরিস্তানের লোকেরা গলায় কিং নামের চামড়ার বোতলে মদ ভর্তি করে তাই গলায় ঝুলিয়ে বেড়ায়।'

চমকে উঠল জয়ন্ত, মেয়েটির মুখে কাফিরিস্তানের নাম শুনে গোয়েন্দা অফিসারের বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেল চকিতে। অফিসার প্রশ্ন তুলেছিলেন—আলিসাঙ্গ নদীর ওপারে কোথায় যায় ঐ মেয়েটি? কেন যায়?

তবে কি কাফিরিস্তানের সঙ্গে সত্যিই কোনো সম্পর্ক আছে এই মেয়েটির—যে কাফিরিস্তানে কোনো মুসলমানের প্রবেশ মানেই মৃত্যু?

মেয়েটি আবার বলল—'বাবর শাহ্ আরও কি লিখে গেছে—জানেন বাঙালীবাবু লিখেছে, কাফিরেরা নাকি জলের বদলে মদ খায়।'

'এসব যদি লিখেও থাকেন মোঘল সম্রাট বাবর, তাতে আপনার নালিশ করার কি আছে বাবরের সমাধিতে গিয়ে? বাবর তো বলেছেন কাফিরিস্তানের কাফিরদের সম্বন্ধে, আপনি তো কাফির নন, মুসলমান।'

জয়ন্ত স্পষ্ট লক্ষ্য করল, তার কথায় মুহূর্তের জন্যে মেয়েটির রক্তাভ মুখখানি কেমন যেন রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেল। দূরে—অস্তাচলে আসন্ন সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকের দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে ও চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর, নিজেকে কিছুটা স্বাভাবিক করে তুলতেই বোধ করি বলল—'যা সত্যি নয়, তা কেন লিখে যাবেন অতবড় একজন মহৎ মানুষ?'

এইবার সুযোগ পেলো জয়ন্ত মেয়েটিকে একেবারে চেপে ধরার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে বসল—'আপনি কেমন করে বলছেন—কাফিরদের সম্পর্কে বাবর ঠিক কথা বলেননি? কোনো মুসলমান তো কাফিরের দেশে কোনোদিন ঢুকতেই পারে না শুনেছি। আপনি যখন মুসলমান, তখন কাফিররা যে মদের বোতল গলায় ঝুলায় না, বা জলের বদলে মদ খায় না—এটা জোর দিয়ে বলছেন কেমন করে আপনি?' মেয়েটা এবার বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকল জয়ন্তের দিকে। তারপর, থেমে থেমে নিম্নস্বরে বলল—'বলব তোমাকে বাঙালীবাবু, একদিন সব খুলে বলব, সব জানাবো। সেদিন নিশ্চয়ই তুমি তোমার আজকের প্রশ্নের জবাব পাবে।' এই বলে, কয়েক মিনিট নীরব থেকে, কী যেন ভেবে নিল সে। তারপর আবার কথা বলল—'আমি কিন্তু এরই মধ্যে তোমাকে তুমি বলতে শুরু করেছি, সেটা লক্ষ্য করোনি বোধ হয়?'

'করেছি।'

'কোন্ সাহসে মাত্র কয়দিনের পরিচয়ে আমি এই বয়সের মেয়ে হয়েও তোমাকে তুমি বলতে পারলাম—বলতে পারো?'

'কেমন করে বলব?'

মেয়েটি ঠোঁটের কোণে একটু হাসল। তারপর বলল—'একদিন এটাও জানতে পারবে—তুমি আমার কত আপনজন।'

পাগল নাকি মেয়েটা? জয়ন্ত ভাবল। কাবুলবাসিনী এক আফগান-তনয়ার সে নাকি অতি আপনজন।

মেয়েটি বলেই চলল, 'তোমার সম্বন্ধে কত কথাই না শুনেছি আলিচাচার কাছে, প্রফেসর সাহেব আর ঐ প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে। বিদেশের ইউনিভার্সিটির কেবল একজন ডক্টরেটই তুমি নও, আরবী, ফার্সি, হিব্রু, লাটিন, সংস্কৃত ভাষায় তুমি নাকি অনর্গল বলতে, লিখতে, পড়তে পারো। প্রাচ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানের গভীরতার তুলনা পাওয়াই নাকি ভার। প্রাচীন ব্রাহ্মি, খরোষ্ঠী লিপির জ্ঞানও নাকি কম নয় তোমার মধ্যে। আর, তোমার যে গুণটার কথা সবচেয়ে বড় করে বলেছেন আলিচাচা আমাকে, তা হল তোমার মনের অপরিসীম উদারতা। কোনো জাতি, কোনো ধর্ম, কোনো সমাজের প্রতিই নাকি কোনো বিদ্বেষ পোষণ করো না তুমি হৃদয়ে।'

যতই শুনছিল মেয়েটির মুখের কথাগুলি জয়ন্ত, ততই অবাক হচ্ছিল সে! কে এই আলিচাচা? কার কাছ থেকে শুনল মেয়েটা তার সম্পর্কে এমন অহেতুক বাড়িয়ে বলা প্রশস্তি!

সে জানতে চাইল, আলিচাচা বলতে আপনি কাকে বোঝাতে চাইছেন, তাতো বুঝতে পারছি না!'

'অধ্যাপক সৈয়দ মুজ্‌তবা আলিকে। অনেকগুলো ভাষায় উনিও পারঙ্গম। ওঁর লেখা অনেকগুলি বাংলা বই আমি পড়েছি। কত বড় উদার প্রাণের মানুষ! ওর কাছেই তো আমার সংস্কৃতে হাতেখড়ি। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ এসব বই তো উনিই জুগিয়ে দিতেন আমাকে। উনি যেদিন কাবুল ছেড়ে চলে গেলেন, তারপর তিন-চার দিন আমি কেবল কেঁদেছি ঘরে বসে। সারা কাবুলকে কেমন যেন শূন্য আর নিঃস্ব বলে মনে হয়েছিল আমার তখন।'

এরপর উভয়েই নীরবে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। জয়ন্তের বিশেষ ভক্তিভাজন আলিদার কথা বলতে গিয়ে কাবুলবাসিনীর চোখ-মুখে একটা ব্যথাতুর ভাব এমনই স্পষ্টভাবে ফুটে উটল যে, আসন্ন সন্ধ্যার অপ্রতুল আলোতেও সেটা দেখতে কষ্ট হল না জয়ন্তের। কথার মোড় অন্যদিকে ফেরাবার প্রয়াসেই বোধ হয় প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করল সেই। শুধালো—'আচ্ছা, এই যে উটের পিঠে চেপে এলেন, উটের মালিকরা কোনো আপত্তি করল না?'

'তা করবে কেন? আমি যে ওদের জন্যে লাড্ডু বানিয়ে নিয়ে যাই প্রায়ই। ওরা আমায় ওদের মেয়ের মত ভালবাসে।' এই বলে একটু থেমে, অনুযোগের সুরে আবার বলল—'কিন্তু তোমার সঙ্গে আর কথা বলা আমার উচিত মনে হচ্ছে না।'

'কেন বলুন তো?'

'তুমি আমার চেয়ে অন্ততঃ পাঁচ-সাত বছরের বড় তো হবেই। তবু তোমাকে আমি তুমি বলতে পারছি অনায়াসে। অথচ, তুমি আমাকে আপনি আপনি করছ এখনও।'

জয়ন্ত হাসল। বলল—'একটু আগেই আপনি বললেন—আপনার অতি আপনজন নাকি আমি, আর, সেই কারণেই নাকি আমাকে আপনি তুমি বলে সম্বোধন করতে দ্বিধা বোধ করছেন না। কিন্তু, আমি তো এখনও জানতে পারিনি—আমি আপনার আপনজন হলাম কোন্ সূত্রে। তাই আপনার মত একজন এম.এ. ক্লাসের সদ্যপরিচিতা বিদুষী ছাত্রীকে তুমি-তুমি করতে বেশ কিছুটা সংশয় রয়ে যাচ্ছে মনে।'

'বলেছি তো একটু আগে—নিশ্চয়ই জানাবো তোমাকে একদিন—কোন্ সূত্রে তুমি আমার অতি আপনজন। কিন্তু এখনই বলতে পারছি না তা, ক'দিন আরও অপেক্ষা করতেই হবে তোমাকে।'

'বেশ তো, যেদিন সূত্রটা বলবেন—সেদিন থেকেই না হয় শুরু করা যাবে আপনাকে তুমি বলা।'

একটু যেন ক্ষুণ্ণ হল মেয়েটা—মনে হল। তবু, হাসবার চেষ্টা করে বলল—'তুমি নাকি প্রাচীন গান্ধার সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালাবার জন্যে এ-যাত্রায় কাবুলে এসেছ—প্রফেসার রহিম দিল আর দোস্ত মুহম্মদ সাহেবের কাছে শুনলাম। তা—অনুসন্ধানের কাজ কি আরম্ভ করে দিয়েছ এরই মধ্যে?'

'না, আরম্ভ করা বলতে যা বোঝায়, তা এখনও করা সম্ভব হয়নি। তবে, একটা ছক প্রায় ঠিক করে দিয়েছেন পুরাতত্ত্ববিদ দোস্ত মুহম্মদ, সেই ছক অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি শুরু করব ভাবছি দুই-চারদিনের মধ্যেই। সবার আগে অবশ্য যাব কান্দাহারে।'

'কান্দাহারে?' মুহূর্তে ক্ষুণ্ণ অভিমানের মেঘ সরে গিয়ে ওর দুই চোখে চক্‌চক্ করে উঠল উৎসাহ আর ঔৎসুক্যের ফুলকি। 'কবে যাবেন বলুন, আমি হব আপনার সঙ্গী।'

'আপনি যাবেন? দোস্ত মুহম্মদ বলছিলেন, একজন গাইড দেবেন কান্দাহার দর্শনের জন্যে। কান্দাহারের ইতিহাস না জানা থাকলে, আপনার পক্ষে আমার কাজে সাহায্য করা সম্ভব হবে কতটুকু—তাই ভাবছি।'

'বেশ তো, গাইড চলুক না সঙ্গে। কিন্তু আমিও যাব। আপনি না নিয়ে যেতে চাইলেও যাব।'

'সেকি? অকারণে আপনি আবার কষ্ট করে—'

জয়ন্তের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল মেয়েটা—'কষ্ট হবে কার? আমার?' বলেই খিল খিল করে হেসে উঠল বাচ্চা মেয়ের মত একবার। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে আবেগের সুরে বলল টেনে টেনে—'কান্দাহারেই আমার

মন পড়ে থাকে সবসময় বাঙালীবাবু, কান্দাহারই যে আমার প্রাণবায়ু, জানো না বুঝি, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার নাম ইন্দ্রা নয়, শবনম নয়, সেখানে আমি শুধুই গান্দারি!'

গোয়েন্দা অফিসার মিঃ সের আলি চুরুটটা ভালভাবে ধরিয়ে, তারপর প্রশ্ন করলেন— 'প্রফেসার সাহেব শুনলাম ও নাকি রোজ আপনার কাছে সকালে আসে ইতিহাস পড়তে?'

'ও বলতে কাকে বোঝাতে চাচ্ছেন—তা তো বুঝতে পারছি না।' প্রখ্যাত ইতিহাস অধ্যাপক রহিম দিল খাঁ বললেন।

'ঐ সন্দেহজনক মেয়েটা? কি যেন নাম—গান্দারি না কি একটা?'

'হ্যাঁ, আসে পড়তে প্রায়ই।'

'আজ কি আসার সম্ভাবনা আছে?'

'আসতেও পারে।'

'আচ্ছা, প্রফেসার সাব আপনার কি বিশ্বাস? মেয়েটি আফগান?'

যতদূর জানি—তাতে আফগান বলেই তো মনে হয়।'

'আপনার সঙ্গে তো পরিচয় ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন অধ্যাপক সৈয়দ মুজতবা আলীর মাধ্যমেই?'

'না। তার অনেক আগে থেকেই ওকে আমি জানি। এতিমখানার (অনাথাশ্রম) অধ্যক্ষ ওর মধ্যে আশ্চর্য প্রতিভা লক্ষ্য করে ওকে এনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল আমার সঙ্গে। তখন ও সবে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। আমি দেখলাম, মেয়েটি সত্যিই মেধাবী এবং নম্র। ওকে, তখন থেকেই, পড়াশোনায় সাহায্য করছি আমি।'

'আফগানই যদি হবে, তবে তুর্কী সওদাগরের বাড়িতে থাকে কেন?'

'বাম-মা মরা মেয়ে! এতিমখানার অধ্যক্ষের অনুরোধেই মুস্তাক কামাল সাহেব মেয়েটির জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অতবড় ধনী ব্যবসায়ী হলে কি হবে, কামাল সাহেবের নসিবে তো সন্তান জোটেনি আজও—তাঁর দুইটি পত্নী থাকা সত্ত্বেও! তাই নিজের কন্যার মতই লালন-পালন করছেন মেয়েটিকে। আর, মেয়েটির স্বভাবই এমনি যে, ওর সঙ্গে দুই-চারদিন যে মিশবে, তারই আর ওকে ভাল না বেসে উপায় নেই।'

চুরুটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে, কি যেন কিছুক্ষণ ভাবলেন সের আলি। তারপর চুরুটটাকে দুই পাটি দাঁতের মধ্যে কামড়ে ধরে আবার জেরা শুরু করলেন—'এতনি তো ওর বাপ-মা কেউ নিশ্চয়ই ছিল! তারা থাকত কোথায়, কি ছিল তাদের নাম, এটা তো নিশ্চয়ই ও জানে?'

'না জানে না। ওর যখন মাত্র এগারো বছর বয়েস, তখনই ওকে জমা দিয়ে গিয়েছিলেন এক দয়ালু মৌলভী ঐ এতিমখানায়। তখন ওর ভয়ঙ্কর জ্বর আর বিকার।

প্রায় দেড় মাস হেকিমের চিকিৎসায় থেকে যেদিন সুস্থ হয়ে উঠল ও, সেদিন অনেক প্রশ্ন করেও ওর কাছ থেকে জানা যায়নি ওর বাপ-মায়ের নাম, ওর ঠিকানা। বোধহয় প্রচণ্ড বিকারের ফলে বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল ওর। অন্ততঃ ডাক্তাররা তো সেইরকমই বলে। মাথার পেছন দিকে গভীর ক্ষতও ছিল, প্রথম ও যখন আসে।'

'কিন্তু মেয়েটি যে মুসলমানেরই মেয়ে, সে বিষয়ে আপনি কি নিশ্চিত?'

রহিম দিল হাসলেন। শুভ্র দাড়ির ওপর নীরবে হাত বুললেন বার কয়েক। তারপর বললেন, 'বুঝতে পারছি, আপনি যে বিভাগের যে কাজে নিযুক্ত, সেই কাজের প্রয়োজনেই আজ হঠাৎ গান্দারি সম্বন্ধে এতগুলি প্রশ্ন আমায় করেছেন। কিন্তু আপনার শেষের প্রশ্নটা আমার কাছে কিছুটা অবান্তর এবং অবাঞ্ছিত বলেই আমার মনে হচ্ছে। ইসলামকে যে ও কত ভালবাসে, কোরাণ যে ওর কত প্রিয় এবং আদরের বস্তু—তা এতদিন ওর সঙ্গে মিশে আমার আর জানতে বাকী নেই। গান্দারী যদি মুসলমান না হয় তাহলে আমি-আপনি তো কখনই মুসলমান নই।'

উত্তেজিত কণ্ঠে জবরদস্ত সি. আই. ডি অফিসার প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন—'এসব কি উদ্ভট কথা বলছেন আপনি প্রফেসর সাহেব? আমি-আপনি মুসলমান নই? আমি চারবার নামাজ পড়ি রোজ?'

'তা হয়তো পড়েন, সেটা অস্বীকার করছি না। কিন্তু কোরানে মেয়েটির যে জ্ঞান, আমার তো তার সিকি ভাগও নেই।'

'ও আপনার বাড়িয়ে বলা কথা। ওকে ভালবাসেন তো? তাই ওর সবই আপনার কাছে ভীষণ একটা কিছু।'

'আমি বাড়িয়ে বলছি না—মিঃ সের আলি।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বাড়িয়ে বলছেন কিনা—সেটাই পরীক্ষা করবো বলে আজ এসেছি এখানে। আমাদের বিভাগের লোকজনের সন্দেহ—ও মুসলমান নয়।'

'এরকম সন্দেহ করার কারণ?'

'কারণ অনেকগুলিই আছে। কিন্তু, সেসব কথা পরে অন্য আরেক দিন বলবো। আজ ওকে পরীক্ষা করবো—সত্যিই ও কোরাণের কতটুকু পড়েছে বা জেনেছে। মুসলমান যদি হয়, কোরাণে ওর দখল থাকা, অন্ততঃ কিছুটা তো নিশ্চয়ই উচিৎ।'

রহিম দিল কোন কথা বললেন না আর। টেবিলের ওপর থেকে দৈনিক খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে তাতে সবে চোখ বুলাতে যাবেন, এমন সময় কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন কালো আলখেল্লা পরিহিত, কারাকুল-টুপী মাথায় মেহেদীতে ছোপানো দাড়িওয়ালা প্রায় অশীতিপর এক বৃদ্ধ। তাঁকে দেখেই সের আলি ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে, সসম্ভ্রমে স্বাগত জানালেন—'আসুন, আসুন মৌলভীসাব আপনার অপেক্ষাতেই বসে আছি আমরা' তার পরেই, অধ্যাপকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন— 'ইনিই প্রফেসর রহিম দিল।'

অধ্যাপকও উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন 'আস সালাম-উস—আলায়কুম' বৃদ্ধ বার্দ্ধক্য কম্পিত স্বরে প্রত্যাভিবাদন জ্ঞাপন করলেন—'ওআলায়কুম-উস-সালাম।' হাতের ছড়িটা কোচ-এর একধারে ঠেসান দিয়ে দাঁড় করিয়ে, বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলেন মৌলভী—'আমায় হঠাৎ তলব করেছেন কেন কোতোয়াল সাব? 'একটি অল্প বয়সী মেয়ে এখনই আসবে প্রফেসরের কাছে পড়তে। তার কোরাণ সম্পর্কে কিছু জ্ঞান আছে কিনা, আপনি দয়া করে একটু বাজিয়ে দেখবেন, এই অনুরোধ।'

ছেলে মানুষের মত দন্তবিহীন মাড়ি বের করে হাসতে হাসতে বললেন বৃদ্ধ—'বলছেন মেয়েটি অল্প বয়সী। তার আবার কোরাণের জ্ঞান আসবে কোথা থেকে? আজকাল বুড়োরাই কেউ কোরান পড়তে চায় না।'

'তবু যদি মুসলমানের মেয়ে হয়, অন্তত ঃ কিছুটা কোরাণ তো জানা পড়া থাকবেই তার!'

'এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যায় কি এই জমানায়? কত ব্যবসায়ী কত ইমানদার দৌলত-ওয়ালা লোককে দেখেছি কোরাণের ধার দিয়েও যায় না। আপনাদের ইউনিভার্সিটিতে তো আজকাল কেবল ইউরোপ-আমেরিকার বিদ্যা শেখানো হচ্ছে। সাধারণ পোষাকের ওপর চাদ্রেরী পড়াটাও যখন আজ আর আফগান-জেনানাদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামুলক নয়, তখন কচি একটা নাদানী মেয়েকে কোরাণের বিষয়ে প্রশ্ন করে হয়রানি করা কি ঠিক হবে?' 'বড় যুক্তিযুক্ত কথা বলেছেন আপনি মৌলভী সাহেব।' অধ্যাপক সহাস্য বদনে তারিফ করলেন বৃদ্ধের বিচার বুদ্ধিকে।

এই সময়ে, 'ভেতরে আসতে পারি' বলে যে নারী কণ্ঠটিকে বাইরে থেকে অনুমতি ভিক্ষা করতে শোনা গেল হঠাৎ, সে যে কে—সেটা বুঝতে পেরেই সের আলি ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন মৌলভীকে—এসেছে সেই মেয়ে, যার কোরাণ জ্ঞানের পরীক্ষা নেবার উদ্দেশ্যে লোক পাঠিয়ে ডাকিয়ে এনেছেন অশীতিপর বৃদ্ধকে আজ সকালে—গোয়েন্দা-অফিসার।

'নিশ্চয়ই ভিতরে আসবে তুমি।' প্রফেসর সস্নেহে বলে উঠলেন, 'তোমার ইন্তেজারীই তো করছি আমরা সবাই।'

ঘরে ঢুকেই অভ্যাগত দুইজনের মুখের দিকে চেয়ে গান্দারি কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেল একটু। কিন্তু তা এক মিনিটের জন্যেই। পরমুহূর্তে সাবলীল স্বরেই সে বলল, 'এদেরকে তো আমি চিনি না চাচা সাহেব! ওঁকে যদিও একদিন দেখেছিলাম ডঃ দোস্ত মুহম্মদের বাড়ীতে।' বলে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিল মেয়েটা অফিসারকে।

সের আলিকে দেখিয়ে অধ্যাপক বললেন, 'ইনি আমার একজন দোস্ত। নাম সের আলি। আর ঐ কোচে বসে আছেন যিনি—তিনি একজন আমার অতি সম্মানিত মেহমান। ওঁকে আমরা ডাকি মৌলভী সাহেব বলে।'

'মৌলভী সাহেব!' বিস্ময় আর আনন্দ একই সঙ্গে ফুটে উঠল মেয়েটির কণ্ঠে।

'হ্যাঁ মাজান, লোকে আমায় মৌলভীই বলে বটে। তা, তুমি শুনলাম অনেকদূর পড়া-লেখা করেছো—বি.এ.পাস করে এম-এ পড়ছো, বেশ আন্তরিকতা নিয়েই প্রশ্ন করলেন মৌলভী ইয়াকুব খাঁ। চকিতে একবার রহিমদিলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে মেয়েটি বলল, 'চাচাসাহেবের মুখে শুনেছেন বুঝি এসব? কিন্তু বি. এ., এম. এ. পাস করলে কি লাভ হবে? আপনার মত জ্ঞানী হতে তো পারবো না কোনদিন!' সের আলি এরই মধ্যে, মৌলভীর দৃষ্টিকে আড়াল করে মেঝেতে চুরুটের মুখটা চেপে ধরে চুরটটা নিভিয়ে ফেলে, কোটের পকেটে ভরে ফেলতে সক্ষম হয়ে অনেকটা সহজ বোধ করছিলেন। এবার তিনি কথা বলতে বাধ্য হলেন। কারণ, বললেন, সদাশয় মৌলভীকে কথায় কথায় অন্যদিকে নিয়ে চলেছে ধূর্ত্ত মেয়েটা। কোরাণের পরীক্ষা করবেন কেমন করে মৌলভী? তাই গান্দারির কথার সুযোগ নিয়ে কোরাণের কথাই তুলে বসলেন গোয়েন্দা অফিসার। তিনি বললেন, 'কেন পারবে না জ্ঞানী হতে মৌলভী সাহেবের মত তুমি, আমি, প্রফেসর সাহেব- আমরা সবাইত মুসলমান। আমরাও যদি মৌলভি সাহেবের মত মনপ্রাণ দিয়ে কোরাণ পড়ি, তাহলে আমরাও তো জ্ঞানী হতে পারবো একদিন।' একটু হেসে মেয়েটি বলল—'তা কেমন করে পারবো? পড়লে বিদ্যা বাড়ানো যায়, জ্ঞান পেতে গেলে—সাধনার দরকার হয়।'

'বাঃ, তুমি একেবারে ঠিক কথাটি বলেছো মা'জান। বিদ্যা আর জ্ঞান যে এক জিনিস নয়, সেটা তুমি যে বুঝতে পেরেছো এই বয়সেই, এতে আমি ভারী খুশি হয়েছি।'

মৌলভী তাঁর মেহেদীতে ছোপানো দাড়ি নেড়ে, বলীরেখায় ভরা সারা মুখ নীরব-হাসির প্রলেপে আরও বেশি বলীময় করে তুলে, জরা জড়িত স্বরে আস্তে আস্তে বললেন। গোয়েন্দা-অফিসার জ্বলে যাচ্ছিলেন মনে মনে। পুলিশের সন্দেহভাজন যে মেয়েটির কোরাণের বিদ্যা পরীক্ষা করবার জন্যে লোক পাঠিয়ে মেহেনৎ করে ডেকে আনিয়েছেন তিনি এই অশীতিপর বৃদ্ধকে, সেই মেয়েরই প্রসংশায় মুখর হয়ে উঠছেন মৌলভী ক্রমেই।

'তাহলেও, আমরা যখন ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী সকলেই, তখন আমাদের সকলেরই যে কোরাণ পড়া অবস্য কর্তব্য—একথা কেমন করে অস্বীকার করবে তুমি?'

দুঁদে গোয়েন্দা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন এবার।

'না, না, এটা অস্বীকার করবো কেমন করে।'

'তা, তুমি কোরাণ পড়ো না?'

'বাঃ, কোরাণ পড়বো না? অমন মহৎ গ্রন্থ পৃথিবীতে কটা আছে আর?'

এতক্ষণে, বৃদ্ধের বোধ হয় হঠাৎ খেয়াল হল—কি কারণে কোতোয়ালসাব কোতোয়ালি থেকে লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে এনেছেন আজ এখানে। এবং সেই কারণেই বোধকরি তাড়াতাড়ি তাঁর কর্তব্য পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। শুধালেন—

কোরাণের যতগুলি পারা (অধ্যায়) এবং যতগুলি সুরা (পরিচ্ছেদ) আছে, তাদের সবকটির মধ্যে থেকে কোন্ কথাটি তোমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে বলো তো?'

'বলবো নিশ্চয়ই মৌলভী সাহেব, কিন্তু আমার ভাল লাগা আর আপনাদের ভাল লাগা যদি এক না হয়, কিছু মনে করবেন না তো?'

সের আলি বুঝতে পারলেন, মেয়েটি বৃদ্ধের প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তিনি বলে উঠলেন, 'না না—তা মনে করতে যাবো কেন? তুমি বলোইনা শুনি। দেখি কোরাণে তোমার বিদ্যে কতখানি।'

'অতি সামান্য। সেটা কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি।'

'সেটা তো স্বাভাবিক! তুমি তো আর মৌলভী নও' রহিমদিল অভয় দিলেন গান্দারিকে।

'কিন্তু চাচা সাহেব, ওঁরা যে কোরাণকে কেবল কোরাণ-কোরাণ করছেন, এটা কিন্তু আমার ভাল লাগছে না। আমি কিন্তু কোরাণকে কেবল কোরাণ বলতে রাজী নই।' এই বলে, দুই হাত যোড় করে বুকের কাছে তুলে, নিমিলিত আঁখিতে সে পুনরায় বলল, আমি বলি—অলকোরাণ ফোরকান। আর, সবচেয়ে যে কথাগুলি আমার হৃদয়কে বারবার নাড়া দিয়ে গেছে অলকোরাণ ফোরকান-এর মধ্যে—তা হল—মান আরফা নাফ সাহু—ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু।' এরপরেই অফিসারের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞেসা করে বসল—'একথাগুলোর মানে কিন্তু আপনাকেই বলতে হবে মিঃ সের আলি।'

সের আলি প্রমাদ গুণলেন। তাঁর প্রশ্ন যে বুমেরাং হয়ে তারই দিকে তেড়ে আসবে এমনিভাবে, এটা ছিল তাঁর চিন্তারও বাইরে। কোনো মৌলভী বা ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁকে অনুসরণ করে নমাজটা সেরে নিতে পারেন না হয় কোন মতে, কিন্তু কোরাণের তিনি কতটুকু পড়েছেন? আরবী ভাষাটাই যে তাঁর কাছে ঘোর দুর্বোধ্য! তবু, এই এক রতি মেয়েটার কাছে নিজের অজ্ঞতাটুকু ঢেকে রাখার ক্ষমতা যে তাঁর যথেষ্টই আছে, সেটা বুঝা গেল তাঁর প্রত্যুৎপন্নপ্রতি-উৎসারিত জবাবটা থেকেই। তিনি বললেন, মৌলভী সাহেব সামনে থাকতে তোমার বলা কথাগুলির অর্থ বলবো আমি? এতে যে অপমান করা হবে মৌলবী সাহেবকে।'

'না না, অপমান হবে কেন আমার?' মৌলভী বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'বলুন না আপনি কোতোয়াল সাহেব?'

কী বিপদ! বুড়োটা মজালো দেখছি আজ! নাকসাহু-রাব্বাহু এসব শব্দই কি জীবনে কখনো শুনেছেন তিনি যে, মানে বলবেন তার?

গান্দারি বলল—আচ্ছা, আমিই বলছি মানেটা। আমার ভুল হলে কিন্তু শুধরে দেবেন আমাকে মৌলভী-সাহেব।'

'বলো মাজান, বলো। আমি শুনি।'

'আমার বলা কথাগুলোর মানে হল—যে নিজেকে চিনেছে, সেই চিনেছে ঈশ্বরকে।'

'ওয়াঃ, ওয়াঃ, প্রাঞ্জল ভাষায় একেবারে ঠিক অর্থটি তুমি প্রকাশ করেছো কিন্তু মাজান!' বৃদ্ধের কুণ্ঠাহীন প্রশস্তি।

'ঠিক এই কথাই বলে গেছেন যুগে যুগে সব ধর্মের সব পয়গম্বররা। আত্মজ্ঞান না হলে ঈশ্বরজ্ঞান কখনো হতে পারে না। জবুর তৌরিত (Old testament) ও ইঞ্জিলে (New testment) এমন কথা আছে, ইরাণের সুফী দর্শনে এই ভাবই প্রকাশ করা হয়েছে, বৌদ্ধ, জৈন, আর বৈদান্তিকেরাও এই বাণীই লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাদের গ্রন্থে।'

'আপনার কি মনে হয় মৌলভী সাহেব?—গান্দারি কি ঠিক বলেছে? অধ্যাপকের প্রশ্ন। 'অন্যসব ধর্মে কি আছে না আছে, তাতো আমার জানা নেই প্রফেসর, কিন্তু, মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু'র অর্থ ও যা বলল এবং যেমন সহজ ভাষায় বুঝালো, তাতে ওকে তারিফ না করে আমি পারি না একটু আগে' বৃদ্ধের সরল উত্তর।

'কিন্তু পবিত্র কোরাণের কোন পবিত্র বাণীর সঙ্গে কি কোনো সাচ্চা মুসলমান বিধর্মীদের ধর্মগ্রন্থে বলা কথার তুলনা করতে পারে, না তেমনটি তার করা উচিৎ? ওর ঐ একটি মাত্র শ্লোকই হয়তো জানা আছে কোরাণ থেকে মৌলভী সাহেব, সেটাই ও আওড়ে দিয়ে আপনার সামনে খুব বাহাদুরী নিচ্ছে। বলুক দেখি ও কোরাণ থেকে অন্য আর একটি বাণী!' সের আলির কথা শেষ হবার আগেই নিখুঁত উচ্চারণ এবং সুরে মেয়েটি আবৃত্তি সুরু করে দিল দুই চক্ষু বুঁজে—কানাল্লাহ ওয়ালাম ইরাকুন মাহু শায়ন। এক আল্লাহই ছিলেন প্রথমে, আর কিছুই ছিল না। অর্থাৎ আল্লাহ থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি।'

'ওয়াঃ ওয়াঃ—চমৎকার উচ্চারণ কিন্তু আরবীতে তোমার মাজান!' বৃদ্ধের সঙ্কোচ-হীন প্রশংসা।

'জানেন মৌলভী সাহেব, বৈদান্তিকেরাও ঠিক এই কথাই বলেন—তিনি সর্বাগ্রে একই ছিলেন, পরে বহু হলেন।'

'তাই নাকি? তুমি তো দেখছি তবে নিজের ধর্ম ছাড়াও, অন্য ধর্মেরও অনেক কিতাব পড়েছো!'

'কিন্তু কেন তা পড়বে?' উত্তেজিত সুরে আপত্তি জানালেন সের আলি, সাচ্চা মুসলমান শুধু কোরাণই পড়বে, অন্য ধর্মের কিতাব পড়লে সে তো কাফির।' 'তা কেমন করে হবে? মেয়েটি নম্র সুরেই বলল—'মুসলমানেরাই তো বলে থাকেন—হজরত ঈশা (যীশু) আলায় হেস সালাম। যীশুখৃষ্ট ইসলামেরই একজন পয়গম্বর ছিলেন। আর এই কারণেই তো ইঞ্জিলকে (Bible) কখনো কোন মুসলমান অশ্রদ্ধা করে না।'

'এসব ইসলাম বিরোধী-কথা কোথায় পেয়েছো তুমি জানতে পারি? ইঞ্জিল হচ্ছে অন্য ধর্মের কিতাব। তাকে খাঁটি মুসলমান শ্রদ্ধা করতে যাবে কেন?'

উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হয়ে উঠছেন ক্রমেই গোয়েন্দা অফিসার।

'কেন? কোরাণই তো ঈশাকে (যীশু) স্বীকৃতি দিয়েছে—ঈশ্বর প্রেরিত একজন রসুল বলেই। কোরাণ বলছে—মরিয়ম (মেরী)-পুত্র ঈশা আল্লাহর প্রেরিত একজন রসুল এবং মরিয়মের নিকট প্রেরিত আল্লাহর কালাম ও প্রেরণা ছাড়া অন্য কিছুই নন। (কোঃ ৪ঃ ১৭১)।'

'থাকতেই পারে না এমন কথা কোরাণে।' সের আলি এবার সশব্দে তাঁর চওড়া পাঞ্জার থাবা টেবিলের ওপর মেরে প্রায় গর্জন করে উঠলেন আপনি এর প্রতিবাদ করুন মৌলভী সাহেব।'

'কেমন করে প্রতিবাদ করবো কোতোয়াল সাহেব, মাজান যে ঠিকই বলছে—'বৃদ্ধ জানালেন, 'আমাদের কোরাণ যে বড়ই মহৎ বড়ই বৃহৎ, বড়ই উদার! তাকে আপনি সংকীর্ণ বলে ভাবছেন কেন?'

এই বলে, গান্দারিকে উদ্দেশ্য করে পুনশ্চ কথা বললেন শান্ত-ধীর স্বরে বৃদ্ধ, আমার মনে হয়, কোতোয়াল সাহেব ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না যে, সত্যিই কোরাণকে তুমি গভীরভাবে পড়েছো। ওঁকে খুশি করবার জন্যেই আমি যদি কোরাণের ওপর তোমাকে দু-একটা প্রশ্ন করি মাজান তবে কি তুমি মনে দুঃখ পাবে?'

'তা কেন পাবো? আপনি করুন না জিজ্ঞেস। মিঃ সের আলি, আমার শ্রদ্ধেয় চাচাসাহেবের দোস্ত। উনি যদি খুশি হন, তাহলে নিশ্চয় আমি উত্তর দেবো আপনার প্রশ্নের। অবশ্য সে উত্তরটা যদি আমার জানা থাকে, তবেই।' মেয়েটি কথা কইল স্বাভাবিক সুরেই। 'তুমি কি বলতে পারো—কোরাণের মধ্যে কয়টা পারা (অধ্যায়) ,কয়টা সুরা (পরিচ্ছদ), 'কয়টা শ্লোক, কয়টা কলমা (শব্দ), আর কয়টা অক্ষর বা বর্ণ আছে?' এইবার জব্দ করার মত প্রশ্ন ছেড়েছেন মৌলভী ইয়াকুব! অতবড় কোরাণের কটা অক্ষর আছে—তা বলার সাধ্য আছে কটা মুসলমানের। আর এ তো ধাপ্পাবাজ এক আধুনিকা বাকসর্বস্ব নাদানী?

মোম দেওয়া গোঁফের ডগায় আস্তে আস্তে তা দিতে লাগলেন খোস মেজাজে গোয়েন্দা অফিসার। দিক জবাব দেখি কেমন পারে—ঐ বেপরোয়া বেআদব মেয়েটা। মেয়েটি উত্তর দিলো—'কোরাণ শরিফ ৩০টি পারা, ১১৪টি সুরা, ৬৬৬৬টি শ্লোক, ৭৯৪৩৬ টি কলমা আর ৩২৩৭৪১ টি অক্ষর আছে। তাই নয় মৌলভী সাহেব?'

'কি জবাব দেবো মা-জান! আজকালকার বিলাইতি শিক্ষা পাচ্ছে যে সব ছেলে মেয়েরা, তাদের কেউ যে কখনো কোরাণ সম্পর্কে এমন ওয়াকিবহাল হতে পারে, এ আমার কল্পনারও বাইরে ছিল, একথা তোমার কাছে স্বীকার করতে আমার কোন কুণ্ঠাই আসছে না এখন।'

'মৌলভী সাহেব আপনাকে কোতয়াল সাহেব বলে সম্বোধন করছেন লক্ষ্য করছি।'

স্মিত হাস্যে সোজা দৃষ্টিতে সের আলির মুখের দিকে চেয়ে গান্দারি কথা বলল এবার, 'তাই আমি আপনাকে কোতোয়াল সাহেব বলেই' ডাকবো এখন থেকে। কি জানেন কোতোয়াল সাহেব—একটু আগে আপনি অন্য ধর্মের কিতাব পড়তে নিষেধ করছিলেন, কিন্তু, অন্য ধর্মের কিতাব না পড়লে আপনি কেমন করে জানতে পারবেন যে, হিন্দুস্তানের হিন্দুরাও ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে কত কথা লিখে গেছে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের সংস্কৃত শাস্ত্রে।'

'কারা লিখেছে? হিন্দুস্তানের হিন্দুরা? তাদের সবচেয়ে বিদ্বেষের বস্তু ইসলাম সম্পর্কে? তাও আবার সংস্কৃতে? এই ধোকাবাজি কথাও বিশ্বাস করতে হবে আমাকে প্রফেসার সাহেব?' রেগে গস গস করছেন সের আলি, বেশ বোঝা গেল। রহিম দিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—'ও যা বলছে সেটা একান্ত ওরই কথা। এ সম্বন্ধে আমার কোন কিছু জানা নেই।'

'তবে? আপনার মতন এতবড় একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং অধ্যাপকের যা জানা নেই, তা একটা বিশ বছর বয়সের ছাত্রীর জানা থাকতে পারে কেমন করে? মেয়েটা পয়লা নম্বরের ঝুটী প্রফেসার সাহেব।'

'আমাকে দয়া করে আমার কথা শেষ করতে দিন কোতোয়াল সাহেব, তারপর যদি ঝুটী, ধোকাবাজ বলার ইচ্ছা হয়, নিশ্চয় বলবেন।' অনুনয় এবার মেয়েটির স্বরে। মৌলভী মাথার কারাকুল টুপীটা খুলে হাতে নিয়ে বিশেষ ঔৎসুক্যের সঙ্গে তাকিয়ে রইলেন তাঁর নাতনীর চেয়েও ছোট বুদ্ধিদীপ্ত বক্তার দিকে।

'হিন্দুরা তাদের কোন কিতাবে সংস্কৃত ইসলাম ধর্ম্মের প্রশস্তি গেয়েছেন শুনি?' ঝাঁঝিয়ে উঠলেন অফিসার।

'হিন্দুদের ভবিষ্যপুরাণে আছে—এতস্মিন্নন্তরে ম্লেচ্ছ আচার্যন সমন্বিতঃ। মহামদ ইতি খ্যাতঃ শিষ্য সমন্বিত ।।৫।। অর্থাৎ, ঠিক এই সময়, 'মহাম্মদ' (মুহম্মদ) নামক এক ব্যক্তি, যাঁর বাস মরুস্থলে (আরবদেশে), আপন সাঙ্গোপাঙ্গো-সহ আবির্ভূত হবেন।'

'বলো কি মা'জান! হিন্দু পুরাণের আমাদের হজরত মুহম্মদের আবির্ভাব সম্বন্ধে এমন ভবিষ্যবাণী লেখা হয়েছিল নাকি? বিস্মিত বৃদ্ধ কম্পিত স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করলেন।'

'সব বোগাস।' সের আলি সব নস্যাৎ করে দেবার চেষ্টায় বললেন—'আমরা তো সংস্কৃত ভাষা বুঝি না, তাই ও যা তা একটা মানে বুঝিয়ে দিচ্ছে আমাদের। যে ইসলামকে হিন্দুরা চিরশত্রু বলে ভাবে, সেই ধর্ম্মেরই প্রবর্ত্তক সম্পর্কে ওরা ওদের ধর্মীয় কিতাবে ভবিষ্যবাণী করতে যাবে কেন?' রহিম দিল বেশ গম্ভীর হয়েই কথা বললেন এবার—'কিন্তু আমি জানি সংস্কৃত ভাষা সের আলি সাহেব। ভবিষ্যপুরাণের যে সংস্কৃত শব্দগুলি ও শুনালো, তার অর্থ ও ঠিকই বলেছে, ও বোগাস কথা একটিও বলেনি।'

'আরও শুনবেন কোতোয়াল সাহেব।' পরম উৎসাহে বলে চলল গান্দারি, 'যদিও

খুব বেশি প্রাচীন নয়, তবুও হিন্দুদেরই লেখা অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদে আল্লাহ, রসুল, মহম্মদ, এইসব শব্দ সংস্কৃততে কি অপূর্ব্বভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ওরা লিখেছে—

অস্য ইল্ললে মিত্রাবরণো রাজা
তস্মাৎ তানি দিব্যাদি পুনস্তং দধ্যু
হবয়ামি মিলং কবর ইল্ললাং
অল্লোরহসুল মহমদরকং
বরস্য অল্লো আল্লাম
ইল্লোল্লতি ইল্লা।।
(আয়ুর্ব্বেদীয় উপনিষদ—১)

'আজব বাত! এসব তুমি কি শুনাচ্ছ আজ মা'জান? হিন্দুরা তাদের শাস্ত্রে আল্লাহ, রসুল, মহম্মদ—এই সব শব্দ ইস্তেমাল করেছে সংস্কৃত ভাষায়? মৌলভী যেন নিজের কানকেও ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না।'

'কিন্তু, একটু আগে তুমি যে বললে ইসলামের কথা হিন্দুরা লিখে গেছে শ্রদ্ধার সঙ্গে তা এখন পর্য্যন্ত যে সব শ্লোক আওড়ালে, তার মধ্যে শ্রদ্ধার চিহ্ন তো আমি খুঁজে পেলাম না কোথাও?' হাঁড়ির মত মুখ করে অফিসার বললেন।

'পান নি খুঁজে? তবে শুনুন সংস্কৃতে লেখা অল্লোপনিষদের কয়েকটি কথা।'

'কি উপনিষদ বললে?' প্রফেসরের কৌতুহল।

'অল্লোপনিষদ।'

'সে কি? আল্লাহর নামেও কোন উপনিষদ আছে। তাতো জানতাম না!

'আছে চাচা সাহেব। যদিও এই উপনিষদটিও বিশেষ প্রাচীন নয় তবু এটাওতো লিখেছে হিন্দুরাই। এবং লিখেওছে তা সংস্কৃতেই।'

'শোনাও তো কি আছে ঐ অল্লোপনিষদে!' অধ্যাপক অধীর হয়ে উঠছেন আগ্রহে। মেয়েটি সুন্দর সংস্কৃত উচ্চারণে আবৃত্তি শুরু করলো—

হোতারমিন্দ্রো হোতরমিন্দ্র মহাসুরিন্দ্রাঃ।
অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণাং ব্রাহ্মণ অল্লাম।।
অল্লোহ রসুল মহমদরকং বরস্য অল্লো অল্লাম।
আদল্লাবুকমে ককম অল্লাবুক নিখাতকম।।৩।।

'এর অর্থটা বুঝিয়ে দাও, মা-জান।' মৌলভী বললেন।

'এর মানে—আল্লাহ সকল গুণের অধিকারী, তিনি পূর্ণ ও সর্ব্বজ্ঞানী। মোহম্মদ আল্লাহর রসুল। আল্লা আলোকময়, অক্ষয়, এক, চিরপরিপূর্ণ এবং স্বয়ম্ভু।'

'আশ্চর্য্য! তুমি এত পড়াশোনা করেছো? —হিন্দুস্তানী কিতাব নিয়ে এত গভীর-ভাবে নাড়াচাড়া করেছো—এসবের কিছুই তো আমি জানতাম না।' প্রফেসরের কণ্ঠে স্নেহের সুর।

গান্দারি কিন্তু বলেই চলেছে তখনও সের আলির চোখের ওপরেই দৃষ্টি আবদ্ধ করে—

'আপনি নিশ্চয়ই জানেন কোতোয়াল সাহেব, আমাদের পরমারাধ্য নবীর আবির্ভাবের আগে আরব দেশের অধিবাসীরা গ্রহ-নক্ষত্রের পূজো করতো! তাদের মধ্যে হিম্যার জাতি প্রধানতঃ সূর্য্যের, কেনানা-জাতি চন্দ্রের, তাঈ-জাতি অগস্ত্যের, মিসাম-জাতি বৃষের উপাসনা করতো। ইয়েমেনের সেবা নগরে ছিল শুক্রের মন্দির। প্রবাদ বলছে, মক্কার মন্দিরে এককালে শনির পূজো হত। ইতিহাসে পাচ্ছি, হজরত মহম্মদের জন্মের অনেক আগেই মক্কার কাবা মন্দিরে ৩৬০ টি দেব-দেবীর মূর্ত্তি পূজিত হত।

'এসব কি ধর্মবিরোধী কথা বলছিস তুই নাস্তিকের মত? কাবা শরিফে হত দেব-দেবীর পূজো?'

ক্রোধাতিশয্যে সেরভালি একেবারে তুই-তোকারিতে নেমে এসেছেন এবার।

'হতই তো! কোরাণেও তো আমরা পাচ্ছি তিনটি দেবীর নাম।'

'মুসলমানের ধর্মগ্রন্থে দেবীর নাম? এতবড় স্পর্ধা তোর বৎমিজ পবিত্র কোরাণের নামে মিথ্যে কথা?' গালাগালিতেও হাত পড়ছে ক্রমে।

'মিথ্যে কথা নয় কোতোয়াল সাহেব। কোরাণে আছে বটে তিনটি দেবীর নাম।' মৌলভী বললেন, 'আছে? আপনি পর্য্যন্ত এমন উদ্ভট কথাকে সমর্থন করেছেন মৌলভী সাহেব?

'না করে উপায় কি? যা সত্য, তাকে স্বীকার করাই তো শরীফ আদমির কাজ। কোরাণে যে তিনটি দেবীর নাম আমরা পাচ্ছি, তাঁরা হলেন—অল্লাট্, আল-উজ্জা, আর মেনাট। নাথলা নগরে অল্লাট দেবীর মন্দির ছিল, খাকেফ জাতি তাঁর পুজো করতো। মোগেরা ঐ মন্দির ধ্বংস করে। হুদসাএল ও খোজাদের উপাস্য ছিলেন দেবী মেনাট, আর, কেনানা ও কোরায়েস বা কোরেস জাতি করতো আল-উজ্জা-দেবীর বৃক্ষমূর্তির পূজো।' মৌলভী ইয়াকুবের সমর্থন-পুষ্ট হয়ে, আরও বেশি উৎসাহের সঙ্গে বলে চলল গান্দারি—'অবশ্য কোরায়েসদের প্রধান উপাস্য ছিলেন আসফদেব আর শৈলাদেবী। পারস্য উপসাগরের একটি দ্বীপে তেমিম নামে যে জাতির বাস ছিল, তারা ছিল সূর্য্যোপাসক। তারা প্রাচীন পারসিকদের কাছ থেকে শিখেছিল এই সূর্য্যের উপাসনা।'

'কিন্তু, এইসব পূজো-উপাসনার সঙ্গে তুই পবিত্র কাবা শরীফের নাম জড়াচ্ছিস কেন-রে বেসরম?'

'অকারণে আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কোতোয়াল সাহেব। আমি যা বলছি সব তো আরবের ইতিহাস থেকেই বলছি,' অতি স্বাভাবিক সুরেই কথা বলছে মেয়েটি, 'কেন কাবা শরীফের নাম এদের সঙ্গে জড়াচ্ছি, তা কি আপনার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে এখনও? ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার হবার অনেক আগে থেকেই মক্কানগরীর কাবা মন্দির ছিল আরববাসীদের এক প্রধান তীর্থ। কিন্তু ক্রমেই সেখানে আরম্ভ হল ধর্ম্মের নামে নানা

অনাচার ব্যাভিচার। হজরত মুহম্মদের হৃদয়কে ব্যথিত করে তুলেছিল আরবীয়দের ঐ জঘন্য কার্যকলাপ, নৈতিক-অধঃপতন। আর কেবল সেই কারণেই তো তিনি এক নতুন ধর্ম্মের প্রবর্তন করে সমগ্র আরব জাতিকে আবার গৌরব এবং মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন চোখে নিয়ে, তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে, তাঁরই জন্মভূমির কাছে হিরার নামে যে পর্ব্বতগুহা আছে, সেই জনহীন প্রশান্ত পরিবেশে শুরু করেছিলেন একাগ্রচিত্তে এক কঠিন তপস্যা।'

'কিন্তু, কাবা শরীফেও যে নোংরামি, অনাচার, ব্যাভিচার চলত, এ খবর দিয়েছে তোকে কোন সে নাস্তিক কিতাব।' রাগের দাপটে, ঘন ঘন মাথার সবুজ ফেজটা একবার খুলছেন একবার পরছেন সের আলি।

'কেন? আরবের ইতিহাস পড়লে তো আপনিও জানতে পারবেন—হজরত-মুহম্মদ-পূর্ব্ব কাবাতে কী বীভৎস কী কদর্য্য কাজ সব চালাতো ধর্ম্মের নামে। কেবল পৌত্তলিকতা নয়, দেবদেবীর নামে পশুবলির রক্তে ভেসে যেতো কাবা তখন, কত যে নরবলি হয়েছে ঐ কাবা মন্দিরে একসময়ে তার হিসেবও কি কেউ রাখতে পেরেছে ইতিহাসে?'

'কি? নরবলি? কাবাতে হত নরবলি? এতবড় কুৎসা রটাচ্ছিস পবিত্র কাবার নামে?'

'নরবলি হত না? আপনি কি জানেন না—হজরত মুহম্মদের পিতামহ আবদুল মতালেবকে পর্য্যন্ত বলি দেবার আয়োজন হয়েছিল ঐ কাবাতেই। তখন তিনি একশো উষ্ট্রী বলীর জন্যে দান করে তবে রক্ষা পেয়েছিলেন সে যাত্রায়।'

'ওঃ, অসহ্য।' হাতের ফেজটা ঝাঁ করে মাথায় চাপিয়ে, ক্রোধ কম্পিত শরীরে উঠে দাঁড়ালেন এবার সের আলি। প্রচণ্ড গর্জনে ঘরটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন ঘর থেকে বের হবার আগে, 'কাবা সম্বন্ধে আর একটা কথাও উচ্চারণ করবি নে তুই শয়তানী। কাবাতে হত পশুবলি? কাবাতে মানুষকে পর্যন্ত বলি দেওয়া হত? কাবাতে বলি দেবার উদ্যোগ করা হয়েছিল, এমন কি, হজরতের পিতামহকেও? এইসব কুৎসিৎ কথা আপনি সহ্য করছেন প্রফেসার সাহেব।'

'অসহ্য আমিও হয়ে উঠেছি সের আলি খাঁ—আপনার মেয়ে বয়সী এক শিক্ষিতা, নম্র, ভদ্রমহিলার প্রতি আপনার ঘৃণ্য আচরণে।' মনে হল—কালবৈশাখীর মেঘ গুরু গুরু করছে যেন রহিমদিল খাঁর কণ্ঠে। এমনই কঠোর, এতই রূঢ় সে-স্বর। 'আপনি আমার বাড়ীতে বসে আছেন, তাই আপনি এখন আমার মেহমান। আর কেবলমাত্র সেই জন্যেই সহ্য করেছি এতক্ষণ আপনার আশ্চর্য্য অসভ্যতা, আর দুর্ব্বিনীত বেয়াদবি। আমারই সামনে বসে আপনি আমারই পরম স্নেহের পাত্রীকে বলেন কিনা বৎমিজ, শয়তানী?

'বটে? আপনিও ঐ মেয়ের হয়েই আমায় চোখ রাঙাচ্ছেন প্রফেসার? ঠিক আছে,

আমি চললাম এই পাপের আড্ডা ছেড়ে! চলুন মৌলভী সাহেব!' বলে প্রায় ছুটে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে গিয়ে, ঘরে প্রবেশোন্মুখ কোন এক আগন্তুকের সঙ্গে প্রচণ্ড এক মুখোমুখি ধাক্কা খেয়ে, একটু পেছিয়ে আসতে বাধ্য হলেন গোয়েন্দা-অফিসার। সেই মুহূর্তে দেখা গেল, জয়ন্ত প্রবিষ্ট হচ্ছে ঘরে। সের আলি ধাক্কা খেয়েছিলেন তারই সঙ্গে।

জয়ন্তকে চিনতে পেরেই অগ্নিকাণ্ডের মতন জ্বলে উঠলেন গোয়েন্দা-অফিসার। তারস্বরে চিৎকার করে বললেন—সেদিন দোস্ত মুহম্মদের বাড়ীতে বসে অত করে মানা করেছিলাম তোমকে ঐ বেহায়া মেয়েটির সঙ্গে মিশতে। তবু, এখনো তুমি ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছ ওরই পিছু পিছু? ওকে যা বলে সন্দেহ করছে পুলিশ, তা সত্যি বলে যেদিন নিশ্চিত হতে পারবো, সেদিন আমারই রিভলভারের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে ওর বুক, কোনো প্রোফেসার, কোনো মৌলভী-মৌলনা সেদিন বাঁচাতে পারবে না ওকে—এই বলে দিলাম। বলেই, বিরাটবপু অফিসার মুহূর্তে অন্তর্হিত হলেন তিন ঘোড়া সন্ত্রস্ত, বিব্রত এবং প্রায় হতভম্ব দৃষ্টির সামনে থেকে।

বর্তমান কান্দাহার নগরটি দুইটি নদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগে গড়ে উঠেছে। নদী দুইটির নাম—অরগন্দাব এবং তর্ণক। উভয়ের মধ্যে কান্দাহারের নিকটতর অবশ্য অরগান্দারই। কিন্তু নগরটি একেবারে যে নদীর তীরেই অবস্থিত, তা নয়। নদী এবং নগরের মাঝখান দিয়ে রয়েছে বিস্তৃত এক পর্বতশ্রেণীর বেড়া। তবে ঐ পর্বতমালার একটানা বিস্তৃতির মধ্যে একটি স্থানে বেশ কিছুটা ছেদ থাকায়—নদী আর নগরের সংযোগ একটানা সহজ হয়ে উঠেছে ঐ জনপদের বাসিন্দাদের কাছে। নগরের চারিদিকে গড়খাই। খাদ প্রায় চব্বিশ ফুট গভীর। গড়খাই-এর পর রোদে-পোড়া সু-উচ্চ মৃন্ময় প্রাচীর। প্রাচীরের মাটি রৌদ্রদগ্ধ হয়ে জমাট বেঁধে পাথরের মত হয়ে গেছে। নগরের ছটি ফটক। পূর্বদিকে বারদুবানি ও কাবুলদ্বার, পশ্চিমে হিরাট ও তোপখানা-দ্বার, উত্তরে ঈদগা-দ্বার, আর দক্ষিণে শীকার পুর দ্বার। ছটি ফটক থেকে নগরে ছটি বড় রাস্তা এসে ঢুকেছে নগরের ঠিক কেন্দ্র বিন্দুতে—যেখানে শ্রীকারপুর দ্বার আর কাবুল দ্বারের রাস্তা এসে মিলেছে, সেখানেই অবস্থিত বিরাট চার্সু-মসজিদ। মসজিদটির গম্বুজেরই ব্যাস হচ্ছে প্রায় ১৫০ ফুট। কান্দাহারের প্রত্যেকটি ফটক এবং প্রতিটি রাস্তা থেকেই দেখা যায় ঐ আকাশ ছোঁয়া গম্বুজ। সহরের উত্তর প্রান্তে কেল্লা এবং তোপখানা-মাঠ। মাঠের পশ্চিমে আহ্মদ শাহ দুরাণীর কবর। এই সমাধি গৃহটিও আয়তনে বিপুল এবং উচ্চতাতে পরম দর্শনীয়। পাঁচটি বড় বড় রাস্তা এসে মিশেছে এখানে হিরাট, ঘোর, সিস্তান (ইরাণ), কাবুল এবং ভারতবর্ষ থেকে। তাই ব্যবসা-বাণিজ্য এখানে জম-জমাট।

যে প্রাচীন-গান্ধারের অনুসন্ধানে জয়ন্ত এসেছে আফগানিস্তানে, তার অবস্থিতি কিন্তু এখানকার কান্দাহার নগরের প্রায় চার মাইল পশ্চিমে। চেলজিনাক পর্বতের পাদমুলে। যে গান্ধারের তিন দিকে বিস্তির্ণ সমতলক্ষেত্র এবং একদিকে উচ্চ দূরারোহ

পর্ব্বতশ্রেণী থাকায় গান্ধারবাসীরা একসময়ে মনে করতো—তাদের নগরকে জয় করার সাধ্য কারও নেই। কিন্তু, দুর্ধর্ষ নাদিরশাহ, বহুদিন অবরোধের পরে যেদিন এ-নগর দখল করেছিলেন, সেদিনই চুরমার হয়েছিল এ-নগরের নাগরিকদের এত কালের ধারণা। নিষ্ঠুর লুঠতরাজ চালিয়ে প্রাচীন গান্ধারকে প্রায় ধংস করে, তারই দক্ষিণ-পূর্ব্বে, দুই মাইল দূরে, পর্ব্বত ও জঙ্গল শূন্য পরিস্কৃত সমতল ভূমির ওপর নাদির শাহ নিজের নামে নির্ম্মাণ করেছিলেন এক নতুন জনপদ যার নাম দিয়েছিলেন নাদিরাবাদ। কিন্তু আহমদসাহ আবদালী ঐ জনপদকেও ধংসস্তুপে পরিণত করে, প্রতিষ্ঠা করেন আজকের এই কান্দাহার নগরটিকে—১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে।

প্রায় চারদিন হয়ে গেল জয়ন্তের কান্দাহার বাস। প্রাচীন গান্ধারে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে তার মন। লায়লা নামে যে ছাত্রীটিকে গাইড হিসাবে প্রত্নতাত্ত্বিক ডঃ দোস্ত মুহম্মদ ঠিক করে দিয়েছেন জয়ন্তের কাজে সাহায্য করতে, সে প্রত্নতত্ত্বে কেবল এম. এ-ই, নয়, এখন দোস্ত মুহম্মদের সহায়তাতেই গবেষণা চালাচ্ছে ডক্টরেটের প্রত্যাশায়। রহিম দিল অনুগ্রহ করে জনৈক মেওয়া-ব্যবসায়ীকে পত্র লিখে দিয়েছিলেন। তিনিই তোপখানা-মাঠের অদূরস্থ একটি ইনসপেকশন বাংলোয় দুটি ঘরের এবং সেখানকার কেয়ার-টেকারকে বখশিসের লোভ দেখিয়ে চারবেলা দুইজনের আহারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। দুইজন মানে—জয়ন্ত এবং লায়লার। লায়লাকে জয়ন্তের সঙ্গে পাঠানোর মুখ্য কারণ, সে এই কান্দাহার প্রদেশেরই মেয়ে। জাতিতে দুরাণী। এই প্রদেশেরই অধিকাংশ অধিবাসীই হয় দুরাণী, নয় তো পারসী বা খিলজাই। কান্দাহার, ফরা খেলাতে-ই-খিলজাই, মারুফ—কান্দাহার প্রদেশের এ-সবকটি নগরই লায়লার নখদর্পণে। ঠিক ছিল, জয়ন্ত আগে একাই চলে আসবে কান্দাহার শহরে, লায়লা আসবে দুই-একদিন পরে। কিন্তু চার-চারটে দিন চলে গেল, লায়লার এখনও দর্শন নেই।

মেওয়া-ব্যবসায়ীটির বেশ দাপট আছে কান্দাহার শহরে জয়ন্ত লক্ষ্য করেছে তা। কেনই বা-থাকবে না, শুধু তো কান্দাহারে নয়, কাবুলের কো-দামান আর ইস্তালিফ উপত্যকাতেও তাঁর বড় বড় মেওয়ার বাগান আছে। কান্দাহার শহরের এমন কোন সরকারি কর্মচারী নেই যিনি এই গোলাম হায়দরকে খাতির না করেন। ওঁরই ট্যুরিষ্ট কারে প্রাচীন গান্ধারে যাওয়ার কথা পাকা হয়ে আছে, কিন্তু গাইডেরই পাত্তা নেই। তোপখানার মাঠে বসে, সেদিন সকালবেলা মনে মনে ক্রমেই অধীর হয়ে উঠে জয়ন্ত যখন ভাবতে শুরু করেছে যে, গোলাম হায়দরকে অনুরোধ করে এখান থেকেই কোন গাইড নিয়ে কালই সে যাত্রা করবে প্রাচীন গান্ধারের পথে, ঠিক তখনই, কালো ঝক ঝকে একটি সুদর্শন ভ্যান এসে দাঁড়ালো অদূরে, আর তা থেকে লাফিয়ে নেমে, ছোট মেয়ের মত উল্লাসে আমরা এসে গিয়েছি, আমরা এসে গিয়েছি বাঙ্গালীবাবু' বলতে বলতে ভীষণ বেগে দৌড়ে এসে হাজির হল গান্দারি পেছনে তার লায়লা।

জয়ন্ত অবাক। গান্দারির আসার তো কোন কথাই ছিল না! অনুযোগের সুরে লায়লা বলল—'ওর জন্যেই তো দেরী হল আসতে আমার।'

'হ্যাঁ, আমার জন্যে না আরও কিছু! না বাঙ্গালীবাবু, ওর কথা বিশ্বাস কোরো না। দেরী হল দোস্ত মুহম্মদ-চাচার জন্যে।' কপট ক্রোধে চোখ পাকিয়ে তাকালো একবার লায়লার দিকে গান্দারি।' তারপর আবার বলল, 'কিছুতেই আসতে দেবে না আমাকে ওর সঙ্গে। ওর ঐ একই যুক্তি, আমি নাকি প্রত্নতত্ত্বের ছাত্রী নই, অতএব আমি তোমার কাজে কোন সাহায্যে লাগবো? দুইদিন ধরে সাধ্য-সাধনাতেও যখন মুহম্মদ-চাচাকে টলানো গেল না কিছুতেই, তখন, আব্বাজানকে দিয়ে টেলিফোনে তাঁকে অনুরোধ করিয়ে, তাঁর অনুমতি পেয়ে, তবে আসতে পেরেছি। এখন তুমিই বিচার করে বলো, দেরী হওয়ার জন্যে দোষ কার? আমার, না মুহম্মদ চাচার। ইনসাফ চাই কিন্তু!'

এবার হেসে ফেলল জয়ন্ত। বলল, বেশতো, যখন এসেই পড়েছেন, তখন লায়লা আর আপনি ইনসপেকশন বাংলার একই ঘরে থাকবেন। আমাদের নামে দুখানি মাত্র ঘর তো!'

'ওব্বাবা, যা হিংসুটি মেয়ে ঐ লায়লা! ও যদি ওর ঘরে আমায় থাকতে না দেয়, তবে আমি বারান্দাতেই পড়ে থাকবো, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি যাবোই।' লায়লা আর জয়ন্ত একই সঙ্গে হেসে উঠল মেয়েটার কথার ঢং-এ।

'এমন চমৎকার ভ্যানটি আপনারা জোগাড় করলেন কোথা থেকে? জয়ন্ত প্রশ্ন করলো লায়লাকে। লায়লা জানালো—ভ্যানটি গান্দারির আব্বাজানের। উনি তো নামজাদা রত্ন ব্যবসায়ী। আফগানিস্তানের সুপ্রসিদ্ধ রত্ন ল্যাপিস লাজুলির কিছু অর্ডার দিয়েছিলেন কান্দাহারেরই এক ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁর কাছে সেই রত্নগুলি পৌঁছে দেবার জন্যে ভ্যানটার এখানে আসার কথা ছিল আগে থেকেই। গান্দারির আসা যখন ঠিক হয়ে গেল, তখন মুস্তাক কামাল নিজেই বলে দিলেন ড্রাইভারকে—তাকে আর গান্দারিকে কান্দাহারে পৌঁছে দিতে। আর সেই সুবাদেই কাবুল থেকে দীর্ঘ ৩৮০ মাইল পথ অতিক্রম করে এখানে আসতে কোন কষ্টই হয় নি তাদের।

'ভ্যানটি তো ফিরে যাবে কাবুলে এখনই?'

গান্দারি বলল, 'আব্বাজান বলে দিয়েছেন, তোমার যদি কাজে লাগে এ-গাড়ী, তাহলে ওটা তিন-চারদিন তোমার কাছেই থাকবে।'

'না, না, অতবড় ভ্যানের কোনই দরকার হবে না আমাদের। গোলাম হায়দর সাহেব একটা ছোট ট্যুরিষ্ট কারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন আমাদের ব্যবহারের জন্যে। ওটাতেই কাজ চলে যাবে ভাল রকম। এই বলে, একটু থেমে সে লায়লাকে অনুরোধ জানালো গান্দারিকে নিয়ে ইনসপেকশন বাংলোয় যেতে। গান্দারি বলে উঠল—'আরে, আমরা তো ইনসপেকসশন বাংলো হয়েই আসছি! ওখানকার কেয়ারটেকারই তো আমাদের বলে দিল—তুমি তোপখানার মাঠে একা এসে বসে আছো।'

লায়লার রমণী মন। প্রথম থেকেই সে লক্ষ্য করছে, গান্দারি তার চেয়েও বয়সে বড় এক বিদেশী যুবককে ক্রমাগত তুমি-তুমি করে কথা বলছে। অথচ যুবক কিন্তু আপনি বলেই সম্বোধন করছে গান্দারিকে। কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকল এটা। 'সে তো ভাল কথা, জয়ন্ত বলল লায়লাকে—'কেয়ারটেকারের সঙ্গে যখন পরিচয় হয়েই গেছে আপনাদের তখন ওকে গিয়ে বললেই ও ঘর খুলে দেবে আপনাদের। মাল-পত্র রেখে, স্নানটান সেরে নিন। আপনারা। অনেকটা পথ এসেছেন, একটু বিশ্রাম নেওয়াও তো দরকার, আমি যাচ্ছি একটু পরেই।'

'খাবো কিন্তু সবাই একসঙ্গে, সেটা মনে রেখো' গান্দারি জানিয়ে রাখলো।

মেয়ে দুটি ভ্যান চেপে চলে যাওয়ার পরেই, জয়ন্তের মনে একরাশ ভাবনা এসে ভীড় করলো। এত করে সকলে নিষেধ করা সত্ত্বেও, কেন এলো গান্দারি জিদ ধরে এই কান্দাহারে? একটু ইউরোপীয়ান-ঘেষা চরিত্র মুস্তাক-কামালের, সেটা নজর এড়ায়নি জয়ন্তের। বেঁটে খাটো, স্বাস্থ্যবান, ফর্সা গায়ের রং। মাথার পেছনে এবং দুই কানের পাশ ছাড়া সমস্ত মাথা কেশহীন। তুর্কী রক্ত তাঁর শিরায় ধমনীতে। ল্যাপিস লাজুলির মত বিশ্বাবিখ্যাত রত্নের তিনি অন্যতম প্রধান ব্যবসায়ী, তবু অত্যন্ত বিনয়ী এবং হৃদয়বানও যে তিনি, তার পরিচয় পেয়েছে জয়ন্ত ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রথম দিনেই। গান্দারির সামান্য অস্বাচ্ছন্দ্য বা কষ্টও অসহনীয় ঐ বিত্তবান মানুষটির কাছে। যখন যে বস্তুর প্রয়োজন হয় গান্দারির, বলার সঙ্গে সঙ্গে তা আনিয়ে দেন পালিত কন্যাটির হাতে। তবু, আশ্চর্য্য! গান্দারি উটের পিঠে চেপে ফেরে মোঘল সম্রাট বাবরের কবর থেকে, খচ্চরের পিঠে একাই চলে আসে এই কান্দাহারে। অথচ, একবার মুখের কথা খসালে তার ব্যবহারের জন্যে গাড়ী ড্রাইভার—পরিচারিকা খাবারদাবার সর্ব্বদাই প্রস্তুত। মুস্তাক-কামাল স্বয়ং সেইরকম হুকুম দিয়ে রেখেছেন নিজগৃহের প্রত্যেককে।

কেন এই অদ্ভুৎ আচরণ মেয়েটির? মুসলমানের মেয়ে সংস্কৃত শিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে কেন? বিধর্মী-হিন্দুর বেদ-পুরাণ শাস্ত্র এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়ায় এত আগ্রহ কেন ওর? যেখানে যায়, সেখানেই এই বিংশবর্ষীয়া উদ্ভিন্ন-যৌবনের রূপের ছটা মুগ্ধ করে, প্রলুদ্ধ করে তোলে সহস্র পথচারীর দৃষ্টিকে। কিন্তু গান্দারির যেন ভ্রূক্ষেপও নেই এসব দিকে। দুরন্ত দুর্ব্বার ওর জিজ্ঞাসু হৃদয়। উন্মত্তের মতন কিসের অনুসন্ধানে সব সময়েই যেন ব্যস্ত ওর মন। আর, সেই কারণেই বোধ হয়, নিজের রূপ-লাবণ্যের প্রতি তার এমন অসচেতনা—যেটা ওর বয়সী যে কোন মেয়ের পক্ষেই স্বাভাবিক নয়।

যেদিন উটের পিঠে সওয়ার হয়ে বাবরের কবর থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের মুখে পুল-ই কিস্তির ওপর তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, লাফ দিয়ে উটের পিঠ থেকে নেমে ছুটে এসেছিল তার কাছে, সেদিন তার বলা একটা কথা বারবার প্রশ্নের তুফান তুলেছে জয়ন্তের অন্তরে। বাবর কাফিরিস্তানের লোকেদের মদ্যপ্রিয় বলে নাকি উল্লেখ করে

গেছেন ইতিহাসে, আর কেবলমাত্র তারই প্রতিবাদ জানাতে মেয়েটি নাকি প্রায়ই যায় বাবরের সমাধিস্থলে। কাফিরিস্তানের মানুষদের নিন্দাবাদে কেন চঞ্চল হয়ে ওঠে গান্দারির প্রাণ? কাফিরিস্তানের অধিবাসীদের প্রতি কেন ওর এত মমত্ববোধ? কোথায় এই কাফিরিস্তান—যার নামও শোনেনি জয়ন্ত এখানে আসার আগে? কারা বাস করে ঐ কাফিরিস্তানে? ধর্মে তারা কি? কোন ভাষায় কথা বলে তারা? এইসব প্রশ্নের বোঝা মাথায় নিয়ে, জয়ন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক ডঃ দোস্ত মুহম্মদের শরণ নিয়েছিল কয়েকদিন আগে। তার প্রশ্ন শুনে, প্রত্নতাত্ত্বিক বিস্ময় বিহ্বল চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন তার দিকে মিনিট তিন। তার পরেই পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন তিনি—'হঠাৎ কাফিরিস্তানের কথা জিজ্ঞেসা করছো কেন বলো তো?'

উত্তরে, জয়ন্ত পুল-ই-কিস্তিতে দাঁড়িয়ে গান্দারি যে কথাগুলো বলেছিল—তার সবই বলে গিয়েছিল একের পর এক। সব শুনে, প্রবীণ মানুষটি কিছুটা আপন মনেই বিড় বিড় করেছিলেন—'কাফিরিস্তানের নিন্দা করেছিলেন বাবর, সে কথা ঐ মেয়েটি জানলো কোত্থেকে? আর জেনেও যদিবা থাকে কোন কিতাব থেকে, তাতে ওর গায়ে জ্বালা ধরবে কেন?'

সেদিন অনেক চেষ্টা করেও কাফিরিস্তান সম্পর্কে ডঃ মুহম্মদের কাছ থেকে কিছুই প্রায় জানতে পারেনি জয়ন্ত। উনি কেবল বলেছিলেন, কাফিরিস্তানের নামটুকুই শুনেছি এখানকার কিছু প্রাচীন লোকের মুখে। শুনেছি, আফগানিস্তানের সীমানায় যে আলীসাঙ্গ নদী, তারই ওপার দিয়ে যেতে হয় ঐ দেশে—মুসলমানদের সঙ্গে ওখানকার মানুষদের নাকি অহিনকুল সম্পর্ক। কোনও মুসলমানকে কাছাকাছি পেলে, তারা তার জীবন নেবেই। আর, এই কারণেই মনে হয়, ঐ দেশের চার পাশের মুসলমান রাজ্যের বাসিন্দারা, ওদেশের নাম রেখেছে কাফিরিস্তান। অর্থাৎ ঐ দেশের লোকেরা সব কাফির বা বিধর্মী।'

ব্যাস ঐ পর্য্যন্তই। এর চেয়ে বেশি আর কিছুই বলতে পারেননি দোস্ত মুহম্মদ। সেই প্রথম দিনে সের আলির সামনে বসে কাফিরিস্তান সম্বন্ধে যেটুকু বলেছিলেন, দ্বিতীয় দিনেও প্রায় সেই কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি। এতে জয়ন্তের জানার পিপাসা আরও বেড়েই গিয়েছিল কেবল, মেটেনি এতটুকু।

নিজে মুসলমান হয়েও, এক মুসলমান যুবতীর ওপর এত আক্রোশই বা কেন সের আলীর? কেবলই প্রশ্ন তুলছেন তিনি—মেয়েটি আফগান তো? অথচ, রহিমদিল সেদিন হাসতে হাসতে বলেছিলেন—'সি. আই. ডি-অফিসার সের আলি যখন প্রশ্ন করেন—মেয়েটি আফগান তো? তখন আমার হাসি পায়! নিজের শিরায় উপশিরায় যে রক্ত বইছে, তার খোঁজ তো ভাল রকমেই জানা আছে ওঁর। তেমন সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখতে গেলে, সের আলিকেই কি আফগান বলা চলে? ওঁর পূর্ব্ব পুরুষ তো এসেছিলেন সিস্তান (পারস্য) থেকে। আবার সেদিন, প্রফেসার রহিমদিলের বাড়ীতে সেই মুখোমুখি

ধাক্কা লাগার মুহূর্তে সের আলির সেই পৈশাচিক ঘোষণা—পুলিশের সন্দেহ যদি সত্যি হয়, তাহলে তাঁরই রিভলভারের গুলিতে একদিন ঝাঁঝরা হয়ে যাবে গান্দারির বুক।

এসব কী কাণ্ড চলেছে অনন্যা রূপসী, পরম ধার্ম্মিকা, অবিশ্বাস্য রকমের এক উজ্জল তরুণীর প্রতিভাকে কেন্দ্র করে? কেন এত সন্দেহ করে পুলিশ ওকে?

এই রকম নানান চিন্তায় মনটা যখন উথাল—পাতাল জয়ন্তের, প্রায় তারই বয়সী এক যুবক এসে অভিবাদন জ্ঞাপন করলো তাকে।

পাক্কা ইউরোপীয়ান সাজে সজ্জিত, বেশ স্বাস্থ্যবান। নেকটাই, ওয়েস্ট কোট, কোট, এমন কি হেটটা পর্য্যন্ত মাথায় বসানো বেশ কেতা দুরস্তভাবে। ইংরেজীতেই শুধালো—আমি কি বসতে পারি তোমার পাশে কিছুক্ষণ?'

'বসুন না।' জয়ন্ত ভদ্রতা রক্ষা করলো। যুবকটির রং ফর্সাই বলা যায়, কিন্তু মুখে বসন্তের দাগ থাকায় মুখটা কেমন যেন কিছুটা কালচে।

পকেট থেকে সিগারেটের কেস বের করে খুলে ধরলো জয়ন্তের সামনে। জয়ন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে জানিয়ে দিল, ধূমপানে সে অভ্যস্ত নয়।

যুবকটি তাড়াতাড়ি সিগারেট-কেসটা পকেটে আবার ভরে ফেলে বলল—'তাহলে তো আমারও সিগারেট খাওয়া উচিৎ নয় তোমার সামনে।' বলে, কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করার পর, আসল বক্তব্যের লক্ষ্যে এগুলো—মানে হল।

'প্রাচীন গান্ধারে কি আগামীকালই রওনা হচ্ছেন?' চম্‌কে উঠলেন জয়ন্ত। তার গান্ধার যাত্রার কথা সম্পূর্ণ অপরিচিত অদৃষ্টপূর্ব এই যুবকটি জানল কেমন করে?

'আমি মেওয়ার কারবারী গোলাম হায়দর সাহেবের বড় ভাই-এর ছেলে। হায়দর সাহেবের কাছ থেকেই জান্‌তে পেরেছি তোমার এখানে আসার উদ্দেশ্যের কথা। যে ট্যুরিস্ট কারটা তোমাকে প্রাচীন গান্ধারে নিয়ে যাবে কাল, সেটিকে ড্রাইভ করতে হবে আমাকেই।'

এতক্ষণে পরিষ্কার হল যুবকের আগমনের কারণটা।

'আপনার বাংলোয় গিয়েছিলাম। গান্ধারি বল্‌ল, আপনি এই ময়দানে আছেন। তাই চলে এলাম।'

'আপনি গান্ধারিকে চেনেন?' আর এক বিস্ময়ের ধাক্কা। কান্দাহারে যে বাস করে, তিন শো আশি মাইল দূরের কাবুলের মেয়ের খবর রাখে সে কি করে?

'আগে তো কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়তাম। সেখানে ওকে চেনে না—এমন তরুণ কি একজনও আছে? গান্ধারি!—এমন অদ্ভুত নামে সারা আফগানিস্তানে আপনি খুঁজে পাবেন না অন্য কোন মেয়েকে।'

বেশ সপ্রতিভ যুবক। কথা-ইংরেজিতে বেশ দখলও আছে বেশ বোঝা গেল। ওর কথা থেকেই আরও জানা গেল—বিজ্ঞানে গ্রাজুয়েট হওয়ার পরে রুশ-দেশে গিয়ে খামারের কাজ শিখে এসেছে। বর্তমানে এখানকার কৃষি-বিভাগেরই একজন অফিসার।

'খুব খুশি হলাম তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে।' জয়ন্ত উঠে দাঁড়ালো, 'তুমিও যে আমাদের সঙ্গী হচ্ছ—এটা খুবই আনন্দের কথা।'

'কিন্তু দেখবেন, ঐ গান্দারি আমার যাওয়াটা পছন্দ করবে না একটুও।'

জয়ন্ত হেসে ফেল্ল। জিজ্ঞেস করলো—কেন?

'কারণটা ওই বেশি জানে, ওকেই জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন। অসম্ভব সুন্দরী তো! তাই দেমাক একটু বেশি। কিন্তু আমার ওকে খুব ভাল লাগে।'

কোনোরকম দ্বিধা না করে—নিজের মনের কথা খুলে বল্ল যুবকটা। তারপর একটু থেমে, আবার বল্ল, ঐযযা! আমার নামটাই তো এখনো বলা হয় নি আপনাকে। আমার নাম আমানুল্লা খাঁ। আচ্ছা, চলি এখন তবে! আসছে কাল সকাল সাতটায় তৈরী হয়ে থাক্‌বেন, আমি আসবো গাড়ী নিয়ে।' 'চারজনকে ধরবে তো ট্যুরিস্ট কারে?

'নিশ্চয়ই ধরবে। গাড়ীটা ফোর সীটারই!' বল্‌তে বল্‌তে যুবক চলে গেল চাসু মসজিদের দিকে দ্রুত পায়ে।

জয়ন্তও ইনসপেকশন বাংলোর দিকে যাবে বলে এগুতে যেতেই, অদূরে চামড়ার কেসে ভরা একটা কার্ডের মতন কী যেন পড়ে থাকতে দেখে, সেটাকে তুলে নিয়ে তার ওপর চোখ বুলোতেই একেবারে কণ্টকিত হয়ে উঠল এক অজানা আশঙ্কায়। চামড়ার মত দেখতে হলেও কেসটা আসলে প্লাষ্টিকের। চার পাশটা কালো প্লাষ্টিকের ফ্রেম, মধ্যেখানে (Identity card) আইডেনটিটি কার্ডটা স্বচ্ছ প্লাষ্টিকের নীচে চক চক করছে। তাতে ছাপা অক্ষরে লেখা—আমানুল্লা খাঁ, ক্রিমিন্যাল ইনভেষ্টিগেশন ডিপার্টমেণ্ট, কান্দাহার। এও সি. আই. ডি'র লোক?

মনে হয়, পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করবার সময়ই কোনরকমভাবে বাইরে এসে পড়েছিল ঐ কেসটি—আমানুল্লার অজান্তে।

যেখান থেকে কার্ডটা তুলে নিয়েছিল জয়ন্ত, সেখানেই আবার ফেলে রেখে, ধীর পায়ে, চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে—যাত্রা করলো সে ইনসপেকশন বাংলোর দিকে। কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পরই দেখতে পেলো—প্রায় দৌড়তে দৌড়তে ফিরে এসে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক খোঁজার পর, কার্ডটিকে তুলে নিয়ে, আবার দৌড়তে দৌড়তেই ফিরে গেল গোলাম হায়দারের ভ্রাতুষ্পুত্র। একটু পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন বলেই কি কার্ডটার পস্তুর বদলে ইংরাজী হরফ ছাপা হয়েছে?

বাংলায় ফিরতেই গোলাম হায়দর গাড়ী থেকে নেমে হাত বের করে এগিয়ে এলো জয়ন্তের দিকে। তারপর, তার হাত দুখানা চেপে ধরে শুধালো—'কোন কষ্ট হচ্ছে না তো ভাইসাব?'

'না, না—কষ্ট কেন হবে, আপনি তো কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি রাখেন নি।' 'তবে কালই যাচ্ছেন তো?'

'হ্যাঁ, গাইড যখন এসে গেছেন, তখন আর দেরী করে লাভ কী?'

'তা তো বটেই। কিন্তু, আপনি বলেছিলেন আমার ট্যুরিষ্ট কারটা আপনি নিজেই ড্রাইভ করবেন। এদিকে আমার ভাইপো বায়না ধরেছে সে আপনাদের ড্রাইভ করে নিয়ে যাবে। এ ব্যাপারে আপনার মতামতটা জানবার জন্যেই এলাম ভাইসাব।'

'আপনার ভাইপোর নাম কি?'

'আমানুল্লা।'

'কি কাজ করেন?'

'পুলিশে ভাল চাকরীই করে ও। বেশ শক্তি রাখে দেহে। সঙ্গে পিস্তল থাকে সব সময়। খুব অমায়িক ব্যবহার। ওকে সঙ্গে রাখলে আপনার সুবিধাই হবে মনে হয়।'

গোলাম হায়দর যে সিধেসাদা মানুষ, তা আগেই বলে দিয়েছিলেন রহিম দিল। তিনি যে একটুও বাড়িয়ে বলেন নি সে বোঝা গেল গোলাম হায়দারের কথাতেই। ভ্রাতুষ্পুত্র যে পুলিশের লোক, সে কথা জানিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা করলেন না তিনি। অথচ আমানুল্লা কত বাজে কথাই না বলে গেল। রাশিয়ায় গিয়েছিল খামারের কাজ শিখতে, সেখান থেকে ফিরে এসে কাজ করছে এখন কৃষি বিভাগে!

'কি ভাবছেন, ভাইসাব?' জয়ন্তকে চুপ করে থাকতে দেখে গোলাম হায়দার জিজ্ঞেসা করলেন।

'না, ভাবছিলাম, ট্যুরিষ্ট কার! চার জনের মাত্র বসার জায়গা। আমাদের জিনিস পত্রেই ভরে যাবে ছোট গাড়ীটা। তার ওপর তিন জন তো যাচ্ছিই—'

'কোন অসুবিধা হলে, থাক না। আমানুল্লাকে আমি বুঝিয়ে দেবো এখন। আপনি নিজেই তাহলে গাড়ী চালিয়ে যাবেন—ভাইসাব। আর, সঙ্গে গাইড তো রইলই।'

আমানুল্লা তাঁর মোটর কারে চড়ে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লায়লা আর গান্দারি ছুটে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। দুজনেই বেশ উত্তেজিত মনে হল। ডায়রীর একটি পৃষ্ঠা খোলা অবস্থায় নিয়ে এসেছে লায়লা। জয়ন্তের সামনে সেটা মেলে ধরে সে জিজ্ঞেসা করলে—'দেখুন তো, এই পৃষ্ঠাতে যে কবিতাটি লিখেছে ও, সেটা কোন ভাষায় লেখা।'

'না, না, ও কবিতা তুমি পড়তে পারবে না—আমি মানা করছি। ও কবিতা পড়লে তুমি হাসবে।' বলেই ছোঁ মেরে কেড়ে নিল ডায়েরীটা লায়লার হাত থেকে গান্দারি। 'আপনি আবার কবিতাও লিখতে পারেন নাকি?' জয়ন্ত শুধালো।

'তা তো খুব ভালই পারে, আমি জানি,' গাইড মেয়েটি বলল, 'পস্তুতে, ফার্সিতে, ওর লেখা কত কবিতা পড়েছি কত জার্নালে কলেজের পত্রিকায়। আজ গাড়ীতে আসতে আসতে—আমার সামনেই লিখলো এই কবিতাটা। দেখতে চাইলাম, দেখালো। কিন্তু দেখাবার আগে বলল—আমি যেন আপনাকে না দেখাই এ-কবিতা। জানতে

চাইলাম—কেন? দেখালে কি হয়েছে? ও বলল, এ কবিতায় অনেক ভুল আছে। এটা নাকি ও লিখেছে কোন এক ভারতীয় ভাষায়।'

'ভারতীয় ভাষায়?' বিস্মিত জয়ন্ত গান্দারির দিকে তাকিয়ে বলল, 'দিন তো দেখি, কোন ভারতীয় ভাষায় কবিতা লিখলেন আপনি।'

'না বাঙ্গালী বাবু, এ কবিতা পড়লে তোমার হাসি পাবে। তুমি পড়তে চেয়ো না।'

অনেক পীড়াপীড়ির পরে শেষে, যথেষ্ট সঙ্কোচের সঙ্গে এগিয়ে দিল গান্দারি তার ডায়রীটা জয়ন্তের দিকে। ডায়রীর ওপর দৃষ্টি রাখতেই এক রকম চমকিয়েই উঠল জয়ন্ত। কী কান্ড। কাবুলের মেয়ে চলন্ত গাড়ীতে বসে কবিতা লিখেছে বাংলায়? এও কি সম্ভব?

লায়লা কৌতুহল জ্ঞাপন করলো—'সত্যি নাকি বাবুজী? কবিতার ভাষা কি কোন হিন্দুস্তানী ভাষা?'

'হ্যাঁ। আমার মাতৃভাষা বাংলায় লিখেছে এই কবিতাটি।'

'বাংলা? কই, পড়ুন না শুনি কি লিখেছে ও।'

জয়ন্ত পড়তে আরম্ভ করলো—

> 'ঐ পাহাড় কাহার বাহার তাহার
> খোঁজ কি রাখো?
> ঐ আকাশ-আবাস কিসের আভাস
> জানোই নাকো।'

একবার চোখ তুলে তাকালো জয়ন্ত গান্দারির দিকে। দেখলো লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে, নিজের দুই করপুটে দুই চোখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটা। পাঠে ছেদ পড়তেই ও আবার কাতর স্বরে মিনতি জানিয়ে চলল—দোহাই বাঙ্গালীবাবু, তুমি পড়ো না ঐ কবিতা। ওটা কবিতাই হয় নি। বাংলা ভাষার আমি কতটুকু জানি।'

কিন্তু, তবু, জয়ন্ত থামলো না। সে আবার শুরু করলো পড়া—

> 'ঐ সবুজ সভুজ অযুত অবুঝ
> বোবা গাছে—
> কার অলখ হাতের আলোক ঝলক
> লুকিয়ে আছে?
> ঐ উপল-ভরা ভয়ঙ্করা
> স্রোতের গানে—
> কে জীবনগীতি শোনায় নিতি
> কেউ কি জানে?
> সব আলোয়-কালোয় মন্দ-ভালোয়
> কার সে তুলি—

দেয় অবোধ মনের আঁধার কোণের
কপাট খুলি?
সব প্রীতি-প্রেমে রজত-হেমে
কাহার দ্যুতি?
ঐ লক্ষ তারার অক্ষতে
কার সহানুভূতি?
কেন সসীম হয়েও অসীম পেতে
আকুল তুমি?
কেন সকল পেয়েও সবার চেয়েও
নিঃস্ব তুমি?'

পড়া শেষ করে কিছুক্ষণ স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকল জয়ন্ত এই অপরূপ ছন্দোবদ্ধ এবং গভীর ভাব-সমৃদ্ধ কবিতাটির স্রষ্টার দিকে। তখনো কিন্তু দুই চোখ থেকে হাত নামিয়ে নেয়নি মেয়েটা।

লায়লা বলল—'অর্থ বুঝবার ক্ষমতা তো আমার নেই, কারণ বাংলা ভাষা আমি জানি না। কিন্তু পড়ার সুর থেকেই বুঝতে পেরেছি, ছন্দটা সত্যিই বড় ভালো হয়েছে, না বাবুজী? কোন জবাব দেবার শক্তি তখন ছিল না জয়ন্তের।

তার নিজের কি সাধ্য আছে—পস্তুতে এমন একটি কবিতা লেখার?

সত্যিই এক বিরল প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে বটে এই সদাহাস্যময়ী প্রাণচঞ্চলা তারুণ্যে ভরা মেয়েটি।

অথচ, এই নিরপরাধ নম্রস্বভাবা কবি-প্রতিভার বুক বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা করে দেবার কতই না ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলেছে এর চারিপাশে—ঐ হৃদয়হীন কূটবুদ্ধি সর্ব্বস্ব সের আলি আর আমানুল্লার দল!

মাত্র চার মাইল পথ। বর্তমান কান্দাহার নগর থেকে প্রাচীন গান্ধারের ধ্বংসাবশেষে পৌঁছতে জয়ন্তদের আধঘণ্টার বেশি সময় লাগেনি। কিন্তু আধঘণ্টার মধ্যে গান্দারিকে একটি কথাও বলতে শোনা গেল না। গাড়ী চালাচ্ছিল জয়ন্তই। পেছনের সীটে বসেছিল মেয়ে দুটি। লায়লা গাইডের কর্তব্য করছিল মাঝে মাঝে ইতিহাসের এটা ওটা কথা বলে। কিন্তু এই প্রাচীন গান্ধারকে পুল-ই কিস্তিতে দাঁড়িয়ে যে বলেছিল—গান্ধার তার প্রাণবায়ু, সে ছিল একেবারেই নীরব। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল—সে যেন অন্য এক জগতের মানুষ। মটোরের অপর দুইজন আরোহী যেন তার সম্পূর্ণ অচেনা।

চেলজিনাক পর্ব্বতের পাদদেশে মাইলের পর মাইল জুড়ে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে, মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বৃহত্তর ভারতের সুদূর অতীতের শিক্ষায় সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ, ঐশ্বর্য্যে-বৈভবে প্রসিদ্ধ, শৌর্যে-বীর্য্যে অদ্বিতীয় এক জনপদ।

এ যাত্রায় আফগানিস্তানে আসার একমাত্র উদ্দেশ্যই জয়ন্তের এই প্রাচীন গান্ধারের বুকে দাঁড়িয়ে, এর ভগ্ন স্তুপের অস্তি-মজ্জার মধ্যে কিছু অনুসন্ধান চালানো। সকাল মাত্র সাড়ে সাতটা। গাড়ী থেকে নামতেই জনাচারেক প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের লোক ঘিরে ধরলো জয়ন্তকে। ওদেরই মধ্যে একজন, বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারা, বয়সে বছর চল্লিশ হবে, এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিলে—'আমার নাম আকবর খাঁ। এখানকার আর্কিওলজিক্যাল অফিসের আমিই প্রধান। জনাব গোলাম হায়দরের চিঠি আমি কাল পেয়েছি। যে কোন ব্যাপারে সাহায্য করতে আপনাদের—আমি এবং আমার লোকেরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত।'

জয়ন্ত আকবর খাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে একজন বিশ্বস্ত লোক চাইল, যে ট্যুরিষ্ট কারটা পাহারা দেবে ততক্ষণ, যতক্ষণ না তারা ঐ ধ্বংসস্তুপগুলি দেখে ফিরে আসছে।

আকবর খাঁ জানালেন—সে ব্যবস্থা পূর্বাহ্ণেই করা আছে, ওর জন্যে কোন চিন্তা নেই।

তবে, আগে আর্কিওলজিক্যাল বিভাগে রেষ্ট হাউসে মালপত্র নামিয়ে, প্রাতঃরাশ সেরে নিয়ে, তারপর ধ্বংস-স্তুপ দর্শনে যাওয়াই বোধহয় ভাল হবে। কারণ, যখন এখানে আজ রাত্রিবাসের প্রোগ্রাম আছেই, তখন খুব তাড়াহুড়ো করার তো কোন প্রয়োজন নেই।

প্রাতঃরাশ অবশ্য তিনজনে সেরেই এসেছিল কান্দাহারের ইনস্পেকশন বাংলোতে। তবু, আকবরের কথানুযায়ী মালপত্র রেষ্ট হাউসে রেখে যাওয়াই উচিৎ মনে হল জয়ন্তর। কিন্তু, তা আর হল না। জয়ন্ত এবং লায়লাকে না জানিয়েই, গান্দারি ততক্ষণে অনেকদূর এগিয়ে গেছে ধ্বংসাবশেষের দিকে—একলাই।

অতএব, নিরুপায় জয়ন্ত টুরিষ্টকারটাকে ভালভাবে বাইরে থেকে লক করে, লায়লার সঙ্গে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল গান্দারি যেদিকে চলেছিল, সেদিকে।

ঘণ্টা তিনেক অবিশ্রাম ঘোরাঘুরি করার পর, স্তুপের মাটি খুঁড়ে বের করা একটি আটকোণযুক্ত কুয়োর ধারে, নিঃশব্দে বসল গিয়ে গান্দারি। দেখাদেখি জয়ন্ত আর লায়লাও বসলো। কুয়ার ঠিক পাশে, পাথরের তৈরী বালতির মতন একটি পাত্র রাখা আছে, তাতে লোহার শেকল বাঁধা। বালতির ওপরের দিকের গায়ে দুইধারে দুইটি ছিদ্র। সেই ছিদ্র পথের মধ্যে দিয়েই শেকলটা লাগানো হয়েছে। শেকলটা লাগিয়েছে মনে হয়, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তরফ থেকেই। কুয়োতে উঁকি দিয়ে দেখল জয়ন্ত। জল খুব বেশি গভীরে নেই, বিশ হাতের মধ্যেই হবে। লায়লা গিয়ে বসেছিল গান্দারির পাশে। সে জিজ্ঞেসা করলো—'এখানে বসে পড়লে যে? ক্লান্ত হয়ে পড়েছ বুঝি?

কান্দাহার থেকে যাত্রা করার পর এই প্রথম কথা বলতে শোনা গেল গান্দারিকে। একটু হেসেই জবাব দিল সে—'এখানে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়ালেও ক্লান্তি আসে না আমার। যখনই আসি, এইখানটায় এসে বসি কিছুক্ষণ। তখন আমার সর্ব্বাঙ্গে

শিহরণ জাগে। মনে পড়ে যায়, আমারই মত কত মেয়ে একদিন আলতাপরা পায়ে নুপুরের ঝঙ্কার তুলে, তামা রুপোর গাগরী কাঁখে নিয়ে, আসতো এই কুয়ো থেকে জল নিতে, এসে এইখানে বসতো হয়তো কিছুক্ষণ। তাদের সহেলীদের সঙ্গে, স্বামী পুত্র কন্যাদের নিয়ে আলোচনা করতো। কখনো আবার হয়তো, কোনো তরুণী বধু, কোনো নির্জন সন্ধ্যায় একা চলে আসতো শাশুড়ী ননদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে, জল আনবার ছল করে। তারপর, এখানে, এই আটকোণা কুয়োর পাশে বসে কিছুক্ষণ ফুলে ফুলে কাঁদতো হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে। বর্ষা গেল, শরৎ গেল তবু তার স্বামীতো ঘরে এলো না একবারও! একটা চিঠিও লিখলনা তাকে! তবে কি সে অন্য কোন রূপবতীর প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে, তাকে ভুলেই গেছে একেবারে!'

গান্দারির চোখে মুখে স্বপ্নের ঘোর! ও যেন স্বপ্ন দেখছে ভরা দুপুরে। জয়ন্ত নিজের কাজের দিকে মন দিল এবার। লায়লার দিকে চেয়ে বলল—'বলুন এবার প্রাচীন গান্ধার সম্বন্ধে কিছু। ডক্টরেট হতে চলেছেন। যথেষ্ট পড়াশোনা আছে তো নিশ্চয়ই।'

গান্দারি বাধা দিয়ে বলল, 'একটু অপেক্ষা করো তোমরা। গান্ধারের ইতিহাস আমিও শুনবো। কিন্তু তার আগে, এসো, অনেক পেছনে ফেলে আসা দিনের কুয়োর জল, আমরা, আজকে যারা হেঁটে চলে বেড়াচ্ছি এই পৃথিবীর বুকে, তারা, পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে একবার খাই। তাতে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের আত্মাশান্তি পাবে, শান্তি পাবো আমরাও।' এই বলে, সে শেকলে বাঁধা পাথরের বালতিটাকে ঝনাৎ করে নামিয়ে দিল কুঁওটার মধ্যে এবং পর মুহূর্তে অনায়াসে জলভরা বালতিটা উপরে তুলে, জয়ন্ত আর লায়লাকে আহ্বান জানালো ঐ জল পান করতে। ওরা দুজনেই আপত্তি তুলল। একে অনাবৃত কুয়ো, তার উপর কতদিনের পচা জল—কে জানে। ঐ জল খেয়ে কি শেষে অসুখ বাধাবে তারা?

কিন্তু গান্দারি কোন যুক্তিই শুনলো না। আঁজলা ভরে বালতি থেকে জল তুলে তুলে পরম পরিতৃপ্তিতে সে তা পান করলো। চোখে মুকে জল দিল। হাতের কনুই পর্য্যন্ত ধুলো, পা ধুলো। তারপর, আবার একটা ঢিবির ওপরে বসে পড়ে, বলল—কই, বলো, শুনি প্রাচীন গান্ধারের ইতিহাস।'

লায়লা বলল, 'আগে জানা দরকার—কান্দাহার নামটা এলো কোথা থেকে। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিক হাণ্টার লিখেছেন—কান্দাহার নামটা আলেকজান্দার বা সিকান্দার শব্দের অপভ্রংশ। প্রসিদ্ধ মাকিদন বীর আলেকজান্দার নিজ নামে যে নগরের পত্তন করেন, পরবর্তী যুগে তারই নাম হয় গান্ধার এবং তারও পরে গান্ধার রূপান্তরিত হয় কান্দাহারে। গান্ধার, কান্দাহার দুইটি নামই আসলে সিকান্দার শব্দেরই পরিবর্তিত রূপ।

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করলো 'তাই নাকি? হাণ্টার লিখেছেন এই কথা।'

লায়লা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লো। কিন্তু গান্দারি বলল—'ইউরোপের সাহেবরা আমাদের দেশ সম্পর্কে যা বলবে, তাই মেনে নিতে হবে? আমাদের নিজেদের কি কোন ইতিহাস এমন নেই, যা থেকে আমরা নিজেরাই বলতে পারি—কান্দাহার নামটির উৎপত্তি হল কেমন করে?'

লায়লা বল্‌ল—তেমন কিছু থাকলেও, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়, গ্রহণযোগ্য তো নয়ই। পাশ্চাত্ত্যের ইতিবৃত্তবিদ্‌রা যেমন বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে অনুসন্ধান চালিয়ে এক একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, আমাদের দেশের ইতিহাসকাররা তার ধার দিয়েও যেতে পারে না।'

'কিন্তু, আমি যদি বলি—হান্টার সাহেব ঠিক বলেন নি, তাহলে কি দুঃখ পাবে?' গান্ধারি জিজ্ঞেস করলো।

দুঃখ পাবো কেন। তবে তোমাকে তো প্রমাণ দেখাতে হবে যে হান্টার ভুল বলেছেন।'

'প্রমাণ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সে প্রমাণ পেশ করার আগে, একটা কথা তোমায় বলে রাখি লায়লা—নিজের দেশের সব কিছুকে অমন ছোট করে দেখা ঠিক নয়। ইউরোপীয়ানরা এমন অনেক কিছুই লিখে গেছেন আমাদের ইতিহাস-বিষয়ে, যা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে।'

'দুই একটা উদাহরণ না দিলে, তোমার কথা আমি মান্‌বো কেন? লায়লা বল্‌ল। 'বেশ তো, ছোট্ট কটি ঘটনার কথা শোনো, তাহলেই বুঝতে পারবে আমি ভুল বলেছি কিনা,' গান্দারি বলে চল্‌ল—'ইউরোপীয়ানদের অধিকাংশ বিজ্ঞান-গ্রন্থেই ঘোষণা করা হয়েছিল সারা পৃথিবীতে ইতালীর গ্যালিলিও আর গ্রীসের কোপার্নিকাসই নাকি প্রথম আবিষ্কার করেন যে, সূর্য্য পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে না, পৃথিবীই সূর্য্যের চারধারে ঘুরছে। একথা যে কতবড় পক্ষপাতপূর্ণ তা হিন্দুস্থানের প্রাচীন ইতিহাস পড়লেই বুঝতে পারবে। গ্যালিলিও-কোপার্নিকাস তো সেদিনের লোক' মাত্র ক'বছর আগে কোপার্নিকাসের জন্মের পঞ্চশত বর্ষপূর্তি উৎসব সম্পন্ন হল। অর্থাৎ মাত্র পাঁচশো বছর আগে জন্মেছিলেন কোপার্নিকাস; কিন্তু হিন্দুস্তানের সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আর্য্যভট্ট ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে জন্মেছিলেন মগধের রাজধানী পাটুলীপুত্রে। অর্থাৎ কোপার্নিকাসের আরও এক হাজার বছর আগে। সেই আর্য্যভট্ট সংস্কৃত শ্লোকে কঠিন জ্যোতির্বিদ্যার বহু জটিল সিদ্ধান্তই লিখে গেছেন তাঁর গীতিকাপাদ, গণিতপাদ, কালক্রিয়াপাদ আর গোল পাদে। তিনিই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন—পৃথিবী স্বীয় মেরুদন্ডের চারিদিকে আবর্তন করতে করতে সূর্য্যকে করছে প্রদক্ষিণ। এই আবর্তন এবং প্রদক্ষিণের নাম তিনিই দিয়েছিলেন আহ্নিকগতি আর বার্ষিকগতি। এখানে দ্যাখো ইউরোপীয়ান ইতিবৃত্তকাররা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে কেমনভাবে ইতিহাসের সত্যকে বিকৃত করেছেন। আমার তো মনে হয়, চন্দ্র এবং সূর্য্যগ্রহণ সম্বন্ধেও আর্য্যভট্ট যা

লিখে গেছেন, তাও সাদরে গ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন সুধী-সমাজ। কারণ, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত রঘুবংশ-কাব্যের চর্তুদশ অধ্যায়ের চল্লিশতম শ্লোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মহাকবি কালিদাস এক উপমার মধ্যে লিখেছেন—যা আসলে পৃথিবীর ছায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তাকেই সাধারণ লোকে অকলঙ্ক চন্দ্রের কলঙ্ক জ্ঞান করে থাকে।'

লায়লা ঠোঁটটা একটু বেঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বল্‌ল—'মুখার্জি সাহেবকে খোসামোদ করতে হিন্দুস্তানের জয়গান করা হচ্ছে? ভুলে যেয়ো না হিন্দুস্তান আমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের গোলামি করেছে দীর্ঘ বছরের পর বছর। সেই আমাদেরও পরাভূত করে শিক্ষায়-শিল্পে-বিজ্ঞানে সংস্কৃতিতে অনেক উচ্চমানের যে-জাতি হিন্দুস্থানকে পায়ের নীচে দাবিয়ে রেখেছিল দুশো-আড়াইশো বছর, সেই ইংরেজ জাতিরই একজন মাননীয় ঐতিহাসিক হচেছন হান্টার। তিনি লিখবেন কান্দাহার সম্পর্কে ভুল কথা?'

জয়ন্তের কানেও লায়লার কথা বলার সুর এবং বিশেষ করে ঐ 'খোসামোদ' শব্দটার ব্যবহার অত্যন্ত খারাপ লেগেছিল, সে ভেবেছিল, গান্দারিও এর জবাব দেবে উত্তপ্ত হয়েই। কিন্তু গান্দারির মধ্যে উষ্ণতায় কোন চিহ্নই দেখা গেল না। সে বলল,- 'কান্দাহার আলেকজান্দার বা সিকান্দারের অপভ্রংশ কখনই নয়।'

'তুমি কি হান্টারের চেয়েও বড় ইতিহাসবিদ?'

'তা হয় তো নই। কিন্তু ভুল মানুষ মাত্রই করে, হান্টারও ভুলই করেছেন। আলেকজান্দার এদেশ আক্রমণ করার বহু আগে, ঋকবেদ, অথর্ববেদ তৈরী হয়েছিল, একথা অস্বীকার করতে পারবে না কোন ঐতিহাসিকই। সেই ঋকবেদে, অথর্ববেদে (৫/২২/১৪) গান্ধারি নামে একটি জনপদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবার ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭/৩৪), শত পথ ব্রাহ্মণ (৮/১/৪/১০), ছান্দোগ্যোপনিষ (৬/১৪/১), অথর্ব পরিশিষ্ট (৫৬), রামায়ণ (৪/৪৩/২৪), মহাভারত, হরিবংশ এবং পানি-নি সূত্রে ঐ গান্ধারি জনপদকেই বলা হয়েছে গান্ধার। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে গান্ধার সিন্ধুনদের পশ্চিমে অবস্থিত। সেই গান্ধার শব্দের অপভ্রংশই হচ্ছে আজকের কান্দাহার।'

'সিন্ধুনদের পশ্চিমে তো কত দেশই আছে, কেবল কান্দাহার তো নয়!' লায়লা বল্‌ল।

'তা থাকলেও, এই গান্ধারের মধ্যে দিয়েই যে কুভানদী অর্থাৎ আজকের এই কাবুল নদী প্রবাহিত, সেকথাও তো আমরা ঋক-সংহিতাতেই পাচ্ছি। আবার ঋক সংহিতাই বল্‌ছে, এক জায়গায়-সর্ব্বমস্মি রোমশা গান্ধারীণামিবাবিকা (১/১২৬/৭) (আমি গান্ধার দেশীয় মেষীর মত লোমপূর্ণা ও পূর্ণাবয়বা)। আজও আফগানিস্তান লোমশ-ভেড়ার জন্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। সুতরাং এখন তো বেশ বুঝতে পারছো আলেকজান্দারের অনেক আগেই এতগুলি প্রাচীন শাস্ত্রে যে জনপদকে গান্ধার বলা

হয়েছে, আজকের কান্দাহার সেই বিশাল গান্ধারের একটি ছোট্টো ভগ্নাংশ, এবং এই নামটা ঐ গান্ধার নামেরই অপভ্রংশ।'

জয়ন্তের কাছে গান্দারি-রহস্য ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে। ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্যোপনিষৎ, অথর্ব্ব পরিশিষ্ট, পাণিনিসূত্র—এই সব প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের লাইন তুলে তুলে প্রমাণ দিচ্ছে যে হান্টার ঠিক বলেন নি। তবে ঐ গ্রন্থগুলি কি ওর কণ্ঠস্বর? একটু আগে আর্য্যভট্টের কথা বলতে গিয়েও গান্দারি আর্য্যভট্ট রচিত যে বইগুলির নাম উচ্চারণ করেছে, জয়ন্ত নিজেও তো সে বইগুলির কোন সন্ধানই জানতো না।

'ভুলে যেয়ো না গান্দারি, ডঃ দোস্ত মুহম্মদ আমাকে গাইড করে পাঠিয়েছেন, তোমাকে নয়।' একটা ভিন্‌দেশী যুবক অনুসন্ধানীর চোখে গান্দারির চেয়ে জ্ঞানে ছোট বলে প্রতিপন্ন হতে রাজী নয় যুবতী লায়লা।

'তা তো ভালভাবেই জানি ভাই,' গান্ধারি জানালো, 'কিন্তু তুমি ভুল বললে, বাঙ্গালী বাবুও তো ভুল জেনে বসে থাকবে। ও তো গবেষণার জন্যেই এসেছে, ও তো কেবল সাইট-সীয়ার হয়ে আসেনি।'

জয়ন্ত দুই তরুণীর বিতর্কে ছেদ টানতে সচেষ্ট হল। বলল, 'আপনি বলে যান মিস্ লায়লা, আমি শুনছি।'

লায়লা বেশ খুশি হয়ে উঠল বলে মনে হল। গান্দারির দিকে আড়-চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে সে গাইডের কাজ আরম্ভ করলো পুনরায়—প্রাক্-ইতিহাস যুগে এই অঞ্চলে যে একটা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, আমরা, প্রত্নতাত্ত্বিকরা তা অস্বীকার করি না। কিন্তু সে সভ্যতার সঙ্গে হিন্দুস্তানের হিন্দুদের কোন সম্পর্ক ছিল বলে আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই।'

'নিশ্চয়ই আছে।' গান্দারি আবার বাধা দিয়ে উঠল, 'মহাভারতে আছে—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধার পতি সুবলের কন্যা গান্ধারির পানিগ্রহণ করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়, ঐ সুবলের পুত্র শকুনি গান্ধারের রাজা ছিলেন। তবে? তবে কেমন করে তুমি বলছো—হিন্দুদের সঙ্গে এখানকার সভ্যতার সম্পর্ক ছিল বলে কোন প্রমাণ নেই তোমাদের কাছে?'

গান্দারির কথা যেন শুনতেই পায়নি কানে, এমনি ভাব নিয়ে জয়ন্তের দিকে চেয়ে বলেই চলল লায়লা—'আলেকজান্দার, চেঙ্গিস খাঁ, বাবর নাদিরশাহ প্রমুখ শাসকরা যে একদিন এদেশ শাসন করতেন, সেকথা ইতিহাসে আমরা পাই।'

'যাঁদের নাম বলছেন, তাঁরা ছাড়া আর কোন রাজা কি শাসন করেন নি এই দেশ—আপনি বলতে চান মিস্-লায়লা?' জয়ন্ত প্রশ্ন করলো।

'করেছেন বইকি, তবে এঁদরে পরবর্তীকালে।' উত্তর দিল লায়লা। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে উঠল গান্দারি—'ওর কথা বিশ্বাস কোরো না বাঙ্গালী বাবু, তোমার

গবেষণার গোড়াতেই গলদ থেকে যাবে তবে। বেশ বুঝতে পারছি, সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন কিছু আধুনিক ঐতিহাসিকের লেখা ইতিহাস পড়ে, ও এইসব যা-তার কথা বলছে। গান্ধারের সত্যিকার ইতিহাস ওর কিছুই জানা নেই। ইতিহাস হচ্ছে সত্য—ঘটনাবলীর ধারাবিবরণী। সে সত্যকে বিচার করতে গেলে, সাম্প্রদায়িকতা আর ধর্মান্ধতার ঠুলীটাকে চোখ থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে সবার আগে। তাই নয় বাঙ্গালী বাবু?'

'সে তো নিশ্চয়ই।' জয়ন্ত সমর্থন করলো গান্দারির যুক্তিকে।

গান্দারি অবশ্য তাড়াতাড়ি বলল লায়লাকে, তুমি কিন্তু আমাকে একেবারে ভুল বুঝবে না, ভাই। তোমার কি দোষ? তুমি এখানকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত ইতিহাসে যা পেয়েছো, তাই বলেছো। প্রাচীন শাস্ত্র পড়ার সুযোগ তো তুমি পাওনি!'

'পাওয়ার দরকারও নেই আমার। আমরা আধুনিক যুগের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাচীন শাস্ত্রে বলা গল্প কাহিনীকে ইতিহাসের আখ্যা দিতেই রাজী নই।' সমস্ত শরীর ঝাঁকিয়ে মুখটা কিছুটা বিকৃত করে কথা কইল হবু ডক্টরেট মেয়েটি।

হাস্‌ল গান্দারি, বলল—'প্রাচীন ইতিহাসকে তো প্রাচীন শাস্ত্র ঘেঁটেই বের করে আনে সত্যিকারের ইতিহাস গবেষক চিরদিন। কিন্তু সে কথা এখন থাক। এসো, আমরা দুইজনে মিলে এমনভাবে সাহায্য করি বাঙ্গালী বাবুর এই অনুসন্ধানকে যাতে, ও যা লিখবে গান্ধার সম্বন্ধে—তাতে যেন কোন সমালোচক কোন ত্রুটি খুঁজে পাবে না কোথাও!'

জয়ন্ত অনুরোধ জানালো এবার গান্দারিকেই—'বেশতো, প্রাচীন গান্ধার বিষয়ে আপনিই বলুন না যা জানেন, তারপর না হয় লায়লা বলবেন।

'আমি তাহলে পুষ্কলাবতী থেকেই আরম্ভ করি বাঙ্গালী বাবু?' গান্দারি শুধালো। খিল্ খিল্ করে বিদ্রুপাত্মক হাসি হেসে উঠল লায়লা—'কান্দাহারের ইতিহাসে এমন অদ্ভুত নাম আমি কোথাও পাইনি।'

'তবু শুনলে ক্ষতি কি? বিষ্ণু পুরাণ আর রামায়ণ বলছে, দশরথপুত্র শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ ভরতের ছেলে ছিলেন পুষ্কর। সেই পুষ্করের নাম অনুসারেই গান্ধারের সেই সময়কার রাজধানীর নাম হয়েছিল পুষ্করাবতী যা পবরর্তী যুগে পুষ্কলাবতী নামে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল (বিষ্ণু পুরাণ—৪।৪ সঃ, রঘু—১৫।৮৯) যখন আলেকজান্দার গান্ধারে আসেন, তখনও এই পুষ্কলবাতী গান্ধারের একটি প্রধান নগর বলে গণ্য ছিল। ঐতিহাসিক আরিয়ণ এসেছিলেন আলেকজান্দারের সঙ্গে, তিনি এ নগরের নাম লিখেছিলেন—Pecukelae টলেমি লিখেছিলেন এ-নগরকে Proklais বলে আর অন্যান্য গ্রীক্ ইতিবৃত্তকারের কলমে এ-নগরেরই নাম কখনো হয়েছে Peukelaotis, কখনও বা Peukelaitis। আরিয়ণ আর লিখেছেন—এ নগর অতিবৃহৎ ও বহু জনাকীর্ণ, সিন্ধুনদের অনতিদূরে অবস্থিত। আলেকজান্দারের আক্রমণের সময়,

আলেকজান্দারের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ্য হেফাস্টিয়ান হস্তীকে পরাজিত এবং হত্যা করে এই পুষ্কলাবতী অধিকার করেন।'

'আচ্ছা, আপনিই বলুন মুখার্জি সাহেব, যদি পুষ্কলাবতী নামে সত্যিই কোন রাজধানী থাকতো গান্ধার প্রদেশের, তাহলে তার একটা চিহ্ন তো কোথাও থাকবে নিশ্চয় এই গান্ধারেরই কোনখানে, কিন্তু সে-চিহ্ন তো খুঁজে পাচ্ছি না কোথাও আমরা।' লায়লা চেষ্টা করলো গান্দারির বলা কথাগুলোর অসারতা প্রমাণ করতে।

গান্দারি বল্‌ল, 'কেন খুঁজে পাচ্ছ না? স্বাত-নদীর তীরবর্তী হস্ত-নগরের (Hasta Nagar) ধ্বংসাবশেষই তো পুষ্কলাবতীর প্রাচীন-কীর্তির নিদর্শন। বৌদ্ধদের আধিপত্যের সময় পুষ্কলাবতী নানাস্তূপে ভূষিত হয়েছিল।' কিছুক্ষণ নীরব রইল গান্দারি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে শেকল শুদ্ধ বালতিটা কুয়োয় নামিয়ে বালতি ভর্তি জল তুলে এনে, আবার গলায় ঢাল্‌লে কিছুটা, কিছুটা মুখে চোখে ছিটিয়ে দিয়ে সে বলল—'এ কুয়োর জল খেয়ে আশ আমার মেটে না বাঙ্গালীবাবু, কি ভাল যে লাগে এই জল!'

'এই আঢাকা কুয়োর পচা জল খেয়ে আপনার অসুখ হয় না কখনো?' জয়ন্ত জিজ্ঞেস করলো। 'পচা জল বল্‌ছ তুমি একে বাঙ্গালীবাবু। এ যে প্রাণদায়ী অমৃত আমার কাছে!' গান্দারি উত্তর দিল, 'তোমাকে বলেছি না কতবার—কান্দাহার আমার প্রাণবায়ু? এখানে এলে আমি সব ভুলে যাই, নতুন এক প্রাণ পাই যেন। তবে, আজকের এই ছোট্ট কান্দাহার দেখে যেন একবারও ভেবো না যে, প্রাচীন গান্ধারও শুধু এইটুকুই ছিল আয়তনে। যে গান্ধারে একদিন সম্রাট অশোকের পুত্র ধর্মবর্ধন রাজত্ব করে গেছেন, যেখানে খৃষ্টীয় প্রথম শতকে, ইউ-চি জাতির অন্যতম গোষ্ঠি কুষাণরা প্রবল প্রতাপে শাসন শুরু করেন এবং যেখানে কুষাণ সাম্রাজ্যের দুর্ধর্ষ রকমের পরাক্রান্ত নৃপতি কণিষ্ক অসংখ্য বৌদ্ধকীর্তি স্থাপনা করেন, সেই গান্ধারের পরিধি ছিল বিশাল। সেই বিশাল গান্ধারকে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ডেকেছেন কি-এন-তো-বেই নামে, উয়াং-চুয়াং (হিউ-এন-সাং) বর্ণনা করেছেন কি-এন-তো-লো বলে। আবার ঐ চীনেরই আর একজন পর্যটক এই গান্ধারেরই অপরএক নামের উল্লেখ করেছেন। সে-নাম, য়ে-পো-লো (অপলাল) (Beal's record of Western Countries–Vol. I. P. XCIX)

জয়ন্ত জান্‌তে চাইল যে, কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল প্রাচীন গান্ধার। গান্দারি বল্‌ল- ফাহিয়েন, সুঙ্গ-যুন, উয়াং-চুয়াং (হিউ-এন-সাঙ)-এর বর্ণনাতে পাই এই সমৃদ্ধ জনপদ তখন বর্তমান কাবুল এবং পেশাবর (Peshwar) পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ তো খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হওয়ার বহু পূর্বেই ঘটেছিল, আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর এই বিরাট দেশের একটা অংশ চলে গিয়েছিল মৌর্য্যদের অধিকারে।'

'ওর কাছেই কেবল জানতে চাচ্ছেন আপনি মুখার্জি সাহেব, অথচ আমি আপনার গাইড হয়ে এসেছি।' ক্ষুণ্ণ-অভিমান প্রকাশ পেলো লায়লার স্বরে। জয়ন্ত ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'শুন্‌বো, নিশ্চয় শুন্‌বো। ওঁর বলা শেষ হলেই আপনি বল্‌বেন।'

'বল্‌বো আর কখ্‌ন? ওযে সব বলেই দিলো!

'আচ্ছ বাবা, আচ্ছা। এবার তুমিই বলো না হয়।' এই বলে, লায়লার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে, জয়ন্তের দিকে চেয়ে কপট কোপ দেখিয়ে বল্‌ল—'আমি কালই তোমাকে বলেছিলাম না বাঙ্গালীবাবু তোপখানা-ময়দানে, ও মেয়ে ভীষণ হিংসুটে?'

গান্দারির কথার সুর আর বাচন ভঙ্গীমার সুযোগ নিয়ে একবার হো হো করে হেসে উঠল জয়ন্ত যাতে লায়লার গুমোট মুখে আবার হাসি ফোটে। কিন্তু সে আশা সফল হল না। বেশ থম্‌ থম্‌ মুখ নিয়েই লায়লা আবার শুরু করলো—সপ্তম শতকে মুসলমানরা গান্ধার আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে, সমস্ত গান্ধারের অধিবাসী ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করলো। এবং তখন থেকেই আরম্ভ হল এ-অঞ্চলের সত্যিকার ইতিহাস। 'আবার ভুল বল্‌ছ লায়লা' গান্দারির বাধা-দান, 'সপ্তম শতকে মুসলমান আক্রমণ শুরু হয় এদেশে, একথা মিথ্যে নয়, কিন্তু মুসলমান-আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গান্ধারবাসী মুসলমান হয়ে গেল—একথা পুরোপুরি সত্যের অপলাপ।'

'কেন? হিন্দু আর বৌদ্ধরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নি?'

'করেছিল। কিন্তু এক সঙ্গে সবাই নয়। সে কথায় পরে আসছি। আগে শুনে নাও গান্ধারের পরবর্তীল রাজধানী পেশাবরের কথা।'

ভয়ঙ্কর ক্ষোভে এবার প্রায় চিৎকার করে উঠল লায়লা, 'পেশাবর কোনদিন গান্ধারের রাজধানী ছিল না মুখার্জী সাহেব।'

'ছিল, লায়লা, ছিল।' শান্ত কণ্ঠে গান্দারি বলল 'চিংতি-অনুবাদিত বসু বন্ধু-চরিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি—গান্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল পুরুষপুর। চীনা-পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ৪০০ খৃষ্টাব্দে এবং সুঙ্গ-যুন ৫২০ খৃষ্টাব্দে এসেছিলেন ঐ পুরুষপুরে। (Beal's Travels of Fa-Hien and sung-yun P.34)। ৬৩০ খৃষ্টাব্দে উয়াং-চুয়াং (হিউ-এন-সাঙ) যখন গান্ধারে আসেন তখনও গান্ধারের রাজধানী ছিল ঐ পুরুষপুরই। উয়াং-চুয়াং (হিউ-এন-সাঙ) লিখেছেন—তখন ঐ পুরুষপুরের (রাজধানীর) বেড় ছিল ৪০ লী বা প্রায় সাড়ে ছয় মাইল। পুরুষপুরকে পো-লু-ষ-পু-লো নামে অভিহিত করে ঐ জায়গার প্রাচীন কীর্তিগুলোর বিস্তারিত ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করেন উয়াং-চুয়াং (হিউ-এন-সাঙ) (S.Jullien's Mem. de, H.T., tl P. 104)। ফা-হিয়েন পুরুষপুরকে ফোলু-ষ বলে লিখেছেন, আর সুঙ্গ-যুন দিয়েছেন বিশদ বিবরণ কনিষ্ক স্তুপের। সেই পুরুষ পুরই আজকের পেশাবর (Peshawar) —সেটা এখন পড়েছে পাকিস্তানের মধ্যে, বুঝলে লায়লা।'

'ছাই জানো তুমি। কাবুল ছিল তখন গান্ধারের রাজধানী।' মুখটা গোঁজ করে লায়লা বলল 'দূর পাগলী, কাবুলকে আফগানিস্তানের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেন তো তৈমুর। শেষ পর্য্যন্ত সাদুজাই বংশীয় সমস্ত অধিপতিই কাবুলে বাস করে গেছেন অবশ্য।'

লায়লার মুখ লজ্জায় অপমানে লাল হয়ে উঠেছে—জয়ন্ত দেখতে পেলো।

গান্দারির ওসব দিকে চেয়ে দেখবারও তখন সময় নেই। যে গান্ধার নাকি তার প্রাণবায়ু, সেই গান্ধারের পুরাকীর্তির কাহিনী শোনাতে সে তখন আপন-ভাবে বিভোর। তাই বলেই বসল, 'আর ঐ যে তুমি বলছিলে লায়লা যে, সপ্তম শতকে মুসলমান আক্রমণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধারের সমস্ত হিন্দু আর বৌদ্ধই ইসলাম ধর্ম্মকে গ্রহণ করেছিল, ইতিহাস কিন্তু তেমনটি বলেনি কোথাও। স্থানীয় ইতিহাস পড়ে আমরা জানতে পারছি—সপ্তম শতকের মধ্যভাগেও এই পেশাবর হিন্দু প্রধান ছিল। এমনকি অষ্টম শতাব্দে, যখন পেশাবর উপত্যকা দিল্লীর হিন্দু সাম্রাজ্য আর আফগান রাজ্যের মধ্যে পড়ে একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়, তখনও আফগানরা হজরত মুহম্মদ-প্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম্মে নিজেদের ধর্মান্তরিত করে নি। তারা তখন হাজারা এবং রাবলপিণ্ডিবাসী গক্কর জাতির ছত্রছায়ায় কাবুল নদীর দক্ষিণ তীরের পার্বত্য প্রদেশে বাস করতো, আর হিন্দুরা রাজত্ব করতো পেশাবর, হস্তনগর, যুসুফজৈ (Yusufjai) -প্রদেশে। পরে, খোরাসাম-অধিপতি সবক্তগীনের পুত্র সুলতান মামুদের চেষ্টাতেই পাঠানরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। সুলতান মামুদ পেশাবর থেকেই বার বার হিন্দুস্তানের ওপর হামলা চালান॥ তাঁর পর, প্রায় একশো বছর এই পেশাবর থাকে গজনীরাজের অধীনে।'

বেলা অনেক হয়েছিল, তাই খিদেও পেয়েছিল জয়ন্তের খুব। তার তো আর গান্দারির মতন কেবল প্রাচীন গান্ধারের কুয়োর জলেই পেট ভরালে চলবে না, কিছু খেতে হবে, অতএব, আর নয়। জয়ন্তের অনুরোধে অপর দুইজনাও রেষ্ট হাউসে ফিরে গিয়ে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে নিল। লায়লা মুখ কালো করেছিল অনেক আগে থেকেই। নামে মাত্র খেতে বসলো সে, খেলো না কিছুই। এসবের কোন কিছুই জয়ন্তের দৃষ্টি এড়ালো না। তার ওপর, খেয়ে উঠে হাসতে হাসতে গান্দারি বলে বসলো—'বলো তো বাঙ্গালী বাবু। লায়লা মুখটা অমন কালো করে বসে থাকছে কেন?'

জয়ন্ত প্রমাদ গুনল। এবার গান্দারি তার সরল মন নিয়ে লায়লা সম্পর্কে কি না কি বলে বসবে হয় তো, আর সঙ্গে সঙ্গে....

যা ভেবেছিল, ঠিক তাই হল। গান্দারি হাসতে হাসতে বলল—'ও যে লায়লা! আরবী ভাষায় লায়লা মানে জানো তো? লায়লা মানে রাত্রি। তাই ওর মুখখানা অমন রাতের অন্ধকারে ভরা। আর, আলি চাচা (সৈয়দ মুজতবা আলি) আমার নাম রেখেছিলেন শবনম। ফার্সিতে শবনম মানে—ভোরের শিশির। আমি তাই সব সময় ঝলমল করি প্রভাতের প্রথম শিশিরের মত।' বলে, ও নিজের কথায় নিজেই হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগলো বিছানায়। আর, সেই মুহূর্ত্তেই, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে লায়লা জানিয়ে দিল, আর এক লহমার জন্যেও থাকতে সে রাজী নয় ঐ নির্লজ্জ, অর্ধশিক্ষিত, দাম্ভিক মেয়েটার সঙ্গে।

বিব্রতভাবে জয়ন্ত বলল, 'সে কি, কোথায় যাবেন একা? আগামীকাল একই সঙ্গে ফিরবো আমরা সকলে।'

কিন্তু, লায়লার কানে সেকথা পৌঁছলো কিনা—বোঝা গেল না! রোষকম্পিত কণ্ঠে সে বলল—'ওর স্বভাব আমি জানি বলেই, ওকে আমার সঙ্গে পাঠাতে বার বার মানা করেছিলাম ডঃ দোস্ত মুহম্মদকে। কিন্তু লক্ষপতির পালিতা কন্যার জিদকেই শেষ পর্য্যন্ত মেনে নিলেন তিনি, আমরা গরীবের মেয়ে, আমাদের কথার মূল্য কতটুকু। তবে, একটা কথা আমি বলে রাখছি, বাবুজী, ও যদি সবসময় হিন্দুস্তান আর হিন্দুদের সব কিছুকেই এমন বড় করে দেখিয়ে, আফগানিস্তানকে ছোট করার চেষ্টা করে, ওর একদিন দুর্গতির আর সীমা থাকবে না।'

গান্দারি তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে এসে হাত চেপে ধরলো লায়লার—'আমার ওপর রাগ করে তুমি কান্দাহারে ফিরে যাবে কেন লায়লা? আমি কথা দিচ্ছি, এরপর যখনই তুমি বাঙ্গালী বাবুর সঙ্গে ঐ ধ্বংসাবশেষে যাবে, আমি যাবো না, এই রেষ্ট হাউসেই থাকবো। তুমি এমনিভাবে চলে গেলে ডাঃ দোস্ত মুহম্মদ আর বাঙ্গালী বাবু—দুজনেই মনে খুব দুঃক পাবে। আমি তোমার কাছে মাফ চাচ্ছি।'

কিন্তু, মুখের কাঠিন্যে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না লায়লার। একরকম জোর করেই গান্দারির হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সব শুনে আকবর খাঁ বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না, ভাইসাব। কান্দাহার তো মাত্র চার মাইল এখান থেকে। আমার পার্সোন্যাল জীপেই মিস লায়লাকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছি কান্দাহারে।' বিপন্ন জয়ন্ত লায়লাকে অনুরোধ করলো, 'বেশ, তাহলে কান্দাহারের ইনসপেকশন বাংলোয় আপনি দয়া করে অপেক্ষা করবেন আমাদের জন্যে। কান্দাহার থেকে আমরা একসঙ্গেই ফিরবো কাবুলে।'

কিন্তু সে অনুরোধও প্রত্যাখ্যাত হল। লায়লা জানালো সে দুরাণী মেয়ে। কান্দাহারে তার জানা আত্মীয়-বন্ধু অনেক। সুতরাং ওখান থেকে কাবুল ফিরবার ইন্তেজাম সে নিজেই করে নিতে পারবে অনায়াসে।

সন্ধ্যার কিছু আগে, ঘরের মধ্যেই এক কোণে বিছানার চাদরটাকে ভাঁজ করে বিছিয়ে, পশ্চিম দিকে মুখ করে বসল গান্দারি তার উপরে। মনে হল, বোধ হয় নমাজ পড়তে বসল সে। কিন্তু, একটু পরেই, চক্ষু মুদে উঠে দাঁড়িয়ে গান্দারি কখনো কানে, কখনো বুকে হাত রেখে বেশ জোরেই যখন আবৃত্তি করে চলল—'তানদ্রে (তেনগ্রি) উলুদুর...' তখন আশ্চর্য্য না হয়ে পারলো না জয়ন্ত। এ কী সব বলছে মেয়েটা? নামাজ পড়ছে তো 'আল্লা হু-আকবর' বলছে না কেন? মিনিট পনেরো পরে গান্দারি চোখ খুলে আবার যখন হাসিমুখে তাকালো জয়ন্তের দিকে, তখন সে জিজ্ঞাসা করলো—'নমাজ পড়লেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'কই, আল্লা-হু-আকবর (ঈশ্বরই মহত্তম) তো বললেন না। একটি আরবী শব্দও তো শুনতে পেলাম না আপনার মুখে?'

'বাঃ, আল্লা-হু-আকবরই তো বললাম, তবে তুর্কি ভাষায়। তুমি জানো না বুঝি—খুব কম তুর্কীই নমাজ পড়ে আরবী ভাষায়? মসজিদ এ তুর্কী মুয়জ্জেন চেঁচিয়ে নমাজ পড়বে সব সময় ঐ তানদ্রে উলুদুর বলেই। আমার আব্বাজান যে রক্তে তুর্কী, তাঁর কাছেই শিখেছি এ নমাজ। তবে, বাবর শাহের সমাধিতে যখন নমাজ পড়ি, তখন কিন্তু আল্লা-হু-আকবর দিয়েই শুরু করি আমি। তখন সমস্ত নমাজটাই পড়ি আরবীতেই।'

'কেন? সেখানে তুর্কীতে পড়েন না কেন?'

'অতবড় মহৎপ্রাণ ছিল যাঁর, তিনি যদি আঘাত পান মনে!'

'সারা জীবন যে মানুষটা কেবল যুদ্ধ বিগ্রহ করে কাটালো, তাঁকে আপনি মহৎ বলেছেন? 'বলবো না? ওঁর সময়ে, ওঁর মত পরধর্ম সহিষ্ণু মানুষ আর একজনও কি ছিল মুসলমান শাসকদের মধ্যে?'

'এ খবর পেলেন আপনি আবার কোন ইতিহাসে?'

'কেন? তুমি বাবর শাহের উইল পড়ো নি বুঝি?'

'বাবরের উইল!'

'হ্যাঁ গো বাঙ্গালীবাবু! প্রফেসর রহিম দিল সাহেব যেবার আমি চাচার (সৈয়দ মুজতবা আলি) সঙ্গে গিয়েছিলেন হিন্দুস্তানের ভূপালে, সেবার সেখানকার ষ্টেট লাইব্রেরী থেকে কপি করে নিয়ে এসেছিলেন প্রথম মোঘল সম্রাট বাবরের উইলটির কিছুটা অংশ। ঐ উইল-এ বাবর তাঁর পুত্র হুমায়ুনের উদ্দেশ্যে লিখেছেন—হিন্দুস্তানে নানা ধর্মের মানুষের বাস। তুমি যে এমন একটি দেশের বাদশা হতে পেরেছো, তার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। সমস্ত ধর্ম্মের প্রতি সমান সম্মান দেখাও। সুবিচার দাও সকল ধর্ম্মের মানুষকে। কোন ধর্ম্মেরই উপাসনা-স্থল কখনো অপবিত্র বা ধ্বংস করবে না।'

'বেশ তো, তিনি পরধর্মসহিষ্ণু মহৎপ্রাণই ছিলেন, না হয় স্বীকার করলাম। কিন্তু, তবু, আপনি কেন যান তাঁর কবরে তাঁরই বিরুদ্ধে শিকায়েৎ জানাতে প্রায়ই?'

'বা-রে, তা কেন জানাবো না? কেন ওঁর নামে—ঐ সব যত বাজে কথা লেখা আছে ইতিহাসে?'

'কোন কথা?'

'কাফিরেরা নাকি গলায় কিং-নামের চামড়ার বোতল মদে পূর্ণ করে, সেটাকে সব সময় ঝুলিয়ে রাখে তাদের গলায়।'

'এ কথা বাবর লিখেছেন?'

'কয়েকজন ঐতিহাসিক তো সেইরকমই লিখেছে। কেন, একথা তো তোমাকে পুল-ই কিস্তিতে দাঁড়িয়েই বলেছিলাম আমি, মনে নেই?'

মনে না থাকার ভান করেই জয়ন্ত পুনশ্চ শুধালো—

'বাবর আর কি লিখেছিলেন কাফিরদের সম্পর্কে?'

'আরও নাকি লিখে গেছেন—কাফিররা জলের বদলে মদ ব্যবহার করে চিরদিন। আমার মন অবশ্য বিশ্বাস করে না, বাবর এমন কথা কখনো লিখে যেতে পারেন।'

'কাফিররা কিংনামের মদের বোতল গলায় ঝুলিয়ে রাখে না?'

'কখনো না।'

সোজা হয়ে বসলো এবার জয়ন্ত ইজি-চেয়ারে।

'কাফিররা জলের বদলে মদ খায় না?'

'কখনো না।' প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল মেয়েটা।

'তবে নিশ্চয়ই আপনি যাতায়াত করেন কাফিরদের দেশে কখনো কখনো।'

উত্তেজিত গান্দারি দিকবিদিক জ্ঞানশুন্য হয়ে বলেই ফেলল—'যাই-ই তো। কেন যাবো না? কাফিরিস্তান যে আমার...' হঠাৎ কথা বন্ধ হয়ে গেল। আর তার পরেই জিভ কেটে, দুই চোখের ওপর হাত তুলে দিয়ে কাঠ হয়ে বসে থাকলো সে।

পদ্মপুরাণ বলছে—শ্রীমদ্ভাগবত টাটকা দুধের মতই খাঁটি। কিন্তু কোন বিষধর সাপ যখন চুমুক দেয় এই দুধেই। তখন সেই দুধই হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর রকমের বিপজ্জনক। মানুষের মনও, মনে হয়, অনেকটা ঐ রকমই। যতক্ষণ তা টাটকা এবং খাঁটি থাকে, ততক্ষণ—তার তুলনা নেই। তা তখন সমাজ-সংসারের সমস্ত গরলকে করে অমৃতে রূপান্তরিত তার পবিত্রতা, উদারতা আর প্রেম-প্রীতি দিয়ে। কিন্তু সেই মনকেই যখন দংশন করে কোন ঈর্ষা, লোভ, ক্ষোভ অথবা বিদ্বেষের বিষধর সর্প, তখন সেই মনই সমাজ-সংসারে সৃষ্টি করে এক প্রলয়ঙ্করী হলাহল, যে হলাহলে জ্বলে পুড়ে নাশ হয়ে যায় কত দেবতুল্য মানুষ, কত শান্তি-সুখের নীড়!

প্রাচীন গান্ধারের ধ্বংসাবশেষে যে ঈর্ষার বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল দুরাণী লায়লার মনের গভীরে, সেই আগুনই প্রতিহিংসার ফণা বিস্তার করে লেলিহান হয়ে উঠল তার হৃদয়ে আকবর খাঁর জীপে বসে কান্দাহারে যেতে যেতে।

কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজে যখন প্রথম ছাত্রী হয়ে প্রবেশ করেছিল লায়লা, তখন থেকেই তার ভাল লেগেছিল তার চেয়ে দুই বছরের সিনিয়র ছাত্র আমানুল্লা খাঁকে। ক্রমে সেই ভাল লাগা যেদিন ভালবাসায় পরিণত হল, সেদিন বিস্মিত লায়লার নারী মন আবিষ্কার করে বসলো, আমানুল্লার দৃষ্টি তার দিকে ততটা নয়, যতটা তার চেয়ে এক বছরের জুনিয়র ছাত্রী লাবণ্যে ঢলোঢল তারুণ্যে টলোমল লক্ষপতি পালিতা তনয়া গান্দারির দিকে। এবং যতই দিন যেতে লাগল, লায়লার কাছে এ-সত্যটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল ততই যে, যতক্ষণ গান্দারির সর্বনাশা রূপ চোখের সামনে থাকবে, ততক্ষণ প্রখ্যাত মেওয়া-কারবারী বিত্তশালী গোলাম হায়দরের ভ্রাতুষ্পুত্র তার দিকে চেয়েও দেখবে না ভাল করে। অথচ সু পুরুষ, স্বাস্থ্যবান, মার্জিতরুচি, সম্ভ্রান্ত ঐ যুবকটিকে সে যদি না পায় তার জীবন সঙ্গী রূপে, তাহলে বাঁচার কোন আনন্দই

থাকবে না আর লায়লার জীবনে। তাই, অবচেতন মনে, ঐ রূপ-দর্পিতা ধন-গর্বিতা গান্দারির সব্বনাশ কামনা করেছিল হয়তো অনেক বারই সে এর আগেও। কিন্তু আজ অবচেতন মনের সেই বিষাক্ত কামনাই সহস্র ধারায় ধেয়ে এসে লায়লার চেতন মনকেও অবিন্যস্ত, বিপর্য্যস্ত, এবং প্রায় বিদ্ধস্ত করে দিয়ে প্রচণ্ড হা হা-রবে যেন জানিয়ে দিতে চাইল—আর বিলম্ব নয়, ষড়যন্ত্রের হাতিয়ারে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দাও ঐ অমিত-রূপবতীর রূপের পেয়ালাকে। লায়লার বিদ্বেষ-জর্জর মস্তিষ্ক সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে পেয়ে গেল এক বীভৎস পন্থা। কান্দাহারের পৌঁছেই সোজা সে গিয়ে উপস্থিত হল আমানুল্লার গৃহদ্বারে। কলিংবেল টিপতেই কাঙ্খিত মানুষটিই এসে দরজা খুলে দিল, কিন্তু লায়লার মুখ চোখের অবস্তা দেখে প্রায় হতভম্ব হয়ে গেল।

'আরে, লায়লা যে! কি ব্যাপার? শুনলাম, তুমি মুখার্জির সঙ্গে গেছ ধ্বংসাবশেষ দেখাতে?' আমানুল্লা ভদ্রতা রক্ষা করে, অভ্যর্থনা জানালো—ইউনিভার্সিটি কলেজের পরিচিতা বান্ধবীকে। ঘরের ভেতরে ঢুকে, সোফায় বসতে বসতে লায়লা বলল—শুনেছো ঠিক কথাই, কিন্তু সেখানে টিকতে পারলাম কই?'

'কেন, কেন? মুখার্জির সঙ্গে আমি নিজে কথা বলে দেখেছি—যেমন পলিশড ব্যবহার, তেমনি ভদ্র কথাবার্তায়।'

'আরে মুখার্জি তো অত্যন্ত ভাল মানুষ আর সাদাসিধে বটেই। অমন নামজাদা স্কলার, কিন্তু দেমাক নেই একটুও। দেখতেও ভারী ইমপ্রেসিভ। কোঁকড়া কালো চুল, আর্য্যদের মত নাক, বড় বড় চোখের ভাষাও বেশ গভীর। অমন একটা লোভনীয় হিন্দুস্তানী যুবককে কাছে পেয়ে, কী নোংরামিই না শুরু করে দিয়েছে গান্দারি? জানোই তো হিন্দুস্তানের হিন্দু বলতেই গান্দারির নোলা দিয়ে জল পড়ে।'

'কি সব যা তা বলছো?' বেশ বিরক্ত হয়েই কথা বলল আমনুল্লা, 'গান্দারির মত মেয়ে কখনো নোংরামি করতে পারে? নোংরামি বলতে কি বুঝাতে চাইতো তুমি?' চট করে সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে লায়লা বলল—'আমারই ভুল হয়েছিল। ভুলেই গিয়েছিলাম—লায়লাকে তুমি কি চোখে দ্যাখো। আচ্ছা, আমি তবে এবার যাই!' বিব্রতভাবে আমানুল্লা তাড়াতাড়ি উঠে এসে, লায়লার হাত ধরে, তাকে আবার সোফায় বসিয়ে দিয়ে, বলল, 'এতদিন পরে দেখা হল, আর, আমার কথায় রাগ করে এমনিভাবে চলে যেতে দেবো আমি তোমাকে?' 'কিন্তু, আমি তো এসেছিলাম তোমার ভালর জন্যেই আমানুল্লা! তুমি গান্দারি মেয়েটাকে কত উঁচু ভালো বলে ভাবো, তাতো আমার কাছে অজানা নয়। আমিও তো ওকে উঁচু স্বভাবের মেয়ে বলেই জানতাম। কিন্তু কি করবো বলো, যা চোখে দেখেছি তাকে অবিশ্বাস করবো কেমন করে?'

'কি দেখেছো, সেটাই তো শুনতে চাচ্ছি তোমার কাছ থেকে।'

'সে সব বর্ণনা তোমার কাছে আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।' বেশ গম্ভীর হয়ে বলল লায়লা, 'শুধু এইটুকু বলতে পারি, ঐ হিন্দুস্তানী স্কলারকে পাওয়ার জন্যে

গান্দারি পাগল হয়ে উঠেছে। মুখার্জি তো কাবুলে এসে আছে বেশ কয়েকদিন হল, তার ওপর প্রফেসর রহিম দিলই মুখার্জির সুবিধা-অসুবিধা সব দেখাশোনা করেন। এদিকে রহিম-দিলকে চাচা সাহেব বলে ডেকে গান্দারি তো রাত দিন পড়ে থাকে ঐ প্রফেসারেরই বাড়ীতে। মনে হয়, ঐ খানেই গত কয়েক দিনে মুখার্জির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেশ জমিয়ে ফেলেছে গান্দারি।

আমানুল্লার গান্দারি-উদভ্রান্ত মনে লায়লার বলা শেষ কথাগুলো বেশ দাগ কাটতে সক্ষম হল। গোয়েন্দা-বিভাগের অতবড় হোমরা চোমরা অফিসার সের আলিও সেদিন টেলিফোনে যখন কান্দাহারে গান্দারি কি করে না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখাবার নির্দ্দেশ দিচ্ছিলেন, তখন তিনিও এই রকমই একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যেন। বলেছিলেন, বার বার বারণ করা সত্ত্বেও ঐ হিন্দুস্তানী নও জওয়ান কেন যে গান্দারির পিছু ছাড়ছে না, তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

আমানুল্লা বল্‌ল, ওদের দুজনকে একা থাকার সুযোগ দিয়ে, তুমি চলে এলে কেন?' 'বললাম না—ঐসব দৃশ্য দেখার পরেও, আমার পক্ষে আর ওখানে থাকা সম্ভব হল না? তাছাড়া, যা তা অপমানের কথা বল্‌তে শুরু করে দিলো গান্দারি আমাকে, যাতে আজ রাতে ও একা থাকতে পারে মুখার্জির কাছে। এর পরেও তুমি আমাকে ওখানে থাকতে বলো? আমি একটা ভদ্র ঘরের শিক্ষিতা মেয়ে না, কি?'

'রাতে ওরা থাকবে কোথায়?'

'প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রেষ্ট হাউসেই।'

'তাহলে তুমি বলতে চাও, গান্দারি মুখার্জিকে একান্ত করে পাওয়ার পথ পরিষ্কার করতেই তোমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল ওখান থেকে?'

'তেমনটি মনে হয়েছে বলেই তো, কান্দাহারে পৌঁছেই সোজা ছুটে এসেছি তোমার কাছে। গান্দারি গান্দারি করে হন্যে হয়ে মরছো তুমি সেই কলেজের দিনগুলি থেকেই, তা তো আমি জানি। কিন্তু গান্দারি তোমার দিকে ভালভাবে একবার তাকিয়েও দেখেছে কিনা সন্দেহ। সেই গান্দারিরই আসল রূপটা কি, তা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমার সামনে। হিন্দুস্তানের হিন্দু ছাড়া আর কোন পুরুষকেই আমল দেবে না ও জীবনে, তুমি দেখো।'

'অথচ, আমি তো ওর অযোগ্য নই, লায়লা। আমার জ্যাঠা বাবার সম্পত্তি আর প্রতিপত্তি—কোনটাই কম নেই! কান্দাহারে, কাবুলে আমাদের বড় বড় বাড়ী আছে, গাড়ী আছে। আমিও উচ্চ-শিক্ষিত! গভর্ণমেন্টে বড় চাকরি করি। সবাই বলে, আমার স্বাস্থ্য ভালো, চেহারা ভালো—আমানুল্লার বক্তব্য শেষ হওয়ার আগেই লায়লা বলে উঠল,—'এ সবই তো আমার জানা আছে আমানুল্লা, তোমার মতন ইমানদার জোয়ান পুরুষ কজন খুঁজে পাওয়া যাবে আজকের কাবুলে আর কান্দাহারে? তোমার জন্যে

দুঃখতো আমার সেই কারণেই অতবড় বুঁজদিল বেইমান মেয়ে যে, তারই অপেক্ষায় বসে থেকে তোমার জীবন যৌবনকে তুমি বরবাদ করবে কেন?'

শরীরের শিরায় শিরায় যে আফগানী রক্ত বইছে আমানুল্লার, তাতে কেমন যেন একটা জ্বালা ধরিয়ে দিল লায়লার শেষ কথাগুলো। সত্যিই তো বেইমান বুঁজদিল ঐ তুর্কী ব্যবসায়ীর পোষ্য-কন্যাটি! গান্দারি হিন্দুশাস্ত্র আর হিন্দুস্তানের গুণগান করে সকলের কাছে, পুলিশের ধারণা ওর সম্পর্কে ভাল নয় একেবারেই গোয়েন্দা বিভাগের সন্দেহ—ও মেয়ের নিশ্চয় কোনো না কোনো রকম যোগাযোগ আছে—মুসলমানদের সবচেয়ে বিদ্বেষের বস্তু ঐ কাফিরিস্তানের সঙ্গে—এতকিছু জেনেও আমানুল্লা সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে কামনা করেছে ঐ মেয়েকেই নিজের জীবনে পেতে। কিন্তু সেই একাগ্র কামনার আহ্বানে কোনদিন সাড়া দেয়নি সে। আর, আজ সেই মেয়েই কিনা—এক হিন্দুস্তানী যুবককে পাশে পেয়েই উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তাকে পাওয়ার জন্যে, তার সঙ্গে একান্তে নিশিযাপনের লোভে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে লায়লাকে? আজ হঠাৎ আমানুল্লার মনে হল—তার সত্যিকার মঙ্গলপ্রার্থী যদি কেউ থাকে এ দুনিয়ায়, তবে সে এই লায়লা। নাহলে কান্দাহারে পৌঁছেই লায়লা ছুটে আসবে কেন তারই কাছে—এই ভয়ঙ্কর সংবাদটা দিতে?

লায়লার যুবতী-নয়ন আমানুল্লার আনন-রেখার অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ করছিল এতক্ষণ বেশ ভালভাবেই। মনে মনে সে খুশিও হয়ে উঠল খানিকটা। যাক্, তার বিষ-প্রয়োগ ব্যর্থ হয় নি তবে—তার পরম প্রার্থিত পুরুষটির ওপর! জ্বালাতে পেরেছে তবে ঈর্ষার আগুন আমানুল্লার প্রাণেও?

কেমন যেন জড়িত স্বরে আমানুল্লাকে বিড় বিড় করতে শুনলো লায়লা—'দাঁড়াও, এর একটা বিহিত করতেই হবে আজ।' বলেই ছুটে গিয়ে সে ক্ষিপ্ত হস্তে তুলে নিল টেলিফোনের রিসিভার। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লাইন পেয়ে গেল কাবুলের। আমানুল্লা কথা আরম্ভ করলো—'হ্যালো, আমি কি জনাব মুস্তাফ কামালের সঙ্গে কথা বলছি?

টেলিফোনের ওপার থেকে জবাব এলো—'আমিই মুস্তাক কামাল।'

'গুড ইভনিং, স্যার!'

'গুড ইভনিং।'

'আমি গোয়েন্দা বিভাগ থেকে কথা বলছি।' ঝরঝরে ইংরেজী আমানুল্লার।

'জরুরী কথা থাকে তো বলুন।'

'আপনার মেয়ে কুমারী গান্দারি এখন কোথায়, আপনি জানেন কি?'

'কেন জানবো না? আমার মেয়ে আমাকে না জানিয়ে কোথাও যায় না।'

'এক হিন্দুস্তানী যুবকের সঙ্গে একই রেষ্ট-হাউসে আপনার মেয়ে আজ রাত কাটাবে, সে খবর কি আপনার জানা?'

'একটি খানদানী শিক্ষিতা মহিলার প্রাইভেসিতে আপনার হাতে দেওয়া হচ্ছে না কি? কাবুল থেকে আসা কণ্ঠে এবার কাঠিন্যের প্রকাশ।

'না, না, প্রাইভেসিতে হাত দেবো কেন, আমি জানতে চাচ্ছিলাম......'

আমানুল্লা বেকায়দায় পড়ে গিয়ে আমতা আমতা করতে লাগল।

'অন্য কোন কথা থাকলে বলুন—'মুস্তাক কামাল কাজের মানুষ।

'আপনার মেয়ে প্রায়ই আলিসাঙ্গ নদী পার হয়ে, ওপারে কোথায় যায়?'

'ও অনেক নদী, অনেক পাহাড় পার হয়েই অনেক জায়গায় যায়। এতে নতুনত্বের কিছু নেই।' কাটা কাটা উত্তর আসছে কাবুলের টেলিফোন থেকে।

লায়লা কিছুই শুনতে পাচ্ছে না ওপারের জবাবের, তবু বুঝতে পারছে—আমানুল্লা ক্রমেই বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

আমানুল্লা পুনশ্চ প্রশ্ন করলো-'গান্দারি বিশদিন—বাইশদিন আলীসাঙ্গের ওপারে গিয়ে থাকে, আপনি তার বাবা, আপনি একবার খোঁজও নেন না, সে কোথায় গিয়ে কি করছে? এটা কি খুব স্বাভাবিক ব্যাপার বলে আপনি মনে করেন।'

'আমি কি মনে করি, সেটা আমার ব্যাপার, আপনি তা জানতে চাচ্ছেন কেন? আর, ভুলে যাবেন না রক্তে আমি তুর্কী তুর্কীস্তানের মহান বিপ্লবী নেতা কামাল আতাতুর্কের আদর্শ আমি মেনে চলি। তিনি তুর্কীস্তানের মেয়েদের পর্দার ঘেরা টোপের অন্ধকার থেকে বাইরে আসার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। আমিও আমার মেয়েকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি যেখানে খুশি যাবার, যার সঙ্গে খুশি মেলামেশা করার। ও পাহাড়, জঙ্গল, নদী, মরুভূমি ভালবাসে। তাই ও আমাকে জানিয়েই ঘুরতে বেরোয় মাঝে মাঝেই এখানে ওখানে।

'কিন্তু ঐ বয়েসের মেয়ের পক্ষে অমন একা একা ঘুরে বেড়ানো কি ঠিক?'

'আমার মেয়ের কোন কাজটা ঠিক আর কোন কাজটা ঠিক নয়, সেটা আমি বুঝবো, That is none of your business.! হুঙ্কার উঠল কাবুল থেকে।

'নিশ্চয়ই আমাদের জানা দরকার।' রিসিভার হাতে উত্তেজনার থর থর করে কাঁপছে আমানুল্লা—লায়লা দেখল। 'আমরা গোয়েন্দা বিভাগের লোক—আপনার মেয়েকে সন্দেহ করি—আলিসাঙ্গ পেরিয়ে ও নিশ্চয়ই কাফিরিস্তানে যায়, মাঝে মাঝে।'

'তার কোন প্রমাণ—আছে?'

'প্রমাণটাই খুঁজছি এখন আমরা, যেদিন প্রমাণ পাবো.....'

'মুস্তাক্ কামালকে ভয় দেখাচ্ছেন?' গর্জন শোনা গেল টেলিফোনের মধ্যে দিয়ে।

'ভয় দেখাচ্ছি না, হুঁশিয়ারি দিচ্ছি।'

'ও হুঁশিয়ারি তুলে রাখুন অন্য পাত্রের জন্যে, আমি নিজেই যথেষ্ট হুঁশিয়ার। আপনার আর কিছু বলার আছে?'

'না।'

'এবার আমার যে কথা বলার আছে, সে কথাটা শুনুন।'

'কি কথা?'

'সাহস থাকে, তো আপনার নামটা বলুন। আমি কালই পুলিশের ইন্‌সপেক্টর জেনারেলের কাছে জানাবো, আমার মেয়ে সম্পর্কে আপনার অভদ্র ইঙ্গিতের কথা। আমার মেয়ে আজ কোন রেষ্ট হাউসে কার সঙ্গে রাত কাটাবে—সেই খবর আপনি জান্‌তে চেয়েছেন আমার কাছে। আপনার এই নির্লজ্জ স্পর্ধা যে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিতা কন্যার শ্লীলতাহানির পক্ষে যথেষ্ট নয় কি?'

সশব্দে টেলিফোন—রিসিভারটা যথাস্থানে নামিয়ে রেখে, রাগে গস্ গস্ করতে লাগল বিত্তবান গোলাম—হায়দারের ভ্রাতুষ্পুত্র—

'বটে? আমাকে চোখ রাঙানো? লাপিস্-লাজুলি বেচে টাকার পাহাড় বানিয়েছে, তাই এত টাকার গরম? আমার নাম জান্‌তে চায় পুলিশের আই. জি.-র কাছে রিপোর্ট করার জন্যে? আমি ওর মেয়ের শ্লীলতাহানি করেছি?'

'এসব কি বলছ তুমি পাগলের মত? কোন্ মেয়ের আবার শ্লীলতা নষ্ট করলে তুমি?'

'ঐ গান্দারির।'

'সেকি, এত বড় মিথ্যে বদনাম তোমায় কে দিল?'

'মুস্তাক্ কামাল।'

'আশ্চর্য্য! সবার মুখেই শুনি মুস্তাক কামালের সুখ্যাতি তার ভদ্র আচরণের জন্যে! তিনিই কিনা তোমাকে'....

'আমাকে বর্বর ভেবেছে, তাই যা খুশি তাই বলে নিলো। আজ অবধি, গান্দারির হাতটা ধরে দুটো কথা বলার সুযোগও যে পায় নি, তাকেই অপবাদ দিচ্ছে গান্দারির—ইজ্জৎ নষ্ট করার।'

'ভারী অন্যায়। তাও যদি মুস্তাক কামালের নিজের মেয়ে হতো। এতিমখানা থেকে কুড়িয়ে আনা মেয়ের জন্যে আবার এত মাতামাতি।' এই বলে একটু থেমে, লায়লা শুধালো—'টেলিফোনে ওসব কি বলেছিলে তুমি আমানুল্লা? গান্দারি আলিসাঙ্গ নদী পার হয়ে মাঝে মাঝে যায় কাফিরিস্তানে—একথা সত্যি?'

'গোয়েন্দা-পুলিশ সেই রকমই সন্দেহ করে।'

'সন্দেহটা ঠিক কিনা—সেটা কেন যাচাই করো না তোমরা? ও যখন আলিসাঙ্গের ওপারে যায়, তখন ফলো করে না তোমাদের লোক ওকে? তাহলেই তো তোমরা নিশ্চিত হতে পারো যে,—'

'তাতে অসুবিধে আছে দুইটি। এক, বড় লোকের আদুরি চড়ুনী মেয়ে। আমরা জানি পাহাড়-নদী জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে ও ভালবাসে, এবং সময় পেলেই সেই সব

জায়গায় চরে বেড়ানো ওর স্বভাব। আলিসাঙ্গের ওপারে যে গভীর অরণ্য, ওখানে ঘুরে বেড়ানো ওর পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। দুই, আলিসাঙ্গের ওপারে চট্ করে আমাদের এ পারের কোন মানুষ যেতে চায় না। কারণ, সকলেই জানে—ওপারে কয়েক মাইল গেলেই কাফিরিস্তান। কাফিররা এ পারের মুসলমান পেলে, তাকে মেরে ফেলবেই।'

'তোমরা বন্দুক-কামান নিয়ে গেলেই তো পারো।'

'পাগল নাকি? তাহলে তো কাফিরিস্তানের সঙ্গে অকারণেই যুদ্ধ বাধাতে হয়। ওরা তো আমাদের এপারে এসে আমাদের বিরক্ত করে না কখনো। তাছাড়া, অকারণে একটা ছোট পাব্বর্ত্য জাতিকে আক্রমণ করলে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের দুর্নাম ছড়িয়ে পড়বে পররাজ্যলোভী বলে, সেটা আমরা চাই না।'

'তাহলে কোনদিনই তোমরা প্রমাণ করতে পারবে না—ও সত্যিই কাফিরিস্তানে যায় কি না।'

'দেখি, চেষ্টা করছি আমরা অন্য কোনও সূত্র থেকে খবর সংগ্রহ করতে।'

'যেখানে এক সঙ্গীহীন অস্ত্রহীন যুবতী যেতে পারছে এবং নিরাপদে ফিরেও আসছে যেখান থেকে, সেখানেই আফগানিস্তানের কোন মরদ যেতে ভয় পাচ্ছে, এ এক লজ্জার কথা বটে।'

'কিন্তু কেন যাবো আমরা? পারিপার্শ্বিক কোন দেশের সঙ্গেই আফগান সরকার ঝামেলা বাধাতে চায় না। হ্যাঁ, যদি কাফিররা কোন অনিষ্ট করতো আমাদের, আলিসাঙ্গের এপারে এসে, তাহলে ওরা নিশ্চয় পরিচয় পেতো আমাদের হিম্মতের।'

'তুমি একাই তো ফলো করে দেখতে পারো একবার—সত্যিই মেয়েটি কোথায় গিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে আসে এমনভাবে। সবাই যখন নদীর ওপারে যেতে ভয় পায়, তখন একা গান্দারি ওপারে যাবার সাহস পায় কোথা থেকে। যদি কাফিরিস্তানেই যাবে, তবে প্রাণ নিয়ে ও ফেরে কেমন করে?'

'ঠিক এই প্রশ্ন তো পুলিশেরও। কিন্তু এ-প্রশ্নের উত্তর আজও পাইনি আমরা। আর আমি কেন ফলো করি না ওকে—জিজ্ঞাসা করেছিলে? একটা ঐ বয়সী অমন রূপসী মেয়েকে অনুসরণ করে জঙ্গলে ঢুকে যদি শেষ পর্য্যন্ত দেখি ঐ যাযাবরী মেয়েটা সত্যি-সত্যিই, পাহাড়ে জঙ্গলে একাই শুয়ে বসে কাটিয়ে চরিতার্থ করছে ওর খেয়ালী স্বভাবকে, আর ঠিক সেই সময় যদি আমাকে দেখতে পেয়ে ফিরে এসে ও নালিশ করে বসে আমার বিরুদ্ধে, তাহলে কি আর রক্ষা আছে আমার? একটা সুন্দরী তরুণীর অসম্মান করার চেষ্টাতেই আমি যে ওর পিছু নিয়েছি, এটা প্রমাণ করবেই কোর্টে ওর লক্ষপতি জহুরী বাপ—তখন বিনা অপরাধেই লজ্জায় মাথা কাটা যাবে না আমার?'

কয়েক মিনিট নীরবে গুম হয়ে বসে রইল আমানুল্লা। তারপর, বেশ কিছুটা আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলো—'কিন্তু , গান্দারির কোন বিপদ হোক, গান্দারিকে

কেউ সন্দেহ করুক, এ তো আমি কোনদিনই চাইনি লায়লা, আজও তার কোন অমঙ্গল হোক, এ আমার প্রার্থনা নয়। আমার একটিমাত্র ইচ্ছা—ও আমার প্রাণের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখুক একবার, দেখুক—সেখানে কত যত্নে, কত আদরে—আমি রত্নবেদী তৈরী করে রেখেছি, কেবল সে এসে সেখানে বসবে বলে।' মুখের বসন্তের দাগগুলো আমানুল্লার যেন আরও বেশী স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে ওর এতদিনের চেপে রাখা আশা, আকাঙ্খা আর অভিমান প্রকাশের মুহূর্তে। চোখের কোণে অশ্রু রেখাও দেখা দিল যেন একবার।

জ্বলে উঠল ঈর্ষা-বহ্নি আবার লেলিহান শিখা মেলে লায়লার আমানুল্লা-সর্বস্ব নারী হৃদয়ে। আজকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে ছুটে এসেছে কান্দাহারে পৌঁছেই এই গৃহে, যে উদ্দেশ্যে বলেছে অসত্য ঘটনার কথা ইনিয়ে বিনিয়ে তার প্রার্থিত পুরুষের মনকে বিরূপ করে তুলতে ঐ লাবণ্যময়ী ধনী-দুহিতার প্রতি, তা কি তবে ব্যর্থ হয়ে যাবে?

কোপকুঞ্চিত ভ্রূ তুলে, কালনাগিনীর তীব্র বিষ জিভে নিয়ে, হিসহিস করে কথা বলল এবার লায়লা—'এখনও? এখনও গান্দারির কথা বলতে গিয়ে তোমার চোখে লোভের ছায়া পড়ছে আমানুল্লা? ছি, ছি, ছি! তুমি না সুপুরুষ, সুশিক্ষিত, অর্থবান? বিখ্যাত বংশে না জন্ম তোমার? সারা কাবুল—কান্দাহারের লোক তোমায় না সম্মান করে এক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী বলে। তোমার স্বাস্থ্য, তোমার অনাবিল যৌবন কোন্ তরুণী আবার কামনা না করে? আর, সেই তুমি—নিলাজ, দেমাকী, অন্য পুরুষের জন্যে পাগল একটা মেয়ের কাছ থেকে বার বার অবহেলা আর অপমান পাবার পরেও, আজও কিনা তাকে কামনা করছো মনে মনে? ওরই কারণে আজ না তোমাকে মুস্তাক কামাল বলতে সাহস পেলো—তুমি ওর শ্লীলতাহানি ঘটিয়েছো? যে মেয়ের আসল বাপ-মা কে ছিল, তাও কেউ জানে না আজও, যে মেয়ে মানুষ হয়েছে পশুর মত এতিমখানার নোংরা পরিবেশে, তারই জন্যে তোমার মতন একজন খানদানী ছেলের এমন হাহাকার করা কি শোভা পায়? একবার ভেবে দ্যাখো, ঠিক এই মুহূর্তে লায়লা কি করছে নির্জন রেষ্ট হাউসের একটি ঘরের নিভৃত শয্যায়! ঐ সুশ্রী চেহারার হিন্দুস্তানী নওজোয়ানের কোঁকড়া চুল ভর্তি মাথায় নিজের আঙ্গুলগুলো দিয়ে আদর করছে হয়তো! না হয়তো মুখার্জি সাহেবের বুকের ওপর মাথা রেখে.........ব্যস, আর এগুবার প্রয়োজন হ'ল না লায়লার। তার শাণিত-ছোবলের বিষের জ্বালায় চিৎকার করে উঠল আমানুল্লা—'no more লায়লা, no more please। Leave me alone–for heaven's sake। আমার সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর বিষ ছড়িয়ে দিলে তুমি আজ, জানি নে, সেই বিষের জ্বালা দূর করতে কী করতে পারবো, কতদূর নীচে নামতে পারবো আমি।' এই বলে চেয়ার থেকে আবার উঠে, পায়চারী শুরু করলো বিভ্রান্ত পদবিক্ষেপে ঘরের মধ্যেই আমানুল্লা। তারপর, হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়িয়ে, ডান হাত মুঠো করে, বাঁ হাতের তালুতে সে মুঠো সশব্দে ঠুকতে ঠুকতে

অগ্ন্যুদগারী চক্ষু মেলে ফোঁশ ফোঁশ করতে লাগল সে—তবে একটা কিছু করতেই হবে আমায় এবার। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কিছু করতে হবে।'

নিশ্চিন্ত মন নিয়ে বিদায় নিল সে-রাত্রে আমানুল্লার কোয়ার্টার্স থেকে লায়লা। লায়লা নিশ্চিন্ত হয়েছে—সার্থক হয়েছে তার আজকের সান্ধ্য অভিযান। আমানুল্লা আর কোনদিন ফিরেও চাইবে না ঐ সুন্দরী বিদূষী ধনাঢ্য কন্যার দিকে।

কিন্তু, আফগান আমানুল্লা খাঁ ততক্ষণে পৌঁছে গেছে এক ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্তে। যে-মেয়ের দেহ স্পর্শ না করেও তাকে শ্লীলতাহানির অপবাদ শুনতে হল আজ, তার ওপর কেমনভাবে বদলা নিতে হয়, দেখাবে সে তামাম দুনিয়াকে এবার। উত্তেজিত কণ্ঠেই হাঁক দিয়ে উঠল আমানুল্লা—'ড্রাইভার গাড়ী বের করো আমার, জলদি!'

রাত্রি প্রায় আটটায় খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ করে, নিশ্চিন্ত মনে, নিজের ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে রেখে, সারাদিনের অভিজ্ঞতা ডায়রীর পৃষ্ঠায় তুলে রাখবার জন্যে শয্যার ওপর উঠে বসল জয়ন্ত। এটা অবশ্য তার নিত্যকার অভ্যাস। তা ছাড়া যে কোন ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ব্যাপারে ডায়রীতে প্রাত্যহিক অনুসন্ধানের রিপোর্ট নোট করে রাখা একটা অবশ্য কর্তব্য তো বটেই। কিন্তু দুই-তিন পাতা লিখতেই বাধা পড়লো। ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে, হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞেসা করলো গান্দারি—

'ভেতরে আসতে পারি?'

মনে মনে একটু বিরক্তই বোধ করলো জয়ন্ত। এত রাতে এ আবার কেন? কিন্তু কি যে আছে মেয়েটির সরল শিশুর মত হাসিতে, আর, বুদ্ধিদীপ্ত দুই কালো গভীর চোখে, ওর ওপর রাগ করা বেশ কঠিন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাই অনুমতি দিতেই হল ভেতরে আসার। তবু, যাতে ও বেশিক্ষণ না থাকে এ-ঘরে—তারই চেষ্টায় জয়ন্ত বলল, 'আসুন। কিন্তু আমাকে যে ডায়ারী লিখতে হবে এখন।'

'তোমার ডায়রী লেখার সুযোগ তুমি কালও পাবে বাঙ্গালীবাবু, কিন্তু তোমার কাছে এমন নিরিবিলিতে আমার মনের সব কথা উজাড় করে দেবার সুযোগ আর আমি হয়তো কখনই পাবো না। আমায় একটু তোমার কাছে বসতে দাও।'

এতক্ষণে নজর পড়লো জয়ন্তের গান্ধারির সাজ-সজ্জার দিকে। কোথা থেকে চুমকি বসানো জয়পুরী শাড়ী জোগাড় করেছে মেয়েটা! ছোট কপালে লাল টিপ দিয়েছে। পায়ে পরেছে আলতা। হেসে ফেলল জয়ন্ত ওর অনুশীলনহীন হাতে শাড়ী পরার প্রয়াস দেখে। কিন্তু মুগ্ধ না হয়েও পারলো না। লজ্জায় কান মুখ লাল হয়ে উঠলো গান্দারির। জিজ্ঞেসা করলো—'হাসছ যে? বিছছিরি দেখাচ্ছে বুঝি?'

'একটুও নয়। ভাবছি—শাড়ী, কুমকুমের টীপ, আলতা—এসব পেলেন কোথা থেকে?'

'আব্বাজানের কাছে বোম্বাই-এর এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক প্রায়ই আসেন তা ব্যবসার প্রয়োজনে। একবার তাঁর সঙ্গে তাঁর মেয়েও এসেছিল। সেই আমায় দিয়ে গেছে

এসব।' একটু থেমে, আবার প্রশ্ন করলো গান্দারি, 'ঠিক করে বলো না, বাঙ্গালীবাবু, আমাকে এখন তোমার দেশের মেয়ের মত দেখাচ্ছে কি না?'

'দেখাচ্ছে।'

আমার এতবড় প্রশ্নের জবাব দিচ্ছ তুমি একটি মাত্র শব্দে? নিশ্চয় আমার সাজ তোমার মনের মতন হয় নি, সত্যি করে বলো!

ছেলে মানুষী কথা শুনে কার না হাসি পায়? জয়ন্তও হেসেই বলল, 'কি বলবো বলুন? যে সাজ আপনি পরেছেন আজ তাতে বিশ্বাস করতে ইচ্ছেই হচ্ছে না যে, আফগানিস্তানের মেয়ে।

'ঠিক বলছো তো? আমাকে খুশি করবার জন্যে বলছো না তো এই কথা?

'না।'

'আমাকে সারা জীবন এই সাজ পরার অধিকার তুমি দিতে পারো না, বাঙ্গালীবাবু?' জয়ন্তের চোখের ওপর নিজের চোখের অণুবীক্ষণ দৃষ্টি নিবন্ধ করে প্রশ্ন করলো গান্দারি, 'আমার যে কত সাধ—গরদের শাড়ীতে সেজে, মাথার সিঁথিতে সোহাগ-সিঁদুর লাগিয়ে, হাতে শাঁখা, পায়ে আলতা পরে কোন দেব-মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ার। কত রাত যে আমি এমনি স্বপ্ন দেখে কাটিয়েছি, বাঙ্গালীবাবু! এ-আশা, এই সাধ কি কোনোদিন পূর্ণ হতে পারে না?'

'কেমন করে হবে? আপনি, আপনার বাবা-মা যে ধর্মে বিশ্বাসী, সে ধর্ম তো শাঁখা সিঁদুর পরে, দেব মন্দিরে পূজো করতে যাওয়ার বিধি নির্দেশ দেয় নি। সে-ধর্মে ঈশ্বরের কাছে নমাজের মধ্য দিয়ে প্রার্থনাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-ভজনা। সে-বিধি না মানলে, কি ধর্মবিরোধী কাজ হবে না?

'কিন্তু, আমার দেহে যে কোন সমাজ, আর কোন ধর্মের খুন বইচে, সেটাই তো তুমি জানো না এখনও।'

'ডায়রী বন্ধ করে রেখে, অত্যন্ত উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে জানতে চাইল এবার জয়ন্ত, 'আপনি মুসলমান নন?'

ইসলামকে আমি প্রাণ মন দিয়ে ভক্তি করি, ভালবাসি।' আপনার অসাধারণ কোরাণ জ্ঞান দেখে সে বিশ্বাস আমার মনেও দৃঢ় হয়েছে।'

'কিন্তু রক্তে আমি—' বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল গান্দারি। 'বলুন, রক্তে আপনি কি?' উত্তরের অপেক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে রইল জয়ন্ত।

'আমার সব কথা বলবো বলেই তো আজ এসেছি, বাঙ্গালীবাবু! যে কথা একমাত্র আমার আব্বাজান ছাড়া আর কাউকে বলি নি কখনো, সে কথা তোমাকে না বলতে পারা পর্য্যন্ত মনে শান্তি পাচ্ছি না কিছুতেই। কিন্তু, ভাবছি, আমার সব কথা বিশ্বাস করতে পারবে কি না তুমি।'

'আপনার মনের গভীরতার পরিচয় আমার অজানা নেই, গান্দারি। এই বয়সের

মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও আপনার প্রজ্ঞা আপনার সংযম বার বার বিস্মিত করেছে আমাকে। আপনার বলা প্রতিটি কথাকেই পরম বিশ্বাসে গ্রহণ করেছে আমার মন। আপনি নির্ভয়ে নিঃসংশয়ে বলতে পারেন আমার আছে—রক্তে আপনি কি।'

শয্যা থেকে নেমে গিয়ে, ঘরের দরজার ছিটকিনিটা তুলে দিয়ে এসে, আবার উঠে বসল খাটের ওপরে গোন্দারি। তারপর, প্রায় ফিস ফিস করে বলল—

মুসলমানরা যে দেশের নাম দিয়েছে কাফিরিস্তান, আমার জন্ম হয়েছিল সেই দেশেই বাঙ্গালীবাবু।'

বিদ্যুৎ চমকের মত একবার ভেসে উঠল চোখের সামনে রোষবিকৃত সের আলির ক্ষুধার্ত হায়নার মত চোখ দুটি। স্পষ্ট ভেসে এলো যেন কানে তাঁর ক্রুর কণ্ঠের রূঢ় আস্ফালন—'পুলিশ ওর সম্বন্ধে যা সন্দেহ করে, তা যেদিন সত্যি বলে জানতে পারবো, সেদিন আমার পিস্তলের গুলিতেই ঝাঁঝরা হয়ে যাবে ঐ মেয়ের বুক।'

'আপনি কাফির?

'কাফিরিস্তানে জন্মেছি যখন, তখন কাফির ছাড়া আর কি?'

'আপনার আব্বাজান জানেন একথা?

'উনি দেবতার মত মানুষ। আমার কোন কথা গোপন নেই ওঁর কাছে।'

'আশ্চর্য্য! তবু উনি আপনাকে তাঁর পোষ্যকন্যা হিসেবে গ্রহণ করলেন?

'কেন করবেন না? উনি যে উদার ইসলাম ধর্মের সারমর্মটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তোমাদের দেশের বিবেকানন্দের অপূর্ব একটি বাণী আমার আব্বাজানের মুখে প্রায়ই শুনতে পাই—'

'স্বামী বিকেকানন্দের বাণী? আপনার আব্বাজানের মুখে? এসব কি বলছেন আপনি?

'হ্যাঁ! বিবেকানন্দ বলেছিলেন না—যাঁরা বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে মিল ও সমন্বয় অন্বেষণ করার চেষ্টা করেন, তাঁরা সত্যিই মহিমান্বিত। কিন্তু যাঁরা অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু, তাঁরা নিজধর্ম্মের সারতত্ত্বই অবগত নন।'

'বিবেকানন্দের বই এদেশে পাওয়া যায়?'

'তা বলতে পারবো না। তবে আব্বাজানের কাছে পৃথিবীর সব ধর্ম্মেরিই নানা বই যে আছে, সেটা দেখেছি। বেশির ভাগই অবশ্য ইংরেজীতে এবং বাইরে থেকে অর্ডার দিয়ে আনানো। মুহূর্তের বিরতির পর, সে আবার বলল—'আফগানিস্তানের একমাত্র নাব্য নদী আমু-দুরিয়ার (Amu-Dariya) নাম শোন নি?'

'শুনেছি।'

'গ্রীকরা এ নদীর নাম দিয়েছিল অক্সস, আর প্রাচীন ভারতীয় নাম—বক্ষু। নিকোলাস পর্বতশ্রেণী বড় আর ছোট পামিরকে যেখানে ভাগ করেছে, সেখানে অনেক তুষার স্তূপ আর তুষার ক্ষেত্র আছে। সেই জায়গাতেই আমু দরিয়ার উৎস। দুই হাজার চারশো

কিলোমিটার দীর্ঘ এর গতিপথের দুই তীরে ঘটেছে কত না রাজ্য আর সভ্যতার উত্থান-পতন। এ-নদীরই তীরে তীরে পৃথিবীর চার চারটি মহান ধর্ম তাদের দিব্য আলোক বিকীরণ করেছে যুগ যুগ ধরে—। হিন্দু, বৌদ্ধ আর ইসলামের কথা তুমি জানোই। আর একটি বিরাট ধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটেছিল এই নদীরই তীরবর্তী বলখ-এ। সেখানে জরথুস্ত্র তাঁর ধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন, যে ধর্ম্মের অনুসারীদের ইউরোপীয়রা বলে জোরাষ্ট্রিয়ানস, যে ধর্ম্মের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ হল আবেস্তা। জেন্দ-আবেস্তা। আমার কাছে আমুদরিয়া তাই বড় পবিত্র, বড় প্রিয় নদী। আর, বহু ধর্ম্মের অন্তরচারিণী এই নদীর উৎসের কাছে অবস্থিত বলেই বোধ হয় আফগানরা সাধারণভাবে এতখানি উদার এবং পরমতের প্রতি এতটা শ্রদ্ধাশীল হতে পেরেছে। সুদূর অতীতে, আব্বাজানের পূর্ব্বপুরুষ তুর্কী ছিলেন বটে, কিন্তু আজ তাঁর পরিচয় তো আফগান ছাড়া কিছু নয়। তিনিও তো শ্রেষ্ঠ চারটি ধর্ম্মের দীপ্তিতে উজ্জ্বল এই উদার আমুদরিয়ারই স্রোতের উদাত্ত বাণী কানে শুনেছেন অবিশ্রাম আশৈশব। তিনি অনুদার হবেন কেমন করে? চীনা পরিব্রাজকের বর্ণনা পড়লেই জানতে পারবে—পবিত্র আমুদরিয়ার স্নেহ আর দাক্ষিণ্যে লালিত এই সমুদ্র-হৃদয় গান্ধারেই, যাকে তোমরা আফগানিস্তান বলছো আজ, জন্মেছিলেন সর্ব্ব-মানুষে সমদর্শী, বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রবক্তা নারায়ণ-দেব মনোর্হিত, ধর্ম্মত্রাত আর পার্শ্বের মত জগদ্বরেণ্য বৌদ্ধ শাস্ত্রকারেরা (Si-yu-ki, BK-II)।'

মুস্তাক কামালের অন্তরের ঔদার্যের কারণ বুঝতে গিয়ে গান্দারি যে কথাগুলো বলে গেল এতক্ষণ, তেমন কথা বলতে পারে একমাত্র সেই, যে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে সারা জীবন ভালবেসেছে, শ্রদ্ধা করেছে, পূজো করেছে এই গান্দারকে, এই আফগানিস্তানকে—জয়ন্তের মনে হল। জয়ন্ত জিজ্ঞেস করলো, গান্দারি নামটা শুনেছি আপনার নিজেরই দেওয়া। একথা কি সত্যি?

'হ্যাঁ।'

'নিজেকে গান্ধারের মেয়ে বলে ঘোষণা করে আনন্দ পান মনে। তাই কি নাম নিয়েছেন গান্দারি?'

'আনন্দ কেবল নয়, গর্ব্বও অনুভব করি। বাবা-মা নাম দিয়েছিল—ইস্ত্রা।'

'ইস্ত্রা। এ নাম আবার কোন ভাষায়? আরবী-ফার্সির ছোঁয়া নেই তো এ-নামে!'

'আমার জন্ম যেখানে, সে দেশের ভাষায় এ-নামের অর্থ নিশ্চয়ই আছে একটা, কিন্তু তা পরে শোনাবো তোমাকে বাঙ্গালী বাবু, এখন নয়।'

'গান্ধারের মেয়ে গান্ধারী হলেই ভাল হত না নামটা? গান্দারি কেন?'

'ঋগবেদে যদিও গান্ধারের অধিবাসীদের গান্ধারীই বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে ক'জন আর ঋগবেদ পড়েছে বলো! হয়তো, গান্ধারী বললে অর্থই বুঝতে পারবে না অনেকে অথচ এদেশের প্রাচীন ইতিহাসের সব ছাত্ররাই প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেকতৈয়স, হেরোদোতস, টলেমি আর এর লেখা গান্ধারি নামটা পড়েছেঙ্গ এঁরা সবাই

গান্ধারের মানুষদের গান্দারি নামেই অভিহিত করে গেছেন কিনা। তাই আমি গান্দারি নামটাই বেছে নিয়েছি।'

মুহূর্তের জন্যে থামল সে। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো বসে বসে। তারপর ফোঁশ করে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বলল—'এমন নাম নিয়েছি বলে কত লোকের আমার ওপর কত রাগ। আমারও দশা শেষ অবধি হয়তো ইরাণের শেষ শাহের মতই হবে, বাঙ্গালিবাবু।'

'ইরাণের শাহর মত হবে—মানে?' জয়ন্ত ভেবেই পেলো না, এত লোক থাকতে, হঠাৎ ইরাণের শাহর অবস্থার সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করছে কেন গান্দারি।

'মানে খুবই সহজ। মুসলমান হয়েও ইরাণের শেষ শাহ—নিজের নামের শেষে সগর্ব্বে যোগ করতেন দুটো অদ্ভুৎ বিকৃত সংস্কৃত শব্দ—আরিয়া মেহের। লক্ষ্য করেছো নিশ্চয়ই।'

'ও দুটো কি সংস্কৃত শব্দ?'

'হ্যাঁ। সংস্কৃত ঐ শব্দ দুটো হচ্ছে—আর্য্য-মিহির, অর্থাৎ আর্যদের সূর্য্য। প্রাচীন আর্য্যরা মানব সভ্যতার ঊষা-লগ্নে একদিন ইরাণ এবং ইরাণের আসপাশেরই কোন অঞ্চল থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর দিক-বিদিক বলে অনেক ঐতিহাসিকেরই ধারণা। আর সেই কারণেই, ইরাণের শেষ শাহ ইসলামধর্ম্মাবলম্বী হয়েও নিজেকে আর্য্য-সূর্য বলে জাহির করে আনন্দ পেতেন, গর্ব্ব অনুভব করতেন। কিন্তু তার ফল হল কি? গোঁড়া মৌলভী-মৌলানারা হয়ে দাঁড়ালেন তাঁর ঘোরতর বিরোধী। তবু শাহ ত্যাগ করেন নি স্ব আরোপিত ঐ আর্য্য-মিহির পদবীটা। আমিও প্রাচীন ইতিহাস ঘেঁটে নিশ্চিত হয়েছি যে, আলি-সাঙ্গ নদীর ওপারে যে পার্বত্য উপত্যকায় আমার জন্ম, যে অঞ্চলকে মুসলমানরা চিরদিন ডেকে এসেছে কাফিরিস্তান বলে, সেটাও প্রাচীনকালে প্রাচীন গান্দারেরই অংশ ছিল একটি। তাই নিজেকে গান্দারি বলে প্রচার করে আনন্দের আর গর্বের আমার সীমা নেই। তবু মাঝে মাঝেই যখন আমার নামকে কেন্দ্র করে মক্তবে, মাদ্রাসায়, কলেজে তর্ক আর সংশয়ের কালো মেঘে বিদ্বেষ বিদ্যুতের ঝলকানি প্রত্যক্ষ করেছি, তখনি মনে প্রশ্ন উঠেছে—আমার অবস্থাও শেষ অবধি ইরাণের শেষ শাহের মতই হবে না তো?'

'তার মানে, আপনার মতে প্রাচীন গান্ধার ছিল কাফিরিস্তান পর্য্যন্ত বিস্তৃত?'

'আমার মত নয়, এটা ইতিহাস আর ভূগোলের সমর্থিত একটি সত্য।'

'তবে, আপনি কি বলতে চান—আপনার জন্মভূমির মানুষরাও প্রাচীন গান্ধারের অন্যান্য অধিবাসীদের মত একদিন ধর্ম্মে হিন্দুই ছিল?'

'নিশ্চয়ই!'

'এখন আপনারা কোন ধর্ম মানেন?'

'আমার জন্মভূমির লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নি বলেই তো, মুসলমানরা

আমাদের কাফির বলে ঘৃণার চোখে দ্যাখে, সুযোগ পেলেই আমাদের হত্যা করে। কিন্তু আসলে আমাদের জাতির নাম যেমন কাফির নয় তেমনি আমাদের দেশটার নামও নয় কাফিরিস্তান।

'দেশের চারপাশের সহস্র দুধর্ষ আরব সম্প্রাদায়ক যখন ইসলামের সামনে মাথা নত করে সে ধর্মকে নিজেদের ধর্ম বলে স্বীকার করে নিতে হল, আমাদের মত ছোট্ট দেশের নগণ্য কয়েকটি মানুষ ইসলাম ধর্মকে বরণ না করেনিয়ে বেঁচে রইল কিসের জোরে?

কেবলমাত্র নিজেদের মধ্যেকার একতা আর অবিচলিত ধর্ম বিশ্বাসের ঘোরে। কিন্তু সে সব কথা পরে বলছি তোমাকে। আগে শোন, কেমন ভাবে আমি ঐ জঙ্গল আর বন্য পশু ভরা পার্ব্বত্য উপত্যকার অন্য এক ধর্মের মেয়ে হয়েও, আমার বর্ত্তমান জীবন-ধারায় এসে পৌঁছলাম।'

উদ্রগ্র আগ্রহে ঝুঁকে বসল জয়ন্ত গান্দারির দিকে। বলল—'বলুন।' আমার বাবা খুব ভাল কাঠের কাজ জানতেন। কাঠের কুর্শি-মেজ খুব ভাল বানাতেন। তাতে আবার নানারকম নকশার কাজও থাকতো। প্রায়ই শেষ রাতে আলিসাঙ্গ পেরিয়ে-উনি এপারে এসে মালদার গৃহীদের বাড়ীতে কাঠের কাজ করে পয়সা কামিয়ে, তাই দিয়ে নূন, গম, তেল, কাপড় এইসব কিনে নিয়ে, আবার রাতের অন্ধকারেই একদিন ফিরে যেতেন ঘরে। ভারী সুশ্রী চেহারা ছিল তাঁর সুন্দর ছিল শরীরের গঠন, তাই এপারে এসে কাজও পেয়ে যেতেন চটপট। কিন্তু আমার এই পোড়া রূপের জন্যেই বাবাকে একদিন অকালেই প্রাণ হারাতে হল?'

'সে কী? কেন?

'পরের দিন ছিল সারা আফগানিস্তানের স্বাধীনতা দিবসের উৎসব। দেশের সর্বত্র সেদিন পুরুষরা দলে দলে নাচবে আফগানিস্তানের জাতীয় নৃত্য 'আত্তান' নাচ। বাবার মুখে এই আত্তান (Attan) নাচের অনেক গল্প শুনেছি অনেকদিন। আফগান স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী এই নাচ নাকি আশ্চর্য্য এক উন্মাদনার সৃষ্টি করে দর্শকদের মনে। তাই, আমি বায়না ধরে বসলাম বাবার কাছে, আমাকে ঐ নাচ দেখাতে। তখন কতই বা বয়স হবে আমার, খুব জোর দশ কি এগারো। তার ওপর সবাই বলতো বয়সের চেয়েও অনেক ছোট বলে মনে হত নাকি আমায় আমার ছেলেবেলায়। বাবা চিন্তায় পড়ে গেলেন। বললেন—উনি হেঁটে আলীসাঙ্গ পার হন, আমি কি পারবো উরু পর্য্যন্ত জল ভেঙ্গে হাঁটতে, আমিযে মাথায় তখন ভীষণ ছোট। মা বললেন, আমাকে কাঁধে তুলে নিলেই তোঁ সমস্যা চুকে যায়। তখন বাবা বললেন—কাফিরদের ওপর মুসলমানদের আক্রোশ আছে। কোন কারণে, সে-আক্রোশের মুখোমুখী হলে তিনি দৌড়ে অথবা লড়াই করে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবেন হয়তো কিন্তু আমার কি গতি হবে তখন? মা বললেন—বাবা এতদিন ধরে ওপারে যাতায়াত

করছেন, ওঁকে যেমন কেউই সন্দেহ করেনি কখনো, আমাকেও করবে না। লক্ষ্য করলাম—তাঁর একমাত্র সন্তানের বায়না রক্ষা করতে রাজী হলেন বটে বাবা, কিন্তু কপালে চিন্তার রেখাগুলো মিলালো না তাঁর। সেদিনই রাতে, মা আমায় ভাল করে সাজিয়ে দিয়ে, আমার কপালে চুমু দিয়ে বিদায় দেওয়ার পরেই, বাবা এক হাতে আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে যাত্রা করলেন আলিসাঙ্গের পথে। যখন নদী পার হলাম, তখনো আকাশে জ্বল জ্বল করছিল তারাগুলো। আমার কী ভাল লাগছিল! তখন তো কল্পনাও করতে পারিনি—কী বীভৎস একটা কাণ্ড ঘটতে চলেছে আমার জীবনে। বালির চড়া ছেড়ে জমিতে উঠে সবে জনবসতির কাছাকাছি গেছি আমরা, আমাদের দিকে নজর পড়ে গেল দুই টলটলে মাতালের। স্বাধীনতা-উৎসবের দিন মদ খায় অনেকেই নাচ শুরু করার আগে। বাবা হয় তো ভেবেছিলেন, ওরাও নিরিবিলিতে বসে উৎসবে যোগ দেবার জন্যে মদ খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিচ্ছে কেবল, ওদের পাশ দিয়ে গেলে বিপদের সম্ভাবনা কোন নেই। তাই নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন কসবার দিকে। ভালভাবে ভোর হয় নি তখনও। চারপাশে কোথাও কোন মানুষের চিহ্নও নেই। মাতাল দুটোর কাছাকাছি যেতেই টলমল করতে করতে বোতল নিয়ে উঠে দাঁড়ালো তারা। হুড়মুড় করে বাবার সামনে এসে বলল এই খাপসুরুত লেড়কিটাকে কোথা থেকে চুরি করে আনছিস? বাবা বললেন—এ তাঁর নিজের মেয়ে। উনি চুরি করতে যাবেন কেন? শুনে, দুজনেই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাবার ওপরে। জড়িত স্বরে কেবল বলতে লাগলো—কামিনে, কমবক্ত চোর! নিজের মেয়েকে কেউ রাতের অন্ধকারে একনিভাবে কাঁধে করে নিয়ে পালায়? এইসব বলতে বলতে দুজনেই বাবাকে মাটিতে ফেলে, তাঁর মাথায় সমস্ত শক্তি দিয়ে মারতে থাকল বোতল দিয়ে। চোখের সামনে দেখলাম বাবার মাথা ফেটে গিয়ে মুখ মাথা রক্তে ভেসে গেল। এর পরেও রক্ষা নেই, কাবলি জুতো শুদ্ধ পা দিয়ে ওরা দুজনে লাথি মারতে লাগলো বাবার পেটে, বুকে, মুখে। নিথর নিষ্পন্দ হয়ে পড়ে থাকল বাবার দেহ। তখন মাতাল দুটো—কে আমাকে ঘরে নেবে—সেই নিয়ে শুরু করলো ঝগড়া নিজেদের মধ্যে। ঝগড়া পরিণত হল লড়াই-এ লড়াই করতে করতেই একজন ছোঁ মেরে আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে দৌড়াতে লাগল প্রাণপণে। কিন্তু মাতাল তো! কিছুদূর গিয়েই ধড়াস করে পড়ে গেল একটা পাথরের চাঁই-এ ধাক্কা খেয়ে, আমাকে নিয়েই। আমার মাথার পেছন দিকটা পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে ফেটে ফাঁক হয়ে গেল—হাত দিয়ে দেখলাম। মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল, যন্ত্রণায় চোখ ক্রমেই ঝাপসা হয়ে এলো। তার মধ্য দিয়েও দেখতে পেয়েছিলাম—ঐ দুই মাতাল জটাপটি-মারামারি করে চলেছে তখনো। কিন্তু তারপর আর আমার হুঁশ ছিল না। এই পর্যন্ত বলে, স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল গান্দারি অনেকক্ষণ। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে জয়ন্তই প্রশ্ন করলো আবার—'তারপর?'

'তারপর যখন জ্ঞান হল, দেখলাম—এতিমখানায় শুয়ে। এতিমখানার রক্ষক

জানালেন—আমার নাকি বিকার-জ্বর হয়েছিল। দেখলাম—মাথায় তখনো ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আমায় নাকি কোন এক দয়ালু মৌলভী এতিমখানায় এনে জমা দিয়ে যান। হেকিম এসেছে, মক্তবের মাষ্টার এসেছে—কতবার জানতে চেয়েছে আমার বাবার নাম, আমার বাড়ীর ঠিকানা। বাবার নাম জানতাম বলি নি। কারণ বাবার মুখেই শুনেছিলাম—কাফির পরিচয় জানতে পারলেই আলি সাঙ্গের এপারে আর রক্ষা নেই। আর ঠিকানা? গাঁয়ের মেয়ে, ঐ টুকু বয়সে, গাঁ ছেড়ে বাইরে এসেছি সেই প্রথম, আমার ঠিকানা যে কি, তখন নিজেই কি জানতাম আমি? শুনলাম হেকিম বলছেন—মাথায় ভয়ঙ্কর চোট লেগেছে, তাই নাকি আমি স্মৃতি শক্তি হারিয়েছি।'

'এতিমখানা থেকে কামাল সাহেবের কাছে এলেন কেমন করে?'

'সেও মক্তবের এক মৌলভী আর এতিমখানার অধ্যক্ষের দয়ায়। পড়া লেখায় আমার খ্যাতিতে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন কয়েক মাসের মধ্যেই ওঁরা দুইজন। দুই বছর আমি এক নাগাড়ে ছিলাম এতিমখানায়। আমার নিজের দেশে আমি একবারও যাওয়ার চেষ্টা করিনি এই দুই বছরের মধ্যে। তবে রাত্তিরে যখন মাকে মনে পড়তো, মনে পড়তো বাবার সেই রক্তাক্ত মুখের কথা, তখন খুব কাঁদতাম ফুলে ফুলে বালিশে মুখ গুঁজে। এরপর এলো সেই শুভদিন। শুনলাম এক মস্ত দানবীর মানুষ আসছেন এতিমখানা দর্শনে। তিনি নাকি রত্ন-ব্যবসায়ী নামজাদা, ধন-সম্পত্তির অন্ত নেই তাঁর। নাম মুস্তাক কামাল। ঐ এতিমখানায় তার নাকি হাজার হাজার টাকা দান আছে।' এতিমখানায় অধ্যক্ষ আমায় একান্তে ডেকে, মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহের স্বরে জানতে চাইলেন—যিনি এতিমখানা দর্শনে আসবেন তাঁর কাছে তাঁর কন্যা হয়ে আমি থাকতে রাজী কি না। মুস্তাক কামালের দুই পত্নী থাকা সত্বেও তিনি সন্তানহীন। তিনি আমায় সন্তান হিসেবে পেলে, নিশ্চয়ই সানন্দে আমাকে গ্রহণ করবেন। আমি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মক্তবের মৌলভী পাশেই ছিলেন। তিনি তখন আমার পিঠে হাত রেখে আস্তে আস্তে বললেন—দ্যাখ বেটি, তোকে ছেড়ে দিতে, অন্যের হাতে তুলে দিতে, আমাদের ছাতি ফেটে যাচ্ছে, একথা অস্বীকার করবো না। কিন্তু তোর মতন এমন সুন্দরী মেয়ে, কোরাণ-পাঠে, পড়া-লেখায় এত ভাল মেয়ের জীবন এতিমখানায় পড়ে পড়ে নষ্ট হোক এটা আমরা একেবারেই চাই না। এই দুই বুড়োর আরজ্ তুই মেনে নে বেটি। এতে আপত্তি করিস্ না। মৌলভী সাহেবের কথা শুনে আমার দুই চোখও জলে ভেসে গিয়েছিল সেদিন। ওঁদের দুজনের অকৃত্রিম স্নেহ আর মমতার কথা কোনদিন ভুলতেপারবো না-আমি।'

'তারপর কামাল সাহেব এসে নিয়ে গেলেন আপনাকে? কিন্তু, যখন আপনি জানালেন তাঁকে—আপনি কাফির, তখন তাঁর অবস্থাটা কেমন হল প্রথমে?' জয়ন্ত প্রশ্ন করলে। 'কি আবার হবে? কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে থাকলেন কেবল আমার মুখের দিকে,' গান্দারি উত্তর দিল, 'তারপর, পরম স্নেহে আমার একখানি হাত নিজের

দুই হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বলেছিলেন—তাই তোমার চোখমুখে এমন স্নিগ্ধ-কোমল লাবণ্য! আফগান মেয়েদের মধ্যে এভাবটা তো সাধারণতঃ চোখে পড়ে না বেশি। এই কথা বলার পর, একটু হেসে আবার বলেছিলেন আব্বাজান, তোমার বুঝি ভয় হচ্ছে, কাফির নামটা শুনলেই আমি তোমাকে ঘৃণা করতে শুরু করবো? না, মাজান না। যে মেয়ে সহস্র বিপদের সম্ভাবনার কথা জেনেও এমনিভাবে নিজে জীবনের সমস্ত সত্যি ঘটনাকে প্রকাশ করতে পারে, স্বয়ং ঈশ্বরও যে তাকে ভাল না বেসে পারেন না, আমি তো অতি নগণ্য একটা মানুষ!'

'প্রথম নিজের মার কাছে গেলেন কবে, কেমন করে?

'আমার দশ-এগারো বছর বয়সে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা শোনার পরে আব্বাজানই প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তবে তো তোমার মায়ের কাছে তোমার একবার যাওয়া-দরকার! কিন্তু কেমন করে যাবে? মাত্র তেরো-চোদ্দ বছর বয়েস তোমার, একা একা ঐ দুর্গম পথে তোমাকে যেতে দেবো কোন সাহসে। তাছাড়া, ঠিক কোথা দিয়ে আলিসাঙ্গ পেরিয়ে তোমাদের কাফিরিস্তানে যাওয়া যায় সহজে, সেটা তো তোমার পক্ষে বলাও কঠিন ব্যাপার! আচ্ছা, দাঁড়াও, যে দয়ালু মৌলভী তোমাকে তুলে এনে প্রথম এতিমখানায় জমা দিয়েছিলেন, তাঁর খোঁজ করছি আমি। তিনি আলীসাঙ্গের তীরের যে জায়গা থেকে তুলে এনেছিলেন তোমাকে, সেখানে যদি নিয়ে যাওয়া যায় তোমাকে, তাহলে তুমি কি পারবে একা আলীসাঙ্গ পার হয়ে—রাস্তা চিনে কাফিরিস্তানে তোমার মার কাছে যেতে?'

'যেন এক সিনেমার কাহিনী শুনছে জয়ন্ত, এমনি ব্যগ্রতা নিয়ে সে আবার শুধালো—'তারপর?'

'তারপর সত্যি সত্যি এল সেইদিন, যেদিন আব্বাজান স্বয়ং গাড়ী চালিয়ে এক নির্জন সন্ধ্যায় আমায় পৌঁছে দিলেন সেই দয়ালু মৌলভীর নির্দেশিত জায়গায়, যেখানে আমার বাবাকে অকারণেই হত্যা করেছিল ঐ মাতাল দুটো। ঐখানে পৌঁছেই আমি চিনতে পারলাম—কোন পাথরের চাঁইটায় আছাড় খেয়ে পড়েছিল সেই মাতালটা, যে আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ঘরে পালাবার চেষ্টা করেছিল।'

'কামাল সাহেব ঐখানেই গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করেছিলেন—আপনার কাফিরিস্তান থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত?'

'না। তাতে আমার বিপদ আরও বেড়েই যেত। ঐরকম জনহীন নদীর ধারে একটা মোটরকে যদি দিনের পর দিন কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে তার মনে। সেই ভেবেই আব্বাজান আমায় বলে দিলেন, ঠিক চতুর্থদিন সন্ধ্যার পরে তিনি আবার সেই জায়গায় যাবেন গাড়ী নিয়ে। আমি নদীর চরে নামবার আগে, উনি ঐখানে নমাজ পড়লেন। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করলেন আমার নিরাপত্তার জন্যে। তারপর, আট ব্যাটারীর একটি টর্চ আমার হাতে গুঁজে দিয়ে,

চিন্তাক্লিষ্ট মুখে একটু হাসি ফুটোবার বৃথাই চেষ্টা করে বললেন—খুব সাবধানে যাবে। তোমার মাকে দেখার জন্য তুমি পাগল, তাই এত বিপদের ঝুঁকি নিয়েও তোমায় ঈশ্বরের হাতে সঁপে দিলাম। রক্ষা করার মালিক তো কেবল তিনিই।' 'সেই থেকেই যাতায়াত করছেন প্রায়ই কাফিরিস্তানে?

'হ্যাঁ করছি। প্রতিমাসে একবার গিয়ে দেখে আসি মাকে। যখনই যাই, আব্বাজান নিজে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যান আমায় আলীসাঙ্গের তীর অবধি। তারপর আবার নির্দিষ্ট দিনে ফিরে এসে দেখি, রাতের অন্ধকারে নির্দিষ্ট স্থানে ঠিক তিনি গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে।'

এবার জয়ন্তের চিরকালের জিজ্ঞাসু মন একটা নতুন বিষয় খুঁজে পেলো যেন অনুসন্ধানের। প্রাচীন গান্ধার নিয়ে তার আগেও তো গবেষণা করেছে কত গবেষক, কিন্তু কাফিরিস্তান? কজন গবেষক বলতে পারবে এশিয়ার মানচিত্রে এই অদ্ভুৎ নামের দেশটার অবস্থিত ঠিক কোথায়? ওদেশের অধিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি আর ধর্মই বা কি? অথচ এই দেশের লোকচরিত্রের ওপরই টিপ্পনী কেটে বলে গিয়েছেন মোঘল সম্রাট বাবরের মত ব্যক্তিও যে, ওরা নাকি গলায় সর্বদা মদের বোতল ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ওরা নাকি পানীয় জলের পরিবর্তে ব্যবহার করে মদ। যে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সুযোগও পাননি বাবর কোনদিন, সে দেশেরই বাসিন্দাদের সম্বন্ধে এমন কথা বলতে পারেন বাবরের মত পরধর্ম্ম সহিষ্ণু মানুষ কেমন করে? যে-দেশ গান্দারির মত বিরল-প্রতিভা আর অনন্যা রূপবতীর সুতিকাগার, সে দেশ কি সত্যিই সবার ঘৃণার বস্তু হতে পারে?

'কি ভাবছো বাঙ্গালীবাবু? ভাবছো বুঝি—এক কাফির মেয়ের সঙ্গে এত ঘনিষ্টতা করে ভুল করছো তুমি?' আবার জয়ন্তের চোখের ওপর চোখ রেখে জিজ্ঞেসা করলো গান্দারি।

'না, না, না—তেমন ভাবনা একবারও এসে উঁকি দেয়নি আমার মনে, বিশ্বাস করো। আমি ভাবছি অন্য কথা।'

'কি কথা, বাঙ্গালীবাবু?'

'ভাবছি যেদেশে তোমার মত এমন উজ্জল রত্নের সৃষ্টি, সে দেশের অন্য মানুষেরা সব কেমন চরিত্রের, কি তাদের ভাষা, কোন ধর্ম মেনে চলে তারা।'

খপ করে জয়ন্তের একখানা হাত চেপে ধরে গান্দারি এবার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল—'বেশ তো, চলো আমার সঙ্গে আমার দেশে একবার। তুমি তো কত বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছো জীবনে, এবার বিষয় হিসেবে বেছে নাও না আমার দেশকে। যে-দেশ হিন্দুস্তান বলতে পাগল, অথচ যে-দেশের কথা আজ অবধি হিন্দুস্তানের কোন লোক কানেও শোনেনি হয়তো একবারও।'

'হিন্দুস্তান বলতে পাগল তোমার দেশের লোক? তারা জানে ভারতের নাম?'

'কেবল জানে? তারা যে হিন্দুস্তানকেই তাদের পূর্বপুরুসের পিতৃভূমি বলে বিশ্বাস করে। আমার কথা বিশ্বাস করতে তোমার কষ্ট হচ্ছে, আমি জানি। আর সেই জন্যেই তো তোমার হাত ধরে মিনতি জানাচ্ছি বাঙ্গালীবাবু, চলো তুমি একবার আমার জন্ম মৃত্তিকায়, যেখানে তুমিই হবে প্রথম হিন্দুস্তানী গবেষক যে প্রবেশ করে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করবে—আমরা কি, আমরা কারা। আমাদের ভাষা, ধর্ম্ম, সংস্কৃতির সঙ্গে কোন দেশের ভাষা-ধম্ম-সংস্কৃতির সবচেয়ে বেশি মিল। বলো, কথা দাও বাঙ্গালীবাবু—তুমি যাবে! আমি আব্বাজানকে বললে—তিনি আমাদের যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দেবেন। বলো, যাবে তো?'

সংকল্প গ্রহণের দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হল এবার জয়ন্তের কণ্ঠে। সে বললে নিশ্চয়ই যাবো গান্দারি, নিশ্চয়ই যাবো। তুমি বলছো তোমার দেশের লোক নাকি ভারতের জন্যে পাগল। অথচ, সত্যিই তো, আমরা তো কোনো খরবই রাখি না তোমাদের দেশের। এটা কত বড় লজ্জার কথা, গান্দারি। এও এক ধরণের পাপ। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে যদি আফগানরা ভুল বুঝে আমাকে জেল-এ দেয়, অথবা গুলি করে, তাও আমি বরণ করে নেবো হাসি মুখেই।'

আবেগে কম্পিত স্বরে গান্দারি বলল—'পুল-ই-কিস্তিতে দাঁড়িয়ে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তুমি আমায় কথা দিয়েছিলে—যখন প্রামাণ দিতে পারবো আমি, তুমি আমার সত্যিই আপনজন কিনা, তখনই তুমি আমায় তুমি বলে সম্বোধন করবে, মনে আছে?'

'আছে।'

'এইবার সেই প্রমাণ তুমি পাবে বাঙ্গালীবাবু। আমি মুখে বললে যে কথা তোমার পক্ষে হয়তো বিশ্বাস করাও কঠিন হত, নিজে চোখে দেখে, কানে শুনে, সে-কথা তুমি নিজেই বুঝে নেবে তোমার অনুসন্ধানী মন নিয়ে। দেশের পর দেশ, জাতির পর জাতি যেদিন মুসলমান হয়ে গেল, তখনও যখন আমাদের তিনটি পার্ব্বত্য উপত্যকার বাসিন্দারা নিজেদের ধর্মকে আঁকড়ে ধরে রইল, পণ করলো—মরবে তবু ধর্মত্যাগী হবে না, তখন থেকেই আমাদের ওপর এসে পড়লো আমাদের চতুর্দিকের সদ্য ইসলাম ধর্মে ধর্ম্মান্তরিত দেশগুলোর বিদ্বেষের অগ্নি-দৃষ্টি। ওরা নানা দুর্নাম রটনা করতে শুরু করলো আমাদের নামে। আমরা, কাফির, আমরা কোন ধর্ম্মেই বিশ্বাসী নই—নাস্তিক, আমাদের পুরুষেরা নাকি জলের বদলে মদ খায়, তারা নাকি অলস, ভীরু, কর্মবিমুখ। মেয়েদের নাকি নাচ-গান আর কাম চরিতার্থতা ছাড়া আর কোন গুণই নেই, আমার দেশের কোন নারীরই নাকি দৈহিক পবিত্রতা বলতে কিছু নেই। যারা মিথ্যে নিন্দা রাষ্ট্র করলো, তারা তো প্রায় বারোশো বছর ধরে অন্যায় করলোই, আর, যারা নিজেরা চোখে দেখে বিচার না করেই সেই জঘন্য নিন্দাবাদকে বিশ্বাস করলো অন্ধের মতন, আমি বলবো, অন্যায় তাদেরও কিছ কম নয়। সম্রাট বাবর যদি সত্যিই লিখে থাকেন, আমাদের পুরুষরা মদের বোতল গলায় ঝুলিয়ে বেড়ায়, তবে ভবিষ্যতের

সত্যদ্রষ্টা ঐতিহাসিকরা তাঁকেও ক্ষমা করবে না নিশ্চয়ই, তুমি দেখো।' বলতে বলতে নয়ন কোণে অভিমানাশ্রু উপচে পড়লো তার। সেই অবস্থাতেই হঠাৎ হেসে ফেলে বলল সে। 'সম্রাট বাবর তা আমার দেশের পুরুষদের মদ খাওয়ার জন্যে খুব নিন্দা করে হাততালি কুড়োলেন, আর বাবরের সম্বন্ধে ফিরিস্তা কি বলেছে জানো, বাঙ্গালীবাবু? 'কি লিখেছে।' জয়ন্ত প্রকাশ করলো!

বাবর সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ফিরিস্তা বলেছেন যে, বাবর অত্যন্ত সুরা আর রমণীতে আসক্ত ছিলেন। আমোদ করবার সময় তিনি কাবুলেরই কাছাকাছি এক প্রমোদ-উদ্যানে, একটি চৌবাচ্চা সুরা দিয়ে পূর্ণ করে, সেই চৌবাচ্চার গায়ে কবিতায় লিখে রাখতেন,

দাও সুরা পাত্র ভরা তন্বী পীন পয়োধরা
আর সবই এ জগতে জানি আমি মিছে।
করো ভোগ হে বাবর শুধু এ জীবন ভোর
এ-যৌবন গেলে চলি ফিরিবে না পিছে।'

কবিতা আবৃত্তি শেষ করেই, আবার ফিক করে হাসলো একটু গান্দারি।

চোখের পাতা জলে ভেজা, ওষ্ঠ কোণে হাসির রেখা—রূপবতী মেয়েটাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে এখন।

জয়ন্ত জিজ্ঞেসা করলো—'তাহলে, তুমি বলছো, কাফিরিস্তানে আজ পর্য্যন্ত বাইরের কোন পর্যটক বা গবেষক ঢোকে নি।'

'ঢুকেছিলেন। তবে তিনি কোনো হিন্দুস্তানী নন, নন কোন মুসলমানও। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম যিনি বাইরে থেকে প্রবেশ করেছিলেন আমার জন্মভূমিতে, তাঁর নাম ছিল মিঃ ডব্লিউ মনেয়ার, জাতিতে তিনি ইংরেজ। তাঁর আগে যেসব ইউরোপীয় ঐতিহাসিক লিখেছেন কাফিরিস্তান সম্পর্কে, তাঁরা সে সবই লিখেছিলেন আমার দেশের চার পাশের রাজ্যের মুসলমানদের কাছ থেকে শুনে। তাঁদের কেউ কাফিরিস্তানের বুকে পা রাখার প্রয়োজনও বোধ করেননি একবারও। আর, যে মুসলমানদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন ঐ প্রাচীন ইউরোপীয়রা, সেই মুসলমানরা প্রাণের ভয়েই কখনো কাফিরিস্তানে ঢুকতে সাহস পায়নি। শুধু রটনা আর কল্পনার আশ্রয়ে লেখা ঐসব প্রাচীন ইতিহাসকারদের রচিত ইতিহাস।'

'কি লিখেছিলেন ঐ প্রাচীন ইউরোপীয়ানরা তোমার দেশের বিষয়ে?'

'সব বাজে, সব মিথ্যে, সব মন গড়া কথা—বাস্তবের সঙ্গে যার কোন সম্পর্কই নেই। তবে, একটা কথা ওঁরা ঠিকই শুনেছিলেন মুসলমানদের কাছ থেকে।'

'সেটা আবার কোন্ কথা?'

'কাফিরিস্তানে কোনো মুসলমান যদি ঢুকে পড়ে কোন রকমে, প্রাণ নিয়ে তাকে আর ফিরতে হবে না।'

'কেন? যদি সেই মুসলমান নিরপরাধ হয়?'

'কে অপরাধী আর কে নিরপরাধ, সে বিচার করার ইচ্ছাই কি কারও আছে? কাফিরিস্তানের কাউকে ওদের দেশে পেলে ওরা হয় মারবে, না হয়তো কৃতদাস করে রাখবে, তারই প্রতিক্রিয়াতেই মনে হয় কাফিরিস্তান এত বেশি মুসলমান বিদ্বেষী হয়ে পড়েছে। আমার কিন্তু আমার দেশের লোকেদের এই মনোভাব একেবারেই ভাল লাগে না। বরং আমার মনে হয় আমার দেশের অধিবাসী আর বাইরের মুসলমানরা যদি মেলামেশার মধ্য দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে সত্যিকার আন্তরিকতা নিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতো, তাহলে আজও যে বৈরীতা আছে ওদের মধ্যে, তা কখনই থাকতো না। কিন্তু, এসব কথা এখন আর নয়, বাঙ্গালীবাবু, অনেক রাত হয়েছে, এবার তুমি ঘুমোও। চিন্তা কি, তুমিত কথাই দিয়েছো আমাকে—যাবে আমার দেশে। সেখানে গেলে তুমি নিজেই জেনে নিতে পারবে—কাফিরিস্তান সম্বন্ধে আরও অনেক অনেক কথা। তারপর সেসব কথা লিখবে তুমি ইতিহাসে। সারা বিশ্বের লোক জানতে পারবে তখন—এ পৃথিবীতে এমন একদল মানুষ আজও বেঁচে আছে। যারা সংখ্যায় নগণ্য হয়েও নিদারুণ দারিদ্র-দুঃখ দুর্দশায় দিনাতিপাত করেও, তাদের ধর্ম আর সংস্কৃতিকে বুকের মধ্যে করে বাঁচিয়ে রেখেছে শত শত বছর ধরে।'

'তুমি যে এমন একা একা যাওয়া আসা করো পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কাফিরিস্তানে, তোমার ভয় করে না?'

'কিসের ভয়? দুষ্টু লোকের?'

'হ্যা?'

শাড়ীর আঁচলটা একধারে একটু সরিয়ে, কোমরের কাপড়ের মধ্য থেকে চট করে বের করে আনল ছোট্ট একটি কালো কৌটোর মতন জিনিস। সেটাকে জয়ন্তের চোখের সামনে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলো গান্দারি, 'বলো তো এটা কি?

'নস্যির কৌটো।'

'দূর, আমি কি নস্যি নিই? ছোট্ট এই কৌটোর মধ্যে এমন জহের অর্থাৎ বিষ আছে, যা একবার জিভে ঠেকালে, প্রাণ বেরিয়ে যাবে তক্ষুনি।'

'সেকি? কোমরে এমন বিষের কৌটো গুঁজে রেখেছো কেন?'

'এটি আমার সব সময়ের সঙ্গী, জানো? তাই দুষ্টু লোকের ভয় আমি করিনে। এ বিষ আমার দেশের পুরুষেরা তাদের তীরের মুখে লাগায়, দুষ্মণকে খতম করবার জন্যে।'

'তুমিও কি এই বিষ দিয়ে দুষ্টু লোককে খতম করতে পারবে বলে মনে করো?'

'তা কেমন করে পারবো? মরদের সঙ্গে লড়াই করে এই জহের তার মুখে ঢেলে দেবো, তেমন শক্তি কি আমার মত মেয়ে মানুষের আছে?'

'তবে—?'

'যখন দেখবো— এ দেহের পবিত্রতা আর রক্ষা করতে পারলাম না কিছুতেই, তখন নিজেই নিজের জিভে ঢেলে দেবো এই বিষ।'

'আত্মহত্যা করবে?'

'আত্মহত্যা বলছো কেন, বাঙ্গালীবাবু? বলো, আত্মরক্ষা। এই বিষ খেয়েই আমি নিজের পবিত্রতাকে রক্ষা করবো। আমারই রক্তের মেয়েরা একদিন শত্রুর হাতে সতীত্ব নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় হাসতে হাসতে জহের ব্রতে মৃত্যু বরণ করেছিল রাজপুতনায়, পড়োনি সে কথা ইতিহাসে?'

'তোমারই রক্তের মেয়েরা?'

'অবাক হচ্ছ না?' আবার হাত দুখানা চেপে ধরলো জয়ন্তের, তারপর বলল— 'যাচ্ছই তো আমার সঙ্গে আমার দেশে তুমি। ওখানে সব যখন জানা আর বোঝা শেষ হবে, তখন দেখবে আমার কথায় অবাক হতে পারবে না কিছুতেই। কিন্তু আজ আর কথা নয়, বাঙালীবাবু, এবার তুমি শুয়ে পড়ো।' এই বলে সবে খাট থেকে নামতে যাবে গান্দারি। ছিটকানি তুলে দেওয়া ঘরের দরজায় ঠকঠক আওয়াজ শোনা গেল। কে যেন ধাকাচ্ছে দরজা বাইরে থেকে। গান্দারি খাটেই বসে রইল, খাট থেকে নেমে জয়ন্ত গিয়ে দরজা খুলে দিল। তারপরেই বিস্মিত স্বরে বসে উঠল, 'কি ব্যাপার মিঃ খাঁ? আপনি? এতরাত্রে—কান্দাহার থেকে এত দূরে?'

গোলাম হায়দরের ভ্রাতুষ্পুত্র আমানুল্লা খাঁ বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে দেখে নিল— গান্দারি খাটের উপর বসে।— এক বহিরাগত যুবাপুরুষের নৈশশয্যায় বসে আছে হাসিভরা মুখ নিয়ে সেই ঘরে— যে ঘরের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করা ছিল ভেতর থেকে। লায়লা তো তবে মিথ্যে বলেনি! বাড়িয়ে বলেনি একটুও!

আমানুল্লাকে দেখেই খাট থেকে নেমে গিয়ে গান্দারি জিজ্ঞেসা করলো, 'কি আমানুল্লা ভাই, হঠাৎ এলে যে?'

আমানুল্লা জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসে আপনাদের ডিসটার্ব করলাম বুঝতে পারছি। আমায় ক্ষমা করবেন। কি করবো, গোলাম হায়দার সাহেব যে পাঠালেন আপনাদের কোনরকম অসুবিধে হচ্ছে কিনা দেখতে।'

জয়ন্ত বলল, 'ডিসটার্ব আবার কিসের? এসেছেন যখন, আসুন না, কিছুক্ষণ বসে, তারপর না হয় ফিরবেন।'

'তার উপায় নেই মিঃ মুখার্জি, ফিরতে হবে আমায় এখনই। আচ্ছা আপনারা তবে আবার দরজা বন্ধ করে কথাবার্তা শুরু করুন, আমি চলি, গুড নাইট!' ঝড়ের বেগে উধাও হলেন গোলাম হায়দারের ভ্রাতুষ্পুত্র। লায়লা যা বলেছিল, তা হয় তো কেবলই নারীমনের ঈর্ষার ফলশ্রুতি এমনি একটা ভাব এখানে এসে পৌঁছবার পূর্ব্বমুহূর্ত পর্য্যন্ত— তার প্রতিহিংসা বিক্ষুব্ধ অন্তরে বাসা বেঁধেছিল। এখন, এই অর্গলবদ্ধ ঘরে, একই শয্যায় বসে থাকা জয়ন্ত আর গান্দারিকে দেখার পর সে প্রতিহিংসার আগুনেই

যেন ঘৃতাহুতি পড়লো। জয়ন্ত বেশ লক্ষ্য করলো—আমানুল্লা যখন গুডনাইট শব্দটা উচ্চারণ করলো, তখন তার গলার শিরাগুলো ফুলে উঠেছে, চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে, আর দুই চোখে ধিক ধিক জ্বলছে নগ্ন বীভৎসতার স্ফুলিঙ্গ।

মুস্তাক কামালের সাহায্যেই অবশেষে একদিন সন্ধ্যার কিছু পরেই, আলিসাঙ্গ পার হয়ে জয়ন্ত গান্দারির সঙ্গে তার জীবনের এক সম্পূর্ণ অকল্পিতপূর্ব্ব অধ্যায়ের সূচনা করলো কাফিরিস্তানের অভিমুখে যাত্রা করে। মুস্তাক কামাল স্বয়ং গাড়ী চালিয়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন তাদের নদীর তীর পর্যন্ত। বলে দিয়েছিলেন—চতুর্থ দিনে সন্ধ্যার পরে আবার তিনি গাড়ী নিয়ে প্রতীক্ষায় থাকবেন জয়ন্ত এবং গান্দারির প্রত্যাবর্তনের।

বালি আর পাথরের কিছুটা পথ পার হতেই শুরু হল জঙ্গল। বেশ বোঝা গেল—ধীরে ধীরে তারা প্রবেশ করছে এক দীর্ঘ উপত্যকায়। গান্দারির উৎসাহ যেন আর বাগ মানতে চাইছে না। বর্ষায় পার্ব্বত্য নদী যেমন আচমকা জলোচ্ছ্বাসে দূরন্ত বেগে ধেয়ে চলে তার নিজের প্রবাহ পথে, গান্দারির অবস্থাও অনেকটা সেই রকমই। তার দেশে নিয়ে যেতে পারছে আজ প্রথম এক হিন্দুস্তানীকে—এর চেয়ে বড় গৌরব তার যেন আর কিছুতে নেই। জয়ন্তের একটা হাত ধরে টানতে টানতে প্রায় ছুটে চলল সে। উপত্যকার পর উপত্যকা পার হচ্ছে, আর বলছে—এই যে বসতি দেখছো এখানকার বাসিন্দাদের বলা হয় পণ্ডিত, এ-জায়গার লোকদের বলা হয়—গম্বীর, ঐ দূরে যে মিট মিট করে আলো জ্বলছে দেখতে পাচ্ছ, ওদের নাম কত্তার। বাঁ দিকের পাহাড়ের ওপর যারা থাকে—তাদের ডাকা হয় অরণস নামে।

একটু আশ্চর্য্য লাগল জয়ন্তের জনপদগুলোর নাম শুনে। পণ্ডিত, গম্বীর, কত্তার, অরণস—কোন নামেই ফার্সি-আরবী-পস্তু বা তুর্ক ঘেষা নয়তো!

গান্দারি বলল—'লক্ষ্য করছো তো, এখানকার কোন জনপদের বাসিন্দারই নাম কাফির নয়, কাফির নামটা মুসলমানদের বিদ্বেষ থেকে সৃষ্টি।'

'কিন্তু, এরা তবে কারা। কারা ছিল এদের পুর্বপুরুষ?'

'আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে যে পণ্ডিতরা ইতিহাস লেখেন, তাঁদের কেউ কোনদিন এদেশে ঢোকার চেষ্টামাত্র না করেই, আবিষ্কার করে বসে আছেন যে, কাফিরিস্তানের সব মানুষই পারস্যের গবর জাতির মত আচার ব্যবহার-বিশিষ্ট কোন এক আরবীয় জাতি। কেউ কেউ আবার ঘোষণা করেছেন—কাফিররা নাকি আলেকজান্দারের সঙ্গে যে গ্রীক সৈন্যরা এসেছিল, তাদেরই ঔরসে উৎপন্ন হয়েছে। এমন কথা কেন ঘোষণা করেছে জানো? আমাদের একমাত্র অপরাধ আমাদের নারী পুরুষ সকলেরই গায়ের রং একটু লালচে-ফর্সা। কিন্তু, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ মনেয়ার এই কাফিরিস্তানে আসার পরে, আরও যে ক'জন ইউরোপীয় অনুসন্ধানী এসেছিলেন এ-দেশে, তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলে গেছেন, কাফিররা কখনই আরব বা আফগান রক্তের বাহক নয়, এরা নিশ্চয়ই কোন ভারতীয় বংশোদ্ভব। তাঁরা কাফিরদের ধর্মাচরণের রীতি, তাদের দৈনন্দিন

জীবন, তাদের মানসিকতা—সব কিছুর মধ্যেই প্রাচীন হিন্দুস্তানের ভাব ধারার প্রতিফলন দেখে বিস্মত হয়েছেন। আর, সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছেন কাফিরদের ভাষা বিশ্লেষণ করে। এ ভাষার মধ্যে আরবী, ফার্সি বা তুর্কী ভাষার নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নেই। বরং ওঁদের সুস্পষ্ট অভিমত হচ্ছে এই যে, কাফিরিস্তানের ভাষার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মিল খুঁজে পাওয়া যায় যে ভাষায়, তা হচ্ছে সংস্কৃত।'

কিছুক্ষণ নিঃশব্দেই পথ অতিক্রম করতে লাগল দুজনে। ভারী ভাল লাগছিল জয়ন্তের রাত্রের অন্ধকার—মুস্তাক কামালের দেওয়া আটসেলের টর্চের তীব্র আলোতে ফুটে ওঠা চারপাশের বিশাল বৃক্ষ আর বিরাট পর্বতে ঘেরা পরিবেশটিকে। চড়াই-উৎরাই-এর পথ। আকাশের মখমলে ঝলমল করছে তারার বুটি।

চলতে চলতে জয়ন্তই প্রশ্ন করলো আবার—'একটু আগেই আপনি যে জাতিগুলোর নাম করলেন—ঐ যে পণ্ডিত, গম্বীর, আরণস—ওরাও কি কাফিরিস্তানেরই লোক?'

'নয় তো কি? আমরা তো এখন কাফিরিস্তানের মধ্যে দিয়েই যাচ্ছি, কিন্তু কাফির নামের একটাও জাতি অথবা সম্প্রাদায় কি দেখতে পাচ্ছ এখানে?'

আপনারাকি তবে ধর্মে হিন্দু বলতে চান? না হলে, পণ্ডিত নাম হবে কেন 'আপনারাদের এক সম্প্রদায়ের!'

'আমি নিজের মুখে নিজেদের সম্পর্কে কিছুই বলতে চাই না, বাঙ্গালীবাবু, আমি কেবল বিবরণ দিয়ে যাবো এই দেশের বিষয়ে। আমাদের সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব তোমারই। তোমার গবেষকের চোখ, আসল সত্য ধরা দেবেই তোমার কাছে।'

'কেবল মুসলমান নন বলেই আপনাদের দেশের নাম মুসলমানরা রেখেছে কাফিরিস্তান? কই, ভারতেও তো সকলে মুসলমান হয়ে যান নি, সেখানে তিন চতুর্থাংশ মানুষই হচ্ছে হিন্দু, কিন্তু সে দেশের নাম তো মুসলমানরা কাফিরিস্তান দেয় নি?'

'কেমন করে দেবে? তোমরা সংখ্যায় সারা পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান-রাজ্যের সম্মিলিত লোকসংখ্যার চেয়েও বোধ হয় বেশি। তোমার দেশের আয়তন বিশাল। তোমাদের রয়েছে মুসলমানদের চেয়ে ঢের বেশি প্রাচীন গৌরবময় এক ইতিহাস আর ঐতিহ্য। তোমাদের দেশের নাম পাল্টে কাফিরিস্তান রাখার শক্তি বা সাহস কি কোন জাতির হতে পারে? তবু তোমার দেশের হিন্দুদেরকেও কাফির বলতে শুনেছি আমি অনেক মুসলমানকেই। হিন্দুধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোন বস্তুকে কাফির বলতেই সাধারণভাবে ভারতের বাইরের মুসলমানরা অভ্যস্ত। কেন, অখণ্ড হিন্দুস্তানের মধ্যে যখন সিন্ধুপ্রদেশ ছিল, তখন ঐ প্রদেশেরই অন্তর্গত মেহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের একটা উপত্যকার নাম মুসলমানরা যে কাফির কোট রেখেছিল, তা বুঝি জানো না? সে উপত্যকার নাম আজও কাফির কোটই আছে। কেন বলো তো? ঐ উপত্যকায় পাহাড়ের গায়ে গায়ে বড় বড় কৃত্রিম ধাপ আছে। ঐ ধাপগুলোর ওপরে গমের ফলন

খুব ভাল হয়। যেহেতু ঐ ধাপগুলোর মধ্যে মধ্যে প্রাচীন হিন্দু দেব দেবীর প্রচুর মুর্ত্তি আজও পড়ে আছে, তাই ঐ গোটা উপত্যকারই নাম রেখেছে মুসলমানরা, কাফির কোট। এখন তোমাকেই অনুমান করে নিতে হবে, কাফির নামের কোন জাতি বা সম্প্রদায় না থাকা সত্ত্বেও, কেন আমার জন্মভূমিকে আমাদের চারধারের মুসলমান-রাজ্যের মানুষরা ডাকে কাফিরিস্তান বলে।' আবার চলল নিঃশব্দে পথ চলা মিনিটের পর মিনিট। জয়ন্তের হাত টেনে নিয়ে চলেছে গান্দারি তখনও। 'আপনাদের এই দেশের লোক সংখ্যা কত?' চলতে চলতেই জয়ন্তের প্রশ্ন।

'মিঃ ডব্লিউ মনেয়ারের বিবরণ অনুযায়ী ওঁর সময়ে কাফিরিস্তানের লোকসংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ, এখন তার চাইতে অনেক বেশি। উনি লিখেছিলেন—প্রতি গ্রামে একশো থেকে ছয়শো প্রর্য্যন্ত লোকের বাস। এখন তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাবে—কোনো গ্রামেই দেড়-দু হাজারের কম নেই। মনেয়ারের পরে যে ইউরোপীয়রা এসেছিলেন, তাঁরা তো লিখেছেনই এমন কি মনেয়ারও সুস্পষ্টভাবে বলে গেছেন—কাফিরিস্তানে বহু বিবাহ একেবারেই দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ তুমি তো জানো বাঙ্গালীবাবু, মুসলমান সমাজের বহু বিবহারে রীতি চলে আসছে প্রায় তেরো শো বছর ধরেই।'

'মনেয়ার আর কি লিখেছেন আপনাদের বিষয়ে?'

'লিখেছেন, কাফিরিস্তানের লোকেরা সুপুরুষ, সাহসী ধর্মপ্রাণ এবং কৃষিজীবি। এদের মেয়েরা অতিশয় রূপলাবণ্যবতী। মেয়েরা পুরুষদের সাহায্য করে ক্ষেত আর বাগানের কাজে। কাফিরিস্তানের মানুষদের মধ্যে আত্মকলহ এবং যুদ্ধবিগ্রহজনিত রক্তপাত কখনো হয় না। পার্শ্ববর্তী মুসলমানরা যদিও এদের কাফির বা শিয়াপোষ বলে অভিহিত করে, কিন্তু আসলে ও দুটোর কোনটাই এদের আসল নাম নয়!'

'মুসলমানরা তবে আপনাদের কেবল কাফিরই বলে না, শিয়াপোষও বলে?'

'তা তো বলেই। আমাদের পূর্বপুরুষদের অনেকেই শিবপুজো করতো যে! সারা আরবাঞ্চলেই যেমন ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন হওয়ার আগে শিবলিঙ্গের পুজো প্রচলিত ছিল। শিবের পোষ্য অর্থাৎ শিবের কৃপায় লালিত পালিত বলে, অন্যান্য সম্প্রদায় বহু প্রাচীন কাল থেকেই আমাদেরকে শিয়াপোষ বলে ডাকতো। প্রাচীন গান্ধারেও প্রচুর শিবলিঙ্গ এবং শিবের মূর্তি পাওয়া গেছে—তুমি তো জানোই।' 'আচ্ছা, আপনাদের দেশের কোনো সম্প্রদায়ই কি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি!'

'একটি মাত্র সম্প্রদায়ের কিছু কিছু লোক কাফিরিস্তান আর আফগানিস্তানে—দুই দেশের মেয়েদেরকে বিয়ে করে। ঐ সম্প্রদায়ের নাম চুগুনি। আমরা ওদের ডাকি নিম্বা (বর্ণশঙ্কর) বলে। চুগুনিরা সাধারণতঃ পথপ্রদর্শকের কাজ করে। কুন্দ পর্বত অঞ্চলেই ওদের বাস বেশি। ওদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ মুসলমান হয়েছে শুনতে পাই। তবে, ওরা পথপ্রদর্শকের কাজ করে বলেই, কাফিরিস্তানে প্রবেশে ওদের কেউ বাধা দেয় না।'

'আপনারা কাকে ট্যাক্স বা কর দেন? কোন রাজ্যের অধীনে আপনারা?'

'আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। আফগান, তুর্ক বা ইংরেজ কাউকেই আমরা কর দিইনি কোনদিন। সিন্ধু আর অক্সস (আমুদরিয়া) নদীর মধ্যে প্রায় সমস্ত গিরিবর্ত্মেই প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের পুরুষদের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ। হিমালয়ের শেষপ্রান্ত থেকে আমুদরিয়ার তীরবর্তী বদকসানের পার্বত্য প্রদেশ আর হিন্দুকুশ পর্বতমালায় এখনও আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিকার ছড়িয়ে আছে। এমন কি কাবুল নদীর উৎপত্তিস্থলের কাছাকাছি কয়েকটি গিরিপথেও আমাদের লোকেদের বাস।

'কোনও রাজা তো নিশ্চয়ই আছে আপনাদের?'

'না। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই আছে এক একজন সর্দার। মিঃ ম'নেয়ার লিখেছিলেন আঠারো জন সর্দারের কথা। এখন বেড়ে হয়েছে তেত্রিশজন।'

'তার মানে, তেত্রিশটা সম্প্রদায়ে বিভক্ত আপনারা?'

'বিভক্ত বললে ভুল হবে, মনে হয়। তোমাদের যেমন ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, বৈশ্য, এইরকম সব সম্প্রদায় আছে, তবু তোমরা এক, তোমরা হিন্দু। আমাদেরও ঠিক সেই রকম। বিপদে আপদে আমাদের সব সম্প্রদায়ের সর্দাররা এক হয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে, কাজ করেন।'

'আপনাদের পুরুষেরা মদ খায় না?'

'কেন খাবে না। আঙ্গুরে ভরা আমাদের উপত্যকাগুলো। খাঁটি আঙ্গুরের রস থেকে যে মদ তৈরি হয়, তাই তারা খায় উৎসবে-পার্বনে। তাই বলে, গলায় মদের বোতল ঝুলিয়ে বেড়ায় না তারা সব সময়, জলের বদলে মদও ব্যবহার করে না।'

ঐ তেত্রিশটা সম্প্রদায়ের মধ্যে, কোন্ সম্প্রদায়ের প্রতাপ সবচেয়ে বেশি আপনাদের মধ্যে? যে তেত্রিশটা সম্প্রদায়ের তেত্রিশজন সর্দারের কথা বলেছি একটু আগে, তাদের মধ্যে প্রধান সম্প্রদায় কিন্তু তিনটি। বাকী আর সবকটিকেই উপ-সম্প্রদায় বা এই প্রধান তিন সম্প্রদায়ের শাখা বলা যেতে পারে। যেমন, আলি চাচার (সৈয়দ মুজতবা আলি) মুখে শুনেছি—তোমাদের কায়স্থব্রাহ্মণদের মধ্যেও নাকি উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী কুলীন, বরেন্দ্র, বঙ্গজ—এইরকম নানা শাখা-প্রশাখা আছে।'

'তা আপনাদের সেই প্রধান তিন সম্প্রদায়ের নাম কি?'

'তিনটি উপত্যকা থেকে এখনাকার তিনটি প্রধান সম্প্রদায়ের নামকরণ হয়েছে। তাদের নাম—রামগল, বৈগল, আর বাসগল। এদের মধ্যে বৈগল যারা, তারাই সবচেয়ে বেশি পরাক্রান্ত আর ওদের উপত্যকাও সবচেয়ে বড়।'

'আপনি নিজে কোন সম্প্রদায়ের?'

'বাসগলের। আমরা বাসব বা ইন্দ্র পুজো করি, তাই আমরা বাসগল। বৈগলরা বৈলোচনের পুজো করে। আর রামগলরা শ্রীরামচন্দ্রের বেশি ভক্ত।'

ক্রমেই জয়ন্তের বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। গান্দারির শেষ কথাগুলো শোনার পর, তার মুখ দিয়ে আর কথাই বেরুতে পারলোনা অনেকক্ষণ। বলছে কি মেয়েটা?

চারিদিকে যাদের মুসলমানদের দেশ থৈ থৈ করছে, তারাই আজও করে চলেছে ইন্দ্র, বৈলোচন আর শ্রীরামচন্দ্রের পুজো—এই হিমালয় আর হিন্দুকুশের নিভৃত উপত্যকা আর গিরিবর্ত্মগুলোর মধ্যে বসে, সকলের অলক্ষ্যে! গান্দারি আবার বলল, তবে একটি উৎসবে এখনও আমরা সমস্ত সম্প্রদায় এক হয়ে আনন্দে মেতে উঠি—সেটা হয় বসন্তকালের একেবারে শেষে, সে উৎসবের নাম শিয়াবিন্দে। অর্থাৎ শিবকে বিদায় সম্বর্ধনা জানানো। আমার দেশের সকলের বিশ্বাস—বসন্তকালের শেষে ঠাণ্ডা যখন কমে যায়, শিয়া বা শিব তখন কৈলাসে ফিরে গিয়ে যোগধ্যানে বসেন। আবার হেমন্তের আরম্ভে শিয়া নেমে আসবেন আমাদের মধ্যে।'

জয়ন্তের মনে পড়ে গেল—চৈত্র সংক্রান্তির কথা। কেবল বাংলায় নয়, সারা ভারতেই প্রায়, বসন্তকালের শেষের ঐ দিনটায় শিবকেন্দ্রিক একটা না একটা কোন উৎসব হতে দেখা যায় বটে।

জয়ন্ত জানতে চাইল, আপনার দেশে মেয়েদের অবস্থা কেমন? সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে যে অবরোধ প্রথা আমরা দেখতে পাই, আপনাদের অন্দর মহলেরও কি সেই অবস্থা!'

'একেবারেই নয়। যাচ্ছই তো, দেখতে পাবে সব। এখানে মেয়েদের যথেচ্ছ ভ্রমণে কোন বাধা নেই, মাথায় ঘোমটা দেওয়ার রীতি নেই। শুধু মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে বসে মদ খেতে পারবে না। নিষেধ বলতে ঐ টুকুই।'

'আর বিধবাদের কি অবস্থা?'

'কোন মেয়ে যদি তার বয়েস পঁয়তাল্লিশ হবার আগেই বিধবা হয়, তাহলে সে দুটি মাত্র শর্ত মানলেই আবার বিয়ে করতে পারবে! প্রথম শর্ত—গ্রাম প্রধানের অনুমতি। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যে পুরুষ এই বিধবাকে বিয়ে করবে তাকেও বিপত্নীক হতে হবে এবং সেই পুরুষকে তার এবং বিধবার দুই গ্রাম প্রধানের কাছে কথা দিতে হবে যে, ঐ বিধবার আগের পক্ষের ছেলে-মেয়ে যদি থাকে, তবে ঐ পুরুষ তাদের পিতা হয়ে তাদেরও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেবে।'

হাত ঘড়ির ওপর টর্চ ফেলে দেখে নিল জয়ন্ত—তারা কতক্ষণ এমন বিরামহীনভাবে এত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হাঁটছে। রাত সাড়ে তিনটে। দূরে পাহাড়ের গায়ে কতকগুলো মিটি মিটি আলোর সারি দেখিয়ে গান্দারি বলল—ঐ আমাদের উপত্যকা—বাসগল। আর আধ ঘন্টা হাঁটলেই আমরা পৌঁছে যাবো ওখানে।

গ্রামে ঢোকার মুখেই পাহাড়ী মাটিতে তৈরী একটি তোরণের মত করা। হাত দিয়ে দেখল জয়ন্ত, মাটি বটে, কিন্তু তা যেন সিমেন্টের মত শক্ত। টর্চ ফেলে দেখল তোরণের দেওয়ালে লাল রং-এ আঁকা ঠিক আমাদের স্বস্তিকার মত দেখতে পর পর সাজানো অনেকগুলি নক্সা। তোরণের ওপাশে যেতেই, দুই দিক থেকে বিরাট চেহারার পাগড়ীধারী দুইজন এসে দাঁড়ালো। প্রত্যেকের এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে টিনের

তৈরী চারকোণা লণ্ঠন জাতীয় আলো। কাছে এসে দু'জনেই আলো দুটো তুলে দেখে নিল সদ্য প্রবিষ্টদের মুখ। গান্দারিকে চিনতে পেরেই দুজনের ঠোঁটেই হাসি ফুটে উঠল। গান্দারি গড় গড় করে কি সব বলে গেল ওদেরকে, এক বর্ণও প্রায় বুঝতে পারলো না জয়ন্ত। শুধু একটি শব্দ কানে এসে ধাক্কা দিল কয়েকবার। সে শব্দটি হচ্ছে হিন্দুস্তানী।

পর মুহূর্তে, হাতের লাঠি-লণ্ঠন মাটিতে নামিয়ে রেখে লোক দুটি এগিয়ে এসে চেপে ধরলো জয়ন্তর হাত। সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল—'আ হো আ হো হিন্দুস্তানী ভেতরো।' চাপা হাসি মুখে নিয়ে গান্দারি বলল—এদের আজ রাত ডিউটি পড়েছে এই ফটকে পাহারা দেবার। তোমায় ওরা অভ্যর্থনা জানাচ্ছে—এসো এসো আমাদের হিন্দুস্তানী ভাই বলে। এই কাফিরিস্তানে, তোমার আগে আর কোনো হিন্দুস্তানী আসে নি বাঙ্গালীবাবু।'

প্রহরী দুইজন সোরগোল তুলতে তুলতে দৌড়াল। পায়ের নাগরা জুতোর ভারী আওয়াজে রাত্রি শেষের গ্রাম্য নৈঃশব্দ্য মুহূর্তে ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গেল। এক বিরাট চত্বরে দাঁড়িয়ে অদূরস্থ, গম্বুজ শোভিত একটি ইমারত দেখিয়ে গান্দারি বলল—ওটাই ইন্দ্রদেবের মন্দির! এখানকার ভাষায় ইন্ত্র-দেওলু। এখানে ইন্দ্রকে বলে ইন্ত্র, দেবালয়কে-দেওলু। সংস্কৃতের সঙ্গে কত মিল দেখতে পাচ্ছ এই ভাষার!' জয়ন্ত জিজ্ঞেস করলো—'তুমি বলেছিলে, তোমার বাপ্ মা-এর দেওয়া নাম হচ্ছে—ইন্ত্রা। ইন্ত্রা কি তবে ইন্ত্ররই স্ত্রীলিঙ্গ? মানে ইন্দ্রাণী?'

একটু লজ্জা পেল মনে হ'ল গান্দারি। চোখের দৃষ্টি নীচে নামিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'নামের অর্থ তুমি ঠিকই ধরেছো, কিন্তু ঐ নামই সার। ইন্দ্রাণীর মত হতে পারলাম কই?' একটু থেমে, আবার চোখ তুলে কথা কইল সে, 'এই যে সিমেন্টে বাঁধানোর মত ঝক্ ঝকে মস্ত চত্বর দেখছো, এটার এ-অবস্থা হয়েছে কিন্তু এক রকমের পাথুরে মাটি বছরের পর বছর লেপার ফলে। এই জায়গাটাই হচ্ছে সমস্তটা গ্রামের প্রাণকেন্দ্র। আনন্দে উৎসবে, দুর্ভিক্ষে-মহামারীতে, দুষ্মনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শলা-পরামর্শ, কারও মৃত্যু হলে, নতুন কোন শিশু জন্মালে—সবাইকে আসতে হবে এখানেই—এই ইন্ত্র-দেওলুতে। ঐ প্রহরী দুটোর মুখে খবর রটে যাবে এখনই গাঁয়ের প্রতি ঘরে ঘরে। সবার কানে পৌঁছে যাবে তাদের হিন্দুস্তানী অতিথির আগমন-বার্তা। আর, তার পরেই দেখতে পাবে—কেমন ভাবে ছুটে আসবে সকলে তোমাকে তাদের প্রাণের অভ্যর্থনা জানাতে। হিন্দুস্তানের কোন মানুষ যে এখানে আসবে কখনো—এমন কথা কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছে ওরা?'

হঠাৎ নজর পড়লো জয়ন্তের অনেকটা হাঁড়ি কাঠের মত দেখতে একটি জিনিসের ওপর। চত্বরের দক্ষিণ দিকে ওটা পোঁতা। ওটা কি জানতে চাইতে, গান্দারি বলল—ওটাকে এদেশীয়রা বলে বিল্লা লাগরে। তোমাদের বলি-শব্দটা, এদের জিভে বিল্লা হয়েছে। আর লাক্‌রী-(কাঠ) হয়েছে লাগরে। অর্থাৎ যুপকাষ্ঠ। আগামীকাল তো

শনিবার! কাল দেখবে এখানে ভেড়া বলি দেওয়া হবে। এই বলি দেবার নিয়ম জানো তো? মুসলমানরা সব পশু বা পাখী হত্যা করার সময়, পশুর গলায় আড়াই পোঁচ লাগিয়ে জবাই করে ফেলে রেখে দেয়। পশু অথবা পাখীটা আধকাটা গলা নিয়ে যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়ে পেয়ে শেষে মরে। আমাদের কিন্তু সে নিয়ম নয়। আমরা যখন পশু বলি দি কোন মন্দিরে, তখন এক কোপে কেটে ফেলতেই হবে সেই পশুর মাথাকে। যদি দুই কোপ দিতে হয়, তাহলে সে-পশুর মাংস আমাদের কেউ খাবে না। সেই মাংস তখন অপবিত্র বলে ধরে নেবে সকলে।'

'তাই নাকি?' বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের চমকে প্রায় অভিভূত জয়ন্ত বলে উঠল—-'আমাদের দেশেও বলিদানে তো ঠিক এই রীতিই মেনে চলি আমরা।'

'এইবার তো প্রমাণ পাচ্ছ—তুমি আমার আপনজন কিনা বাঙ্গালীবাবু?' আবেগরুদ্ধ স্বরে বলল এবার গান্দারি,—'পুল-ই-কিস্তিতে দাঁড়িয়ে সেদিন সন্ধ্যায় তুমি কথা দিয়েছিলে, যেদিন প্রমাণ দিতে পারবো তুমি সত্যিই আমার অতি আপনজন, সেদিন তুমি আমায় আর আপনি-আপনি করবে না। আজ তো প্রমাণ পেয়ে গেলে! আজ তো ভাল করেই বুঝতে পারছো—তোমার শরীরে হিন্দুস্তানের যে রক্ত বইছে, আমরা, এই কাফিরিস্তানের বাসিন্দারাও সেই রক্তেই তৈরী। তোমাদের দেব-দেবীর অনেকেই আমাদেরও দেব-দেবী। তোমাদের ধর্মের রীতি-নীতির সঙ্গে আমাদের ধর্মের কত মিল! তবে, এখনও কেন তুমি আমাকে তুমি বলবে না?'

'বলবো, গান্দারি, এখন থেকে নিশ্চয়ই তোমাকে আমি তুমি-সম্বোধনই করবো।' জয়ন্তের কণ্ঠেও আবেগেরই উত্তাপ, 'তুমি যদি এত কষ্ট স্বীকার করে, আজ দয়া করে আমাকে এখানে টেনে নিয়ে না আসতে, কেমন করে জানতে পারতাম আমি আমাদেরই প্রাচীন ধর্ম্ম-সংস্কৃতিকে বুকে নিয়ে আমাদেরই একদল পরিজন হিমালয়-হিন্দুকুশের পার্বত্য উপত্যকায় আর অরণ্য, কত বাধা-কত-বিঘ্নকে তুচ্ছ করে আজও বেঁচে আছে সসম্মানে মাথা তুলে?'

বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না, না। ছি-ছি। দয়া করে এনেছি বলছো কেন? বরং তুমি দয়া করে যে পা রেখেছো আজ ভারতের বিস্মৃত পরিজনদের এই জঙ্গল আর পাহাড় ঘেরা ডেরায়, এতে আমারই ধন্য মনে করছি নিজেদের।'

ঝাঁ করে একটা কথা মনে এসে গেল জয়ন্তের। আচ্ছা, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘের মত মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলি কেন এসে দাঁড়ায় না একবার এদের মধ্যে। ঐ দুই প্রতিষ্ঠানের প্রজ্ঞাপ্রবীণ সন্ন্যাসীরা তো সারা পৃথিবীতেই আজ উড়িয়ে রেখেছেন হিন্দু ধর্ম এবং সংস্কৃতির বিজয়কেতন? তবে তাঁদের দৃষ্টি আজও কেন পড়েনি—এই অবহেলিত, অবজ্ঞাত হিন্দুগত প্রাণ মানব গোষ্ঠির ওপর?

সকালের আলো যখন ফুটল, ইন্দ্র-দেওলুর বিশাল চত্বর তখন লোকে লোকারণ্য। সকলের হাতেই কিছু না কিছু উপহারের সামগ্রী। মেয়েদের অনেকে ঘাঘরা পরেছে,

শালওয়ার-পরিহিতার সংখ্যাই বেশি। পুরুষদের সবার মাথাতেই রং বে রং-এর পাগড়ী। ডান কানে মাকরি। একজন বর্ষিয়সী মহিলা এসে দাঁড়াতেই, গান্দারি পরিচয় করিয়ে দিল— 'ইনি ভাগোতি-আম্মা। আমাদের গ্রাম প্রধানের স্ত্রী। ভাগোতি মানে বুঝলে? তোমরা যাকে ভগবতী বলো।'

ভাগোতি সোজা এসে চারটে বড় বড় আপেল জয়ন্তের হাতে তুলে দিয়ে, হাসিমুখে বললেন—'চুট।' চমকে উঠল জয়ন্ত। কাশ্মীরীরাও তো অপেলকে আজও চুট-ই বলে!

গান্দারির মা আগেই এসে, একধারে নীরবে হাত যোড় করে দাঁড়িয়েছিলেন। একদিকে আঙ্গুল দেখিয়ে তিনি কি সব যেন বলে গেলেন জয়ন্তের দিকে চেয়ে। — কিছুই বোঝা গেল না প্রায়, কেবল কোল আর কদল—এই দুইটি শব্দকে পরিচিত বলে মনে হল যেন কিছুটা। জয়ন্ত জিজ্ঞেসা করল গান্দারিকে—'তোমার মা যে কোল বল্লেন কদল বল্লেন। তোমরাও কি কাশ্মীরীদের মত খালকে কোল বলো, আর সেতুকে বলো কদল?'

'তুমি ঠিক ধরেছো বাঙ্গালীবাবু! মা বল্লেন—ঐ খালের ওপরকার সেতুটা পার হলেই আমাদের ঘর। কাশ্মীরীরাও তবে কোন কদল শব্দ ব্যবহার করে?'

অল্পক্ষণের মধ্যেই হলুদ রং-এর আচকানের মত পরা, এক বৃদ্ধ এলেন। পাকা চুল চুড়ো করে বাঁধা। পাকা দাড়ি, পাকা গোঁফ—কিন্তু নগ্ন পদ। এত বয়সেও গাত্র বর্ণের উজ্জ্বলতা এতটুকুও ম্লান হয় নি। এসেই একগাল হেসে, জয়ন্তের মাথায় দুই হাত রেখে, অনুচ্চস্বরে বিড় বিড় করলেন তিনি—সাস্তে, সাস্তে, সাস্তে।

গান্দারি কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো—'ইনি ইন্দ্র দেওলুর পুরোহিত। বলছেন—স্বস্তি স্বস্তি, স্বস্তি জয়ন্ত যোড় হাতে তাঁকে নমস্কার জানালো।

পুরোহিত গিয়ে মন্দির-দ্বার খুললেন। জয়ন্ত স্পষ্ট দেখতে পেলো পাথরের তৈরী ইন্দ্র মূর্ত্তিটিকে, ছাই রং-এর প্রস্তর-মুর্ত্তি। মাথায় মুকুট, সর্ব্বাঙ্গে নানা আভরণ।

কি একটা মন্ত্রোচারণ করে পুরোহিত যেই মাথা ঠেকালেন ইন্দ্র মূর্ত্তির চরণতলে, জয়ন্ত দেখলো, সেই বিশাল চত্বরের বিপুল জনতাও প্রায় একই সঙ্গে মাটিতে তাদের মাথা নত করলো। জয়ন্তও তাড়াতাড়ি নত মস্তকে প্রণাম জানালো ইন্দ্রদেবকে।

গান্দারির বাড়ীতে সমস্ত দিন ধরে চলল শত শত পুরুষ-নারী বালক-বালিকার আসা যাওয়া। রাত্রিজাগরণে ক্লান্ত জয়ন্ত ঘুমোতে পারলো মাত্র ঘন্টাখানেক। প্রায় বেগুনের আকারের এক ধরণের লঙ্কা দিয়ে তরকারি রেঁধে খাওয়ালেন গান্দারির মা। ঝাল নেই একটুও অথচ ভারী সুস্বাদু সেই তরকারী। টাটকা আঙ্গুরের রস, ভেড়ার দুধের ছানা, আর কদবেলের চাটনী।

এদেশের মেয়েরা বড় নৃত্যগীত প্রিয়। সন্ধ্যা হতে না হতে রোজ নানা বয়সের মেয়েরা আসবে ইন্দ্র দেওলুর চত্বরে। শুরু করবে নাচ আর গান। একটানা তিন-চার

ঘণ্টা নেচে তারা যখন থামবে, তখনই মন্দিরে দামামা বেজে উঠবে। পুরোহিত আরম্ভ করবেন দেবার্চ্চনা। অর্চ্চনা শেষে প্রতি শনিবার হবে ভেড়া বলি। জয়ন্তের বারবার মনে হচ্ছিল—সে যেন ভারতেরই কোনো পার্ব্বত্য তীর্থে এসে প্রত্যক্ষ করছে ভক্তি-আপ্লুত জনমণ্ডলীর পুজো আর আরতি।

রাত্রিতে মা যখন তাঁর ঘরে চলে গেলেন শুতে, গান্দারি এসে বসলো জয়ন্তের অদূরে। বলল, 'এদেশের অরত-উপত্যকার নাম নিশ্চয় শোনোনি! সাত হাজার তিন শো ফুট দীর্ঘ এই উপত্যকা। উচ্চলিক ইয়ালিক গিরি পথের দৃশ্য দেখলে চোখ ফেরাতে পারবে না। কিন্তু সেসব আবার যখন আসবে দেখাবো। কাল তোমাকে নিয়ে যাবো কুন্দ পর্বতের শিখরে। সেখানে ছোট্ট, কিন্তু ভারী সুন্দর একটা হ্রদ আছে। ঐ হ্রদের তীরে একটা মস্ত পাথরের নৌকোর ভগ্নাবশেষ দেখতে পাবে। এখানকার সবাই বলে—ওটা নাকি সেই নোয়ার নৌকো। এখন প্রস্তরীভূত হয়ে পড়ে আছে। আর ঐ কুন্দ পর্ব্বতের ঠিক নীচেই যে উপত্যকা, সেখানে তোমাকে দেখাবো নোয়ার পিতা লামেকের সমাধি স্তম্ভ।' অবাক হল জয়ন্ত। নোয়ার নৌকো—এখানাকার এক হ্রদের তীরে? নোয়ার বাবার স্মৃতি-স্তম্ভ এখানেই?

'বেশিক্ষণ তোমায় জ্বালাতন করবো না বাঙ্গালীবাবু, কাল ভোরে উঠেই তো আবার দৌড়তে হবে তোমাকে কুন্দ পর্ব্বতের দিকে! এখন তোমার বিশ্রামের দরকার। তবু, প্রাচীন গান্ধারের রেষ্ট হাউসে সেদিন রাতে যে প্রশ্নটি তোমার কাছে করেছিলাম তার জবাবটা তোমার মুখ থেকে আজ শুনবার জন্যে ছুটে এলাম এখন।'

'কোন প্রশ্ন?' জয়ন্ত জিজ্ঞেস করলো।

'সেই যে জিজ্ঞেসা করেছিলাম তোমাকে—আমায় সারা জীবন শাড়ী-সিঁদুর আর শাঁখা পরার অধিকার তুমি দিতে পারো না, বাঙ্গালীবাবু? আজ তুমি তো জানতে পেরেছ—আমার ধর্ম-সংস্কৃতি আর তোমার ধর্ম-সস্কৃতি মুলতঃ একই?'

'সে অধিকার দিতে পারবেন কেবল তিনিই যিনি তোমায় পত্নীত্বে বরণ করবেন। আমার সে অধিকার কোথায়?' জয়ন্ত জবাব দিল।

'আমি যদি স্বেচ্ছায় সে-অধিকার তুলে দিই তোমার হাতে? রহিম দিল চাচার কাছে শুনেছি—তুমি আজও জীবন-সঙ্গিনী বেছে নাও নি। তবে?'

হাসলো জয়ন্ত। বলল, 'তোমার মা রাজী হবেন কেন? তোমার দেশের সব পুরুষই যেমন স্বাস্থ্যবান তেমনই রূপবান। তাদের ছেড়ে তোমার মা আমার মত এক কুৎসিত ছেলের হাতে তোমাকে দেবেন কেন?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো—'দেবে, বাঙ্গালীবাবু, নিশ্চয় দেবে। তোমাকে মার খুব ভাল লেগেছে। তুমি ব্রাহ্মণ শুনে মা বললেন—তোমার মুখ চোখ দেখেই মা নাকি তা বুঝতে পেরেছেন। তোমার পড়া-লেখা আর অন্যসব গুণের কথা বললাম, মা হেসে জিজ্ঞেসা করলেন, তোর মতলবখানা কি শুনি ইন্দ্রা? তুই কি বুড়ি মাকে

এখানে ফেলে রেখে চিরদিনের মত হিন্দুস্তানে পাড়ি দিতে চাস ঐ বাবুটার সঙ্গে? আমি বললাম, তোমাকেও নিয়ে যাবো মা, তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। আরও বললাম—জানো মা, কতো রাত স্বপ্নে আমি দেখি, আমি শাঁখা-সিঁদুর শাড়ী পরে, পায়ে আলতা দিয়ে, সমস্ত শরীর সোনার গয়নায় ঢেকে, ফুল-দুর্ব্বা-চন্দন ডালিতে সাজিয়ে—ধীর পায়ে চলেছি কোনো হিন্দুতীর্থের মন্দির প্রাঙ্গণে। সেই যেবার আব্বাজান তাঁর মাড়োয়ারী বন্ধুর সঙ্গে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল, সেবার যেমনটি দেখেছিলাম কালী মন্দিরের সামনে! দলে দলে বিবাহিত মেয়েরা আসছিল টকটকে লাল পাড়ের গরদের শাড়ী পরে, সিঁথিতে সোহাগ সিঁদুর লাগিয়ে! কি সুন্দর যে দেখাচ্ছিল ঐ বউগুলোকে!'

জয়ন্ত স্পষ্ট লক্ষ্য করলো, কথা বলতে বলতে নিজের স্বপ্নে বিভোর হয়ে কেমন যেন অভিভূত হয়ে গেল মেয়েটা। 'তোমার অদ্ভুত স্বপ্নের কথা শুনে তোমার মা নিশ্চয় হাসলেন?'

'একটুও না। মা আমার মাথায়-গালে হাত বুলিয়ে বললেন—তোর স্বপ্ন সত্যি হোক ইন্দ্রা, ইন্দ্রা-দেওলুতে আজ থেকে রোজ আমি এই প্রার্থনাই জানাবো।'

মুখ নীচু করে চুপ চাপ বসে কি যেন ভাবলো গান্দারি কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ চোখ তুলে, একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে, সে দুম করে এক উৎকট প্রশ্ন ফেঁদে বসল—

'আচ্ছা, বাঙ্গালীবাবু তুমি কি মুসলমানদের মত দেনমোহর, বায়েজেন কাবিলনামা, খোৎবা আর মোনাজাত মেনেই বিয়ে করবে? নাকি, ইরাণের সুফি কবি মৌলানা রুমীর লেখা সেই অপূর্ব্ব মন্ত্র উচ্চারণ করে গ্রহণ করবে তোমার পত্নীকে?'

প্রশ্ন শুনে হাসি আসছিল জয়ন্তের। তবু যথাসম্ভব গাম্ভীর্য্য বজায় রেখেই সে জানতে চাইল, 'রুমী আবার মন্ত্র লিখলেন কবে?'

'লিখেছেন গো লিখেছেন। আধুনিক ইরাণের অনেক তরুণ-তরুণীই যে ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করতে বড় ভালবাসে, তুমি জানো না বুঝি?'

'কোন মন্ত্র?'

'মন তু শুদম্ তু মন্ শুদী, মন্ তন্ শুদম্ শুদম্ তুজাঁ শুদী।
তা কসি ন গোয়েদ বাদ্ আজ ঈঁ মন্ দিগবম তু দিগরী।।

এর অর্থ হচ্ছে, আমি তুমি হলাম, তুমি আমি হলে! আমি শরীর, তুমি প্রাণ। এর পরেও কেউ যেন কখনও না বলে—তুমি অন্য, আমি অন্য।' মন্ত্র-উচ্চারণের ভঙ্গীতেই এতক্ষণ চোখের পাতা বন্ধ করে রুমীর রচনা আবৃত্তি করছিল গান্দারি। আবৃত্তি শেষ হওয়ার পরেও বেশ কিছু সময় চোখ না খুলেই বসে রইল সে। তারপর, জয়ন্ত যখন বলল—'মৌলনা রুমীর কথাগুলোর মতই আমাদের বিয়ের মন্ত্রও তো বলছে...' তখনই চোখ খুলে কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে গান্দারি সাগ্রহে প্রশ্ন করলো, 'কি বলছে, বাঙ্গালীবাবু? তোমাদের মন্ত্রটা একবার শোনাও!'

জয়ন্ত শোনালো—

'যদেতৎ হৃদয়ং মম
তদস্তু হৃদয়ং তব।
যদেতৎ হৃদয়ং তব
তদস্তু হৃদয়ং মম।'

উচ্ছ্বসিত উল্লাসে বলে উঠল গান্দারি—'তাই নাকি? তোমাদের বিয়ের মন্ত্রেও ঐ একই রকম আন্তরিকাতার সুর শুনতে পাচ্ছি আমি যে বাঙ্গালীবাবু! আমার হৃদয় তোমায় দিলাম, তোমার হৃদয় আমি নিলাম! কী অপূর্ব, কী আশ্চর্য্য সুন্দর! দেহের সঙ্গে দেহের মিলন নয়, সঙ্গে হৃদয়ে হৃদয়ের সঙ্গম। এই মন্ত্রই আমরা উচ্চারণ করবো আমাদের বিয়ের সময়, কি বলো বাঙ্গালীবাবু?'

মেয়েটা নিজের মনের সিদ্ধান্ত কেমন বিনা দ্বিধায় জয়ন্তের মনের ওপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে! একবারও ভাববার প্রয়োজন বোধ করছে না যে, জয়ন্তের নিজেরও একটা ইচ্ছা অনিচ্ছা থাকতে পারে।

হঠাৎ বোধ হয় মেয়েটার খেয়াল হল, তার উচ্ছ্বাসের প্রত্যুত্তরে এখনও তো উচ্ছ্বাসের কোনো কথা উচ্চারিত হয় নি জয়ন্তের মুখে! এবং বোধ করি সেই কারণেই সন্ধানী দৃষ্টি ফেলল সে এবার জয়ন্তের চোখে। চোখের ভেতর দিয়ে তার প্রার্থিতের মনের খবর যদি পাওয়া যায় কিছু।

কি জবাব দেবে জয়ন্ত এই প্রতিভাময়ী, বিদুষী, 'খরস্রোতা নদীর মত সদা-চঞ্চলা,উদারমনা—ভারতের জন্যে পাগল-হওয়া উদ্ভিন্ন যৌবনা মেয়েটির প্রশ্নের? কোন ভাষায় কেমন করে বোঝাবে সে—ঘর বেঁধে শান্তিতে শান্ত জীবন যাপন করার মত মন নিয়ে যারা এ পৃথিবীতে জন্মায়, জয়ন্ত যে তাদের গোত্রেরই নয়। আশৈশব তার মনের অজস্র প্রশ্ন অজস্র জিজ্ঞাসা তাকে অজস্রবার অজস্রদিকে টেনে নিয়ে গেছে ঘর ছাড়া করে এই দুনিয়ার সমস্ত প্রান্তে। তবু, আজও জানার তৃষ্ণা তার মিটিল কোথায়? সে বাঁধবে নীড়, এই অতুলনীয়া, রুপসী একটি প্রাণবন্ত কন্যার সুখের স্বপ্নকে ভেঙ্গে তচ নচ করে দিতে? যাযাবরের আবার সংসার? 'কই, বাঙ্গালীবাবু, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।' তাগাদা দিল গান্দারি। জয়ন্ত হেসে বলল, তোমার প্রশ্নের জবাব আমি কেমন করে দেবো? তোমার যেমন মা আছেন, আমারও তেমনি একটি মা আছে—না কি? তুমি যেমন তোমার মাকে সব খুলে বলে, তাঁর অনুমতি নিয়েছো, আমাকেও তো তেমনটি নিতে হবে!'

'বেশতো, তোমার মার কাছে আমায় নিয়ে চলো। অনুমতি নেবার ভার আমি নেবো! কি, বাঙ্গালী-বাবু, বলো! নিয়ে যাবে তো তোমার মায়ের কাছে—এখান থেকে ফিরেই!' নিরুপায় জয়ন্ত একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, বলল—'তাতে আমার আপত্তি নেই।'

জয়ন্ত তার জননীকে চেনে ভাল ভাবেই। তিনি যে জয়ন্তের মনের কথা না জেনে নিয়ে গান্দারিকে কোনো কথাই দেবেন না—এ সম্বন্ধে সে নিশ্চিত।

কিন্তু, সে অবাক হয়ে দেখল, তার মুখের ঐ ছোট্ট জবাবটা শুনেই গান্দারির সমস্ত মুখখানি পুলকে ঝলমল করে উঠল। জয়ন্তের দুই হাতের ওপর হাত রেখে, আবেগ আবিষ্ট গলায় বলে উঠল সে, আর আমার কোনও চিন্তা রইল না, বাঙ্গালীবাবু! তোমার মায়ের পায়ের কাছে বসে তাঁকে আমার জীবনের সব ঘটনা খুলে বললে, তিনি কখনোই আমায় ফিরিয়ে দেবেন না, এ বিশ্বাস আমার আছে। চির অবজ্ঞাত কাফিরিস্তানের মেয়ে এই প্রথম হিন্দুস্তানের একটি ছেলের হাতে হাত মিলিয়ে নিখিল বিশ্বকে শোনাবে—ভারতের বিস্মৃত পরিজন এই হতভাগ্য কাফিরিস্তানের মানুষদের শিরা আর ধমনীতে প্রবাহিত রক্তের সত্যিকার ইতিহাস।

কাবুলে ফেরার পর, গান্দারি হয়তো ধনাঢ্য জহুরী মুস্তাক কামালকে সব কথা জানিয়েছিল। সন্ধ্যার পরে, হঠাৎ তিনি স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন জয়ন্তের কাছে।'

'উন্নত নাসিকা, আয়ত দুই চোখ, গৌরাঙ্গ, বিরল কেশ প্রবীন মানুষটি ঢুকলেন খুশি খুশি মুখ নিয়ে। ঢুকেই বললেন, 'তুমি যে গান্দারিকে তোমার মার কাছে নিয়ে যাবে বলে কথা দিয়েছো, এতে আমি ভারী খুশি হয়েছি। আফগানিস্তানের সঙ্গে হিন্দুস্তানের বন্ধুত্ব এতই সাচ্চা, এমনই গভীর যে, প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলে তার নজির দেখানোর কোন প্রয়োজনই আজ আর আছে বলে মনে হয়না। ইণ্ডিয়ায় আমার অনেক আত্মীয় আছেন। অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং ঘনিষ্ঠ হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-পার্শি বন্ধুও কম নেই। গান্দারির জীবন তোমার মত একজন বিদ্বান আর উন্নত মানের যুবকের সঙ্গে যদি বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে আমার চেয়ে খুশি আর বোধ হয় কেউ হবে না। তুমি যেদিন শেক্সপীয়ারের ভাষায় আমার প্রাণের মেয়ে গান্দারির কানে কানে শোনাতে পারবে—

> Doubt that the stars are fire
> Doubt that the sun dath move,
> Doubt truth to be a liar,
> But never doubt I love.

সেদিন আমার গান্দারি মার জীবন-যৌবন সার্থকতায় পূর্ণ হয়ে উঠবে। And this old dog মুস্তাক কামাল দূর থেকে সে-দৃশ্য মনে মনে কল্পনা করে নিয়ে খুশির জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেবে।' বলতে বলতে রত্ন ব্যবসায়ীর স্নেহবিহ্বল দুই নয়নে অশ্রুর সঞ্চার হল যেন, মনে হল। তিনি বললেন আবার, 'লোকে আমায় রত্নের কারবারী বলে জানে। কিন্তু আমি জানি, আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ যে রত্নটি আমি কুড়িয়ে আনতে পেরেছি, তা হচ্ছে ঐ গান্দারি, মুখার্জি সাহাব। সেই রত্নকে আমি তোমার হাতে তুলে দিতে রাজী হয়েছি এক কথায়। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছো, তোমাকে আমি কী চোখে দেখি!'

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে মুস্তাক কামাল জানিয়ে গেলেন, 'তাহলে পরশুর প্লেনেই তোমরা দুজন দিল্লী যাচ্ছো, মনে রেখো। তোমাদের টিকিটের ব্যবস্থা আমি করে ফেলেছি।'

পরদিন বেলা প্রায় দশটায় গান্দারি যখন এলো, জয়ন্ত তখন ডায়েরী লেখায় ব্যস্ত। ছোঁ মেরে ডায়রীটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে, সে বলল—'এখনো চুপচাপ বসে লেখালেখি করতে পারছো? কাল না আমাদের যেতে হবে?' গান্দারির মুখে অদ্ভুৎ কথা শুনে জয়ন্ত না হেসে পারলো না। হাসতে হাসতেই সে বলল—'কাল যাবো বলে, আজ ডায়রী লিখতে পারবো না?'

কেমনভাবে একজায়গায় বসে লিখছ, তাই ভাবছি। আমি তো বসতেই পারছি না কোথাও। কেবলি মনে হচ্ছে—কখন কাল আসবে।' এই বলে, জয়ন্তের ডায়রী আবার জয়ন্তের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে, সে এসে সোজা বসে পড়লো একেবারে জয়ন্তের গা ঘেঁষে। বলল, 'কি বিপদে যে পড়েছি আমি, বাঙ্গালীবাবু, আর তুমি এদিকে বসে নিশ্চিন্ত মনে ডায়রী লিখছ।

'বিপদ আবার কি হল?'

'বিপদ নয়? ভেবেই পাচ্ছি না—প্রথমে তোমার মার সামনে আমার কোন সাজ পরে যাওয়া উচিৎ? সালওয়ার, না শাড়ী।'

'যা খুশি হয়, পরবে।'

'ঐ দ্যাখো, কেমন পাশ কাটাচ্ছে! একটা পরামর্শ তো দেবে?'

'তোমার কোন সাজ পরতে ইচ্ছে হচ্ছে?'

'শাড়ী পরতে। কিন্তু শাড়ি তো আমি ঠিকমত করে পরতে পারি না। তোমার মা যদি হাসেন?'

'না, না, হাসবেন কেন? বরং তোমাকে শিখিয়ে দেবেন তিনি—ভালভাবে শাড়ী পরতে!'

'ঠিক বলছো তো?'

'গেলেই তো বুঝতে পারবে।'

'যাক, বাবা বাঁচলাম। এতক্ষণে শান্তি পেলাম মনে। কাল ভোরে একবার যেতে হবে বাবরের সমাধিতে।'

'কেন? আবার বাবরের সমাধিতে কেন? নালিশ জানাতে?'

'না না। সমস্ত ধর্মকে অমন সমান দৃষ্টিতে যিনি দেখতেন, সেই মহৎ বাদশার আশীর্ব্বাদ নিতে হবে না? একটা শুভ কাজে যাত্রা করছি তো?'

একটু পরে, পুনশ্চ বলল সে—'আমি কিন্তু এর মধ্যে আর আসতে পারবো না, বাঙ্গালীবাবু! তুমি কোন চিন্তা করবে না। আজকের মধ্যে সব জিনিস গুছিয়ে নিতে

হবে তো। কাল ভোরে যেতে হবে বাবর বাদশার কবরে। একেবারে আসবো আব্বাজানের সঙ্গে মটোরে। —তোমাকে তুলে নিয়ে সোজা যাবো এয়ারোড্রমে। এই ঠিক রইল।' বলেই, যেমন তর তর করে এসে ঢুকে ছিল ঘরে, তেমনি, তর তর করেই বেরিয়ে গেল গান্দারি ঘর থেকে।

পুলকের আতিশয্যে—মাটিতে যেন ঠিক মত পা-ই ফেলতে পারছে না সে আর।

ডঃ দোস্ত মুহম্মদের কাছে গান্দারির দিল্লী যাত্রা করছে আগামীকাল শুনে, লায়লার আনন্দ আর ধরে না। এতদিন পরে, তার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ ছাড়া হচ্ছে, এর চেয়ে বড় এবং শুভ সংবাদ তার কাছে আর কি হতে পারে? ঐ মেয়ের সর্ব্বনাশা সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে পড়েই না আমানুল্লা লায়লার সব আন্তরিকতা সব ভালবাসাকে তাচ্ছিল্য করে এসেছে বছরের পর বছর ধরে। এইবার আমানুল্লা তার দিকে নতুন দৃষ্টিতে চাইতে বাধ্য হবে। কারণ, তার মনে হয়, সেদিন সন্ধ্যায় কান্দাহারে মুখার্জি আর গান্দারির কল্পিত প্রেম কাহিনীর মধ্যে গণ্ডা গণ্ডা মিথ্যে কথা ঢুকিয়ে দিয়ে সে বিশ্বাস করাতে পেরেছিল আমানুল্লাকে যে লায়লার মত বিশ্বস্ত এবং অনুরক্ত বান্ধবী আমানুল্লার আর একটিও নেই। আল্লাতালার মেহেরবাণীতে, তার কল্পনাই যখন বাস্তবের রূপ নিতে চলেছে, যখন সত্যি সত্যিই গান্দারি ঐ হিন্দুস্তানী যুবকের কণ্ঠলগ্না হবার দুর্বার আকাঙ্খায় আফগানিস্তান ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেছে, তখন লায়লাকে আর পায় কে? সে-সন্ধ্যায় যা কিছু বলেছিল সে, তা যে কতখানি সত্যি, চোখে আঙুল দিয়ে এক্ষুনি সে দেখিয়ে দেবে গোলাম হায়দরের সম্ভ্রান্ত সুপুরুষ ধনবান ভ্রাতুষ্পুত্র আমানুল্লাকে।

অধীর ব্যস্ততায়, ডঃ মুহম্মদের টেলিফোনের রিসিভারটাই লায়লা তুলে নিল। প্রত্নতাত্ত্বিক তখন প্রবেশ করেছে গোসল খানায় প্রাত্যহিক স্নান সেরে নিতে। কপালগুণে পেয়েও গেল কান্দাহারের আমানুল্লার নম্বর একবার মাত্র চেষ্টা করতেই।

'কে? আমানুল্লা? আমি তোমার লায়লা কথা বলছি।' গদ গদ স্বরে শুরু করলো লায়লা।

'লায়লা? কি খবর? গান্দারি কেমন আছে?'

কী আশ্চর্য্য! এখনও আমানুল্লার প্রথম প্রশ্ন ঐ গান্দারিকেই নিয়ে? মাথার মধ্যে আগুন ধরে গেল যেন লায়লার। ঈর্ষাদগ্ধ কণ্ঠে চিবিয়ে চিবিয়ে জবাব দিল সে।

'কার কথা জিজ্ঞেস করলে? গান্দারির। খুব ভাল আছে, খুব মৌজে আছে। কাল যে ঐ হিন্দুস্তানী ছোকরাটার সঙ্গে রওনা দিচ্ছে সে দিল্লী অভিমুখ।'

'দিল্লী যাচ্ছে? গান্দারি? কার সঙ্গে? ঐ হিন্দুস্তানীর সঙ্গে? এসব কি বলছো তুমি?

'কেন? তোমার সবচেয়ে বিশ্বাসী আর পেয়ারের এই লায়লার কথাও বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার? কালই প্লেনে দিল্লী যাত্রা করছে ওরা দুই প্রেমিকা-প্রেমিকা। সেখানে গিয়ে হবে শাদী। প্লেনের টিকিট কাটা হয়ে গেছে।'

'তুমি ঠাট্টা করছো না তো আমার সঙ্গে? মাত্র এই কয়দিনের মেলামেশায় গান্দারি কি খুঁজে পেলো ঐ most ordinary একটা পরদেশীর মধ্যে যে, একবারে দেশ ছেড়ে চলে যেতেও দ্বিধা করছে না? আমার মন যে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাচ্ছে না এমন অদ্ভুত কাণ্ডকে।'

'বেশ তো, বিশ্বাস কোরো না। কাল স্বয়ং গিয়ে হাজির হয়ো এয়ারড্রামে, না হয়তো—বাবরের সমাধিতে। তাহলে, নিজেই গান্দারিকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারবে অভাগী এই লায়লার কথা সাচ, না ঝুট।'

'বাবরের কবরে যাবে বলছো কেন?'

'শহরের বাইরের ঐ কবরে প্রায়ই তো যায় ঐ ভণ্ড মেয়েটা। ডঃ মুহম্মদ একটু আগে তারিফ করে বলছিলেন—গতকাল নাকি গান্দারি এসে বলে গেছে—একটা শুভ কাজে রওনা হচ্ছে তো! তাই যাওয়ার আগে একবার নাকি যেতেই হবে ওকে যাত্রার দিন ভোরে ঐ মোঘল বাদশার গোরস্তানে।'

'কেন?'

'আশীর্ব্বাদ নিতে। শাদী করতে যাচ্ছে যে।'

'আগামীকাল ভোরে যাবে গান্দারি ঐ সমাধিতে? একাই যাবে, না সঙ্গে মুখার্জিকেও নেবে?' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল আমানুল্লার গলার স্বর।

'সে কথাটাতো ওকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছেন দোস্ত মুহম্মদ সাহেব। তোমার দরকার থাকলে, মুস্তাক কামালের বাড়ীতে ফোন করে জেনে নিতে পারো তুমি। কাল তাহলে, যাচ্ছই তুমি ভোরে গান্দারির রূপের ছটাকে শেষবারের মত একবার চোখ দিয়ে চাখতে?'

'না, না, তেমন কোন ইচ্ছা এখনও নেই।'

'তবে, একলা যাবে, না দুজন যাবে, তার খোঁজ নিচ্ছ যে বড়?'

'ও এমনি।' একবার থামলো আমানুল্লা মুহূর্তের জন্যে। তারপর আবার তার প্রশ্ন ভেসে এলো—তুমি ঠিক জানো, ও ভোরে যাবে কাল বাবরের সমাধিতে?

নিত্যদিনের অভ্যাস অনুযায়ী প্রত্যূষে ঘুম ভাঙ্গতেই সর্ব্বপ্রথম যে কথাটি মনের দরজায় এসে ধাক্কা দিল জয়ন্তের তা হচ্ছে—গান্দারিকে নিয়ে আজই তাকে হাজির করতে হবে জননীর সামনে। এ এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এতবার এত জায়গায় গবেষণার তাগিদে যেতে হয়েছে তাকে, কিন্তু বাড়ী ফিরবার সময় এমন একটা অবিবাহিতা যুবতীকে কাঁধে চাপিয়ে ফিরতে হয় নি তাকে কখনো। কাফিরিস্তানের বর্ণনা শোনার পর, জননী যে গান্দারিকে মমতার দৃষ্টিতেই দেখবেন এবং সস্নেহে বুঝিয়ে গান্দারির জয়ন্তের দিকে ঝুঁকে পড়া-মনকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন, সে বিষয়ে সংশয়ই ছিল না জয়ন্তের। কিন্তু পাড়া-পড়শী, বাড়ীর ঝি-চাকরদের মনের অবস্থাটা যে কি হবে, সেটাতো জানা নেই তার। এমন উৎকট কাণ্ড তো জয়ন্তের চতুর্দ্দশ পুরুষের

কেউ কোনদিন ঘটায় নি এ-বাড়ীতে তার আগে! গেল একা মুসলমানদের দেশ কাবুলে, ফিরলো জোড়ে এক অগ্নিক্ষরা রূপবতীকে বগলদাবা করে। এর চেয়ে বিভ্রান্তিকর ঘটনা আর কি হতে পারে?

তবে, গত রাত্রেই একটা বুদ্ধি মাথায় এসে, তার দুর্ভাবনাটাকে কিছুটা প্রশমিত করতে পেরেছে। জয়ন্তের এক ঘনিষ্ট বন্ধু আছে—অজিত। ছেলেবেলা থেকেই নিজের ভাই-এর মত খেলা-ধুলো, ঝগড়া-মারামারি করে বড় হয়েছে তারা। সেই অজিত তারই মত অনূঢ় রয়েছে এখনো। ব্যায়ামাগারে কুস্তি করে, ডাম্বেল-বারবেল ভেঁজে—ইয়া বুকের ছাতি। পেল্লায় গোঁফ রেখেছে পাঠানদের মত। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। কাবুলীওয়ালাদের মত সিঁথি কাটে মাথার মাঝখান দিয়ে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে চাকরীও করে উঁচু পদে। সে তার মাকে বলে রেখেছে—'মা, বিয়ে যদি দিতে চাও, কাশ্মীরী মেয়েকে বউ করে আনো। নাহলে—ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম করেই কাটিয়ে দেবো বাকী জীবন।' অজিতের মাও অনেককেই অনেকবার বলেছেন, 'দেখে দাও না, বাপু একটা কাশ্মীরী মেয়ে। নইলে ঐ গোঁয়ার গোবিন্দ ছেলেটা যে আমরণ আইবুড়োই থেকে যাবে। আমার একমাত্র ছেলে, বংশ রক্ষা হবে কেমন করে।'

গত রাত্রে, হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল সেই অজিতের মুখ। A port in a cyclonic Storm! অমন সচ্চরিত্র, স্বল্প-ভাষী, উদার-প্রাণ ছেলে খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর আজকের দিনে। অজিতকে যদি জয়ন্ত অনুরোধ করে, তবে সে যে এক কথাতেই রাজি হবে গান্দারির মত এক সুদুর্লভ স্ত্রীরত্নকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে—কোন সন্দেহ নেই তাতে। ফলে, ওরা দুজনেই সুখী হবে জীবনে। গান্দারির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই রকম ফন্দী একটা মনে মনে ফাঁদতে পেরে, ভারী খোশ মেজাজে আছে কাল রাত থেকেই জয়ন্ত।

জিনিসপত্র সামান্যই। গোছ গোছ শেষ করে তবেই ঘুমোতে গিয়েছিল কাল। অধ্যাপক রহিম দিল, ডঃ দোস্ত মুহম্মদ—উভয়ের কাছেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বিদায় নিয়ে আসা হয়ে গেছে গত সন্ধ্যায়। এখন স্নান-খাওয়া সেরে শুধুই অপেক্ষা করা। মুস্তাক কামাল স্বয়ং আসবেন গান্দারিকে সঙ্গে নিয়ে মটোরে। জয়ন্ত আর গান্দারিকে এয়ারোড্রামে পৌঁছে দেবেন স্নেহ প্রবণ ঐ দরাজ -দিল মানুষটি। আজ ভোরে নিশ্চয়ই গান্দারি গিয়েছিল বাবর শাহের কবরে। যাঁর কাছে তাঁরই নামে এতদিন শিকায়েৎ জানাতে গিয়েছে উটের পিঠে চড়ে গান্দারি, আজ তাঁরই সমাধিতে সেই মেয়েই যাচ্ছে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করতে? আশ্চর্য্য!

গান্দারিকে যতই দেখেছে, যতই বিশ্লেষণ করেছে তার চরিত্র, অবাক হয়েছে জয়ন্ত ততই। মেয়েটার হৃদয়ে কারও প্রতি কোন ঘৃণা বিদ্বেষ ক্ষোভ জমে উঠতে কখনও দেখে নি সে। মুসলমান পিতা-মাতা নয় তার, তবু ইসলাম ধর্মের ওপর কি প্রগাঢ় অনুরাগ আর ভক্তি! অধ্যাপক রহিম-দিল-এর মত বিদগ্ধ মানুষও মুগ্ধ হয়ে স্বীকার

করেছেন—কোরাণের জ্ঞান গান্দারির যতটা, তার সিকি ভাগও নাকি তাঁর নেই। পুলিশের হোমরা-চোমরা অফিসার সের আলির অভব্য বচনভঙ্গীতে একবারও ক্ষুব্ধ হতে দেখে নি গান্দারিকে জয়ন্ত। যে মুহূর্তে শুনল, লায়লা ফিরে যাবে একাই কান্দাহারে অপরাহ্নে, সবিস্ময়ে দেখেছিল জয়ন্ত, কত সহজ স্বরে গান্দারি লায়লাকে বলেছিল, 'আমাকে ক্ষমা করো ভাই!' অথচ, নারীর সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য যে রূপ, সে রূপের তুলনাই নেই তার। আফগানিস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীর পরমাদরের পালিতা কন্যা সে। বিদ্যায়, জ্ঞানে সে এক বিরল প্রতিভা। এই সরলপ্রাণা কোমলমনা দেহলাবণ্যে অতুলনীয়া যুবতীই আবার কোমরে সর্বদা লুকিয়ে রাখে মারাত্মক বিষের কৌটো। অন্তরে তার দৃঢ় শপথ—ঐ বিষপান করে মৃত্যু বরণ করবে, তবু তার সতীত্বকে ক্ষুন্ন হতে দেবে না কিছুতেই। আবেগ ভরা কণ্ঠে রেষ্ট হাউসের অর্গলাবদ্ধ ঘরে বসে গান্দারি বলেছিল—'এই বিষ খেয়েই আমি নিজের পবিত্রতাকে রক্ষা করবো। আমারই রক্তের মেয়েরা একদিন শত্রুর হাতে সতীত্ব নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় হাসতে হাসতে জহের ব্রতে মৃত্যু বরণ করেছিল রাজপুতনায়, পড়ো নি সে-কথা ইতিহাসে?

হাত ঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়তেই, আরাম-কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো জয়ন্ত। এগারোটা বেজে গেছে। জামা-প্যান্ট পরে তৈরী হতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগলো না তার। এখন যে কোন মুহূর্তেই মুস্তাক কামাল এসে পড়তে পারেন।

বাইরে গাড়ীর শব্দ শোনা গেল।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিতে দিতে জয়ন্ত উচ্চকণ্ঠেই অভিবাদন জানালো—

'গুড্ মর্ণিং মিঃ কামাল।'

দরজা খুলে দেখলো, গাড়ীটা মুস্তাক কামালের ঠিকই, কিন্তু গাড়ী থেকে যিনি নামছেন, তিনি মুস্তাক কামাল নন, প্রফেসার রহিমদিল। চোখ দুটো লাল, মাথায় পাগড়ী নেই, চুল-দাড়ি অবিন্যস্ত। একি চেহারা হয়েছে অধ্যাপকের মাত্র একদিনেই।

ব্যস্তপদে এগিয়ে এসে কাঁধে হাত রাখলেন তিনি জয়ন্তের। জড়িত কণ্ঠে বললেন—'শিগগিরি চলো মুখার্জি সাহেব, এক মিনিটও দেরী কোরো না।'

'আমি তো তৈরী হয়েই আছি প্রফেসর সাহেব। মালপত্রগুলো আগে গাড়ীতে তুলি তাহলে?

'ও সব এখন থাক। শুধু তুমিই এসো।'

'কোথায়?'

'মুস্তাক কামালের বাড়ী।'

'এয়ারোড্রমে নয়?'

'না।'

'কেন কি হয়েছে?'

'সব প্রশ্নের জবাব অপেক্ষা করছে তোমার জন্য কামাল সাহেবের বাড়ীতে এসো তুমি।'

গাড়ীতে গিয়ে বসতেই ঝড়ের বেগে ছুটে চলল সেটা। কারুর মুখে কোন কথা নেই। ড্রাইভার চোখ মুছছে রুমাল দিয়ে বার বার।

রহিম দিল বসে আছেন চোখ বুঁজে, দুই হাতে নিজের মাথাটিকে চেপে ধরে।

দূর থেকেই লক্ষ্য করলো জয়ন্ত মুস্তাক কামালের বাড়ীর সামনে লোকে লোকরাণ্য। তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশের ভ্যান। গাড়ী থেকে নামতেই, হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন মুস্তাক কামাল। বলেন, এসো আমার সঙ্গে। কথা বলার শক্তি ওঁর আর নেই, তবু এখনও তাকিয়ে আছে দরজার দিকেই।'

'কার কথা বলছেন আপনি? গান্দারি কোথায়?'

'সেই তোমার পথ চেয়ে বেঁচে আছে এখনও। গান্দারি বিষ খেয়েছে'

'বিষ খেয়েছে?' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল জয়ন্ত।

'ইয়েস। ভয়ঙ্কর বিষ। ষ্টম্যাক থেকে বিষ বের করার অনেক চেষ্টা করেছে ডাক্তাররা, কোন ফল হয় নি। Now she is parting with us for ever। চল চল, তার শেষ ইচ্ছাটুকু তোমায় পূর্ণ করতেই হবে, My child। তুমি আরবী খুব ভালই জানো, আমি শুনেছি। এই নাও কোরাণ। ওর শেষ ইচ্ছা ও জানিয়েছে।—তোমাকে ইয়াসিন পাঠ করতে হবে ওর প্রাণ বেরুনোর আগে। আর কবর দেবার মুহূর্তে জানাজাও আবৃত্তি করতে হবে তোমাকেই।'

হঠাৎ মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্য্যালোক যেন স্তিমিত হয়ে এলো জয়ন্তের চোখে, গান্দারি বিদায় নিচ্ছে পৃথিবী থেকে, আর তারই শেষ বাসনা পূর্ণ করার ভার দিয়ে যাচ্ছে সে জয়ন্তেরই ওপরে!

কিন্তু, কেন? কেন বিষ খেলো গান্দারি এমন অকস্মাৎ? কেউ কি তবে অপবিত্র করার চেষ্টা করেছিল তার দেহকে!

দোতলার দক্ষিণ দিকের প্রশস্ত ঘরে, মেহগিনি-পালঙ্কের ওপর রাজেন্দ্রানীর মতই শুয়ে আছে কাফেরিস্তানের সবার প্রিয় ইন্দ্রা, কাবুলের সব বিদগ্ধ জনের পরম স্নেহের পাত্রী গান্দারী; সৈয়দ মজতবা আলী সাহেবের কন্যাসমতুল শবনম—ভোরের শিশির। নিমীলিত তার আকর্ণ বিস্তৃত আঁখি। পালঙ্কের ওধারে চেয়ারে বসে দুইজন মধ্যবয়সী মহিলা। বোধ হয় কামাল সাহেবের সহধর্মিনী ওঁরাই। উভয়েই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন।

জয়ন্ত দেখলো—মৃত্যুপথযাত্রীনীর রূপ-লাবণ্যের কোথাও কোন গ্লানি বা ক্লেশের পদচিহ্ন তখনো পড়ে নি। তেমনি রক্তোজ্জল শ্বেত দেহের ছটা, তেমনি হাসির ছোঁয়া লাগা ওষ্ঠাধর। কেবল, মনে হল, ঠোঁট দুটো একটু কালচে হয়ে উঠছে যেন ক্রমেই।

অর্ধোন্মাদের মত দৃষ্টি। নিয়ে মুস্তাক কামাল একবার তাকালেন ঘরের কোণে বসে থাকা চারজন ডাক্তারের দিকে। ক্ষিপ্রপদে তাঁদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেসা করলেন; আর

একবার পাম্প করে চেষ্টা করবে নাকি ডাক্তার, আমার ঐ ল্যাপিস-লাজুর পেট থেকে বিষটুকু টেনে বের করতে?' 'কোনও ফল হবে না তাতে।' সবচেয়ে বর্ষীয়ান ডাক্তারটি বললেন, 'চারবার চেষ্টা করেছি, ষ্টম্যাকে কিছু নেই। বিষ ছড়িয়ে পড়েছে রক্তে।'

তড়িৎ গতিতে ফিরে এলেন কামাল গান্দারির শয্যার পাশে। তার কানের একেবারে কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে স্নেহার্দ্রস্বরে বললেন—ল্যাপিস লাজুলি, মা আমার, একবার তাকিয়ে দ্যাখো, মাথায় রুমাল বেঁধে, হাঁটু গেড়ে তোমার পাশটিতে বসে, ইয়াসিন পাঠ করে শুনাচ্ছে তোমায় কে?' আশ্চর্য্য! গান্দারি শুনতে পেলো বোধ হয় তার প্রাণের আব্বাজানের কণ্ঠ! সে চোখ মেলে চাইলো একবার জয়ন্তের দিকে। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটোবার চেষ্টা করে, জড়িত-স্বরে বলল—পড়ো তুমি ইয়াসিন, বাঙ্গালীবাবু, আমি এবার চলে যাব ইন্দ্রদেবের কোলে।'

স্থান-কাল-পাত্র-পরিবেশ—সবকিছুর কথা ভুলে গিয়ে চিৎকার করে উঠল জয়ন্ত—'কেন, কেন তুমি বিষ খেলে গান্দারি? কেন এই সর্বনাশ করলে? কোন শয়তান চেষ্টা করেছিল তোমার পবিত্রতা নষ্ট করতে? বল, বলে যাও সেই কথা?'

কেমন একটা ঘোর নেমে আসছে মূমূর্ষর নয়ন-দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে।

তবু, চোখ চেয়েই কথা বলল সে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে—'কারুর ওপর কোনো ক্ষোভ নেই আমার, বাঙ্গালীবাবু। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ইয়াসিন শোনাও।'

কম্পিত হাতে কোরাণ তুলে—পাঠ করতে লাগল জয়ন্ত বাষ্পরুদ্ধ গলায়।

ঠিকই তো! জয়ন্তেরই ভুল হয়েছিল। সমস্ত জীবনে যে মেয়ের হৃদয়ে কখনো কারুর প্রতি বিক্ষোভের মেঘ জমে ওঠে নি, এই পরম পবিত্র বিদায়ের লগ্নে তারই মনে কোথা থেকে কেমন ভাবে আসবে প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসার জ্বালা। বাবর শাহের অসত্য ভাষণকে যে ক্ষমার চোখে দেখেছে, সের আলি জঘন্য আচরনও যার ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হয়নি, লায়লার ঈর্ষাতুর বাক্যবাণের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যে মেয়ে অনায়াসে ক্ষমার হাসি হাসতে পেরেছে, আজ এই হৃদয়হীন দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার মুহূর্তে সেই মেয়ে যে এমন ক্ষমাসুন্দর কথাই কেবল বলে যাবে—এতে আর বিস্ময়ের কি আছে।

ধীরে, অতি ধীরে নিভে গেল কাবুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্নব্যবসায়ীর অনেক পুণ্যের ফলে কুড়িয়ে পাওয়া, তাঁর ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্নটির দ্যুতি।

মুহূর্তের জন্যে একবার হাহাকার করে উঠে, বুক চাপড়াতে চাপড়াতে লুটিয়ে পড়লেন মুস্তাক কামাল গান্দারিরই শয্যায় জ্ঞান হারিয়ে।

বুক ভরা একটা ধু-ধু মরুভূমির শূন্যতা নিয়ে, পরের দিন, নতুন টিকেট কেটে, এয়ারোড্রমে ঢুকতেই, যে যুবকটি সামনে এসে দাঁড়ালো মুখ নীচু করে, তাকে আচমকা দেখে চিনতেই পারে নি জয়ন্ত, এমনই রুক্ষ্ম হয়েছে তার চেহারা। দামী চুস্ত-পায়জামা আর পাঞ্জাবীতে ধুলো-কাদা লেপ্টে আছে। মাথার চুল উস্ক-খুস্ক। পায়ের জড়িদার

নাগরাতেও মাটির প্রলেপ। এই কি সেই ঝকঝকে, ছিমছাম পরিপাটী সজ্জায় সজ্জিত, কান্দাহারের তোপখানা মাঠে প্রথম দেখা—আমানুল্লা খাঁ?

প্লেন ছাড়তে তো এখানো চল্লিশ মিনিট বাকী, মুখার্জি সাহেব! দুই তিনবার গলা খাকারি দিয়ে গলার স্বরকে পরিষ্কার করে নিয়ে গোলাম হায়দারের ভ্রাতুষ্পুত্র বলল, 'আমায় দয়া করে পাঁচ মিনিট সময় দেবে?' নিঃশব্দ পদ চালানে লাউঞ্জে গিয়ে দাঁড়িয়ে, জয়ন্ত জিজ্ঞেস করলো—

'আপনার জামা জুতোর এ অবস্থা কেন?'

'কাল সমস্ত রাত আমি কবরখানায় কাটিয়েছি তো!'

'কবরখানায়? সারা রাত ছিলেন? আত্মীয় স্বজন কারুর মৃত্যু হয়েছে...' জয়ন্তের কথা শেষ হওয়ার আগেই আমানুল্লা বলে উঠল, 'আত্মীয়? হ্যাঁ, আত্মীয় তো নিশ্চয়ই! সে যে আমায় ভাই ডেকেছিল।'

'কে? কার কথা বলছেন?'

'গান্দারি।' এর পরে, ফোঁশ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অনুচ্চ স্বরে বলল সে 'অদ্ভুত আমার এই পোড়া কপালটা! যাকে বোন বলে সম্বোধন করলাম, যার কথা কাজ কিছু আমার ভাল লাগে না, সেই লায়লা আমাকে ভাই বলে ডাকলো না। সে হতে চাইল আমার স্ত্রী। আর, যার রূপে, গানে, কবিতায়, কথায় কাজে বছরের পর বছর মুগ্ধ হয়ে আমি চাইলাম পত্নীরূপে পেতে, সে আমাকে চিরদিন ডাকলো শুধু ভাই বলে।'

বিস্মিত জয়ন্ত আমানুল্লার মুখের দিকে তাকালো এবার ভাল করে। চোখের নীচে কালি জমেছে, কপালে উৎকণ্ঠার রেখা, বসন্তের দাগ ভরা গাল দুটোও যেন কিছুটা তুবড়ে গিয়েছে নিদ্রাহীন রাত্রি জাগরণে। আমানুল্লাও যে গান্দারির অন্যতম পাণি-প্রার্থী, এ কথাটা এই প্রথম জানল জয়ন্ত।

'গান্দারি এমন হঠাৎ চলে গেল। এতে সবার প্রাণেই ভয়ানক আঘাত লেগেছে, ভাই!' সমবেদনার সুরে বলল জয়ন্ত, 'কিন্তু, কেন যে ও বিষ খেলো, কিছুতেই বলতে রাজী হল না। কেবল শুনিয়ে গেল, কারুর ওপর কোনো ক্ষোভই নাকি নেই ওর মনে।'

'বলে গেছে? এইকথা শুনিয়ে গেছে গান্দারি?' উদভ্রান্তের মত প্রশ্ন করলো আমানুল্লা। 'এখন আমার কি হবে, মুখার্জি সাব? আমি যে সব জানি, আমি যে জানি—কেন ঐ বেকসূর পবিত্র মেয়েটা তার কোমর থেকে জহেরের কৌটো বের করে হাসতে হাসতে নিজের জিভের ওপর ঢেলে দিল।'

'সে কি? আপনি জানেন? জানেন—গান্দারির বিষ খাওয়ার কারণ?' জয়ন্তর গলার স্বর উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠল।

'খোদা কসম, মুখার্জি সাব, আমি জানতাম না—অমন এক মারাত্মক জহেরের কৌটো ওর কোমরে গোঁজা থাকতো। ঐ ডাইনী লায়লা আমায় ক্ষেপিয়ে তুলেছিল—

গান্দারির প্রতি আমার অকৃত্রিম মহব্বতের কথা জানতে পেরে। তার ওপর যখন কামাল সাহেব আমাকে বলল—আমি নাকি শ্লীলতা নষ্ট করেছি তার মেয়ের, যখন রেষ্ট হাউসের বন্দ ঘরে একই শয্যায় তোমাকে আর গান্দারিকে নিজের চোখে দেখে এলাম আমি, তখনই জাহান্নস থেকে শয়তান নেমে এসে ভর করে বসল—আমার মগজে। প্রাণে আমার বদলার আগুন জ্বলে উঠল। আমি স্থির করে ফেললাম—ও মেয়ের পবিত্রতার গর্ব্বকে খর্ব্ব করতে না পারলে, ও কোনদিন আমার হবে না। আর, ওর দেহ স্পর্শ না করেও যখন কামাল সাহেব আমার বদনাম দিলেন ওর শ্লীলতা নষ্ট করার, তখন এবার ওর শরীরকে টেনে নেবোই আমি একবার আমার বুকের মধ্যে। ঠিক এই সময়, লায়লার কাছে খবর পেলাম, যেদিন আপনার সঙ্গে গান্দারী দিল্লী যাত্রা করবে, সেদিনই খুব ভোরে, গান্দারি যাবে নাকি বাবর বাদশার সমাধিতে। শহরের বাইরে সমাধি। সমাধির বাগিচার একেবারে শেষে অপেক্ষা করতে লাগলাম ওর ফেরার পথ আগলে। নিশ্চিন্ত মনে সমাধি থেকে ফিরে আসছিল সে—। মরমী কবি হফেজের সেই সুন্দর লাইনগুলি গাচ্ছিল যে সুর করে—

বরসরে তোরবতে মা চুঁ গুজারি হিম্মৎ খাহ
কে জেয়ারৎ গাহে রিন্দায়ে জাহাঁ খাহাদ শোদ।

(এ পৃথিবীতে যারা শাস্ত্র মেনে চলল না, আমার এই সমাধি হবে তাদের তীর্থভূমি। হে পথিক, এ-সমাধির পাশ দিয়ে যখন যাবে, তোমার জন্যে কিছু আশীর্বাদ ভিক্ষা কোরো তুমি)।

কি অপরূপ যে দেখাচ্ছিল গান্দারিকে তখন! সকালের সূর্য্যে তেজ ছিল না একটুও। জনহীন বাগিচার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল প্রভাত-সমীরণ। ওর সুরেলা কণ্ঠের ঐ অপূর্ব্ব গান। সবগুলো মিলে মুহূর্তের জন্যে ভুলিয়ে দিয়েছিল যেন অত ভোরে আমার ওখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যটাকেই।

ঝোঁপের আড়াল থেকে বেরিয়ে সামনে দাঁড়াতেই, হঠাৎ কিছুটা হকচকিয়ে গেল, মনে হল। পরক্ষণেই তার চিরদিনের সেই মিষ্টি হাসিতে মুখ ভরিয়ে সে শুধালো—কি আমানুল্লা ভাই, এত ভোরে এখানে যে? তুমিও বুঝি মাঝে মাঝেই তাহলে আসো এই সমাধিতে। আমি বললাম, না। আমি এসেছি তোমার জন্যে।

বিশ্বাস করুন, ওর মুখের ঐ ভাই উচ্চারণ আমার মাথার ভেতর ওঁৎ পেতে বসে থাকা শয়তানটাকে আবার হিংস্র করে তুলল। আমি শিকারী কুকুরের মত পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম তার দিকে দুই হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে। বলতে লাগলাম, তোমার জহুরী আব্বাজান আমায় বদনাম দিয়েছে—আমি তোমার ইজ্জৎ নষ্ট করেছি বলে। সেই ঝুঠ বদনামকে সত্যে পরিণত করতে এসেছি আজ। এত ভোরে কেউ কোথাও নেই। নির্জন বাগিচায় তোমায় যখন একা পেয়েছি, এখন আজ তোমায় আর কেউ বাঁচাতে পারবে না।

স্পষ্ট দেখতে পেলাম—ওর মুখের হাসি উধাও হল পলকে। তবু, যথাসম্ভব স্বাভাবিক স্বরেই ও বলল—তাও কি কখনো হয়? ভাই কি কখনও বোনের সম্মান নষ্ট করতে পারে?

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর আক্রোশে গর্জে উঠলাম আমি—আবার ভাই বলে ডাকছো আমাকে? আমি তোমার কত দিনের জানা-চেনা ছেলে, আমায় ভাই বলে ডাকবে, আর ঐ হিন্দুস্তানীর সঙ্গে রেষ্ট হাউসে রাত কাটাবে এক বিছানায়?

শুনে, সে দুই কান ঢেকে বলে উঠল, ছি ছি, এসব কি নোংরা কথা বলছো তুমি আমানুল্লা ভাই? বাঙ্গালীবাবু আমার মাথার চুলটুকুও ছোঁয়নি আজও! তার সম্বন্ধে এমন কথা শোনাও আমার পাপ।

পাপ? তার সম্বন্ধে নোংরা কথা বলছি বলে কান ঢাকছো, আর নোংরা কাজ যখন তুমি করলে সে-রাতে তার সঙ্গে—। এই পর্যন্ত বলে, রাগে আক্রোশে ভালমন্দ বিচারের শক্তি হারিয়ে ফেলে আমি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার ফুলের মতন নরম শরীরটার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে কৌটো বের করে ঢেলে দিল বিষ নিজরে মুখে।

প্রথমে ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি, মুখার্জি সাব। ওটা যে কত মারাত্মক জহের, আমি তখনই বুঝতে পারলাম, যখন গান্দারির সমস্ত দেহ অবশের মত হয়ে নেতিয়ে পড়লো একধারে।'

জয়ন্ত রুদ্ধশ্বাসে শুধালো—'তারপর? তারপর কি হল?

'তারপর, তারপর ওকি বলল জানেন? বলল, আমানুল্লা ভাই, শিগগির পালিয়ে যাও এখান থেকে, আমি জাহের খেয়েছি, আমি আর বাঁচাবো না। তোমাকে এখানে কেউ দেখতে পেলে, তোমাকে ধরিয়ে দেবে পুলিশের হাতে।'

'আর আপনি অমনি পালিয়ে এলেন?'

'হ্যাঁ। ঠিক বলেছেন। আমি ধূর্ত শেয়ালের মত, নিঃশব্দে পালিয়ে এসেছিলাম সেখান থেকে। তারপর অনেকক্ষণ ওর দেহ নাকি পড়েছিল ঐ বাগিচায়। বেলা বাড়ার পরে, লোকের দৃষ্টিতে যখন পড়লো—কোন এক বেহেস্তের হুরী শুয়ে আছে বাগিচার মাটিতে—তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ডাক্তারেরা সবাই বলেছেন শুনেছি—যদি দু ঘন্টা আগেও তারা রোগীকে পেতেন, তাহলে হয় তো বাঁচাতে পারতেন।'

চিৎকার করে উঠল জয়ন্ত, 'কাওয়ার্ড, স্কাউণ্ড্রেল তখনই গান্দারির শরীরটা তুলে আনো নি কেন কাঁধে করে?'

'মনে হয়েছিল একবার, বিশ্বাস করুন। কিন্তু পারলাম না ওর দেহ ছোঁবার মত সাহসটুকু জুগিয়ে উঠতে। আমি ছুঁলে ওর পবিত্রতা যদি নষ্ট হয়!'

হাত ঘড়ির ওপর দিয়ে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল জয়ন্ত।

আমানুল্লা কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল—মরবার সময় পর্যন্ত ও আমাকে বাঁচিয়ে গেল মুখার্জি সাব। বিষ খাওয়ার পরেই আমাকে পালিয়ে যেতে বলল। আবার আপনি

বলছেন, মরবার আগেও বলে গিয়েছে, কারুর ওপর কোন ক্ষোভই নাকি নেই ওর। সবার প্রীতি, ভালবাসা, শ্রদ্ধার দরিয়ায় ভাসতে ভাসতে চলে গেল গান্দারি হাসতে হাসতে। এখন আমার কি হবে মুখার্জি সাব? যাবার আগে বলে যান, আমার কি হবে? আমাকে সে যে ভাই ডেকেছিল?'

বিমান পোত যখন সশব্দে ডানা বিস্তার করে কাবুলের ওপর দিয়ে চক্রাকারে ঘুরে, তার গন্তব্যের দিকে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে, নীচের দিকে তাকালো একবার জয়ন্ত। অশ্রুতে ভেজা ঝাপসা দুই চোখে কিছুই দেখতে পেলো না। কোথায় কাবুলের মাটির নীচে কোনখানটায় শুইয়ে রেখে গেল সে গান্দারিকে—চোখের জলের বাধা পেরিয়ে, তা আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব হল না।

।। চতুর্থ অধ্যায় ।।

নয়ন পথগামী ভব তু মে

পুরীর সাগর তীরে
ক্ষ্যাপা খুঁজে ঘুরে ঘুরে

।। এক।।

'স্বর্গদ্বারে বসে এ কী নারকীয় কাণ্ড! একটা বাচ্চা ছেলের কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে, তার ইহকাল পরকাল ঝরঝরে করা হচ্ছে?'

সমুদ্রবেলার নৈশ অন্ধকার ভেদ করে যে যুবকটি আচম্‌কা সমাধি মন্দিরের সান বাঁধানো সিঁড়িটার ওপর এসে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে উপরিউক্ত কথাগুলি বলল, তার দিকে চোখ তুলে অবাক না হয়ে পারলো না ত্রয়োদশবর্ষীয় জয়ন্ত। পুরুষ মানুষের দেহে এত রূপ থাকে? সরু কোমর, বিরাট চওড়া বক্ষস্থলের পরতে পরতে সুদৃঢ় মাংসপেশীর সজ্জিত বিন্যাস। স্কন্ধদেশ, দুই বাহু, উরু ও পদযুগল-সর্ব্ব ত্রই যুবকের অসাধারণ ব্যায়াম নিষ্ঠার বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। অথচ এমন শক্ত ও কঠিন যার শরীর, তার মুখখানি কিন্তু অবিশ্বাস্য রকমের কোমল। যেন কোন তরুণীর মুখ। পদ্মপলাশলোচন বুঝি এমন চোখকেই বলে। টিয়া নাকের নীচে এবং ছোট্ট রক্তিম ঠোঁটজোড়ার ঠিক ওপরে ঐ হাল্কা গুম্ফরেখাটুকু না থাকলে এ মুখকে কেউ পুরুষের মুখ বলে ভাবতে পারতো না কিছুতেই। কোথাও কোন গাম্ভীর্য নেই। গজদন্তের মত শুভ্র শরীরটা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সর্ব্বদাই যেন এক আনন্দের ছটা। অধরে নধর হাসি অনড়। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আর পরণে কোমর থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক ফালি হলদে কাপড় ছাড়া সর্ব্বাঙ্গ নগ্ন। কিন্তু তবু, ঐ রূপের দিক থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে যেতে চায় না যেন আর। ছি, ছি রায় মা—এমনি করে তুমি একলা পেয়ে ছেলেটার মাথা খাচ্ছ?' পুনরুক্তি করলো যুবক। সাড়ে চার হাত উঁচু সমাধি মন্দিরের মধ্যে বসে ধূপ জ্বালতে-জ্বলতে বৃদ্ধা বললেন—'আমি কি ছেলেট কে ডেকে এনেছি? ও নিজেই যে আসছে রোজ সন্ধ্যার পরে—এই ক'দিন হল।'

'তাই বলে ওর কানে ফিস্ ফিস্ করে মন্ত্র পড়বে? ওর বারোটা বাজাবে? স্বর্গদ্বারে বসে এমন নারকীয় কাজ করা কিন্তু তোমার একেবারেই উচিৎ নয়।'

একগাল হেসে বৃদ্ধা শুধালেন—'নারকীয় কাজ আবার কোনটা?

'এই ঘর সংসার ছাড়াবার মৎলবে ফোঁস্‌লানো।'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি যুবকের ভুল ভাঙ্গতে সচেষ্ট হ'ল—'না না উনিতো আমাকে ঘর সংসার ছাড়ার কথা কিছু বলেন নি!'

'বলে নি?'

'না তো!'

'তবে আরও মারাত্মক কথা কিছু বলছিল বুঝি?'

বৃদ্ধা বললেন—'তুই নিজে একটা মারাত্মক লোক তো তাই সব সময়ে ভাবিস্ অন্যরাও বুঝি তোর মতই মারাত্মক কথা বলছে চুপি চুপি।' ওষ্ঠ কোণে স্নেহের প্রলেপ সুস্পষ্ট বৃদ্ধার।

'কী বললে? আমি মারাত্মক লোক? একটানা ছয় মাস তোমার সঙ্গ করার পরে এই পুরস্কার? 'নিশ্চয়ই তো তুই মারাত্মক লোক। যুগ যুগ ধরে কোটী কোটী লোক যে জগন্নাথদেবের চরণ পদ্মে লুটোপুটি খাচ্ছে ভক্তির আবেগে, তুই চাচ্ছিস সেই জগন্নাথের রূপ রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে?'

এই সময় জয়ন্ত হঠাৎ প্রশ্ন জুড়ে দিল 'রূপ রহস্য মানে কি সাধু মা?' জবাব দিল সাধু মা'র বদলে কিন্তু অনজ-মূর্তি যুবক—'এই যে জগন্নাথদেবের হাত নেই, পা নেই-এই অদ্ভুৎ রূপটার পেছনে নিশ্চয়ই একটা রহস্য আছে আমার মনে হয়।'

'রহস্য আবার কি ?' বৃদ্ধা বাধা দিলেন, 'ঐ রূপেই তো হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের প্রাণের জগবন্ধু পূজো পেয়ে আসছেন সকলের। ও রূপের মধ্যে রহস্যের গন্ধ তো তুই ছাড়া পায় নি কেউ আর এর আগে!

'নিশ্চয়ই পয়েছে, তবে আমার মত স্পষ্ট করে কেউ হয়তো প্রশ্নটা তুলে ধরে নি। আচ্ছা, মা, তুমি তো তোমার প্রাণের জগবন্ধুকে কৃষ্ণ বলে জানো। কৃষ্ণ তো পুরুষ ছিলেন। কখনো কি ভেবে দেখেছ জগবন্ধু পুরুষ হয়েও কেন সবসময় মেয়েদের শাড়ী পরেন? কেন মেয়েদের মত তাঁর নাকে নথ? কেন রামনবমী আর কৃষ্ণজন্মাষ্টমীর আগের দিন পুরুষ জগবন্ধুকে সেই জেউড় ভোগ দেওয়া হয়, যে—ভেষজ ঔষধি খেলে নারীর গর্ভ যন্ত্রণা লাঘব হয়?' তেরো বছরের কিশোর জয়ন্ত এবার কিছুটা যেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। সত্যি তো? কেন পুরুষ জগন্নাথের সজ্জা এবং আচরণে এতটা নারীত্বের ছাপ? একটু হেসে, গৈরিক-ধারিণী বৃদ্ধা জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কি হ'ল, বাবা? তোমার চোখ দুটোও দেখছি চক্ চক্ করে উঠল হঠাৎ দেবদাসের কথা শুনে? তোমার মনেও নেশা ধরলো বুঝি ঐ জগন্নাথ রহস্য উদ্‌ঘাটনের?'

যুবক উল্লাসে প্রায় লাফিয়ে উঠল,—'বাস্, তবে তো আর কথা নেই। এত দিনে একটা চেলা পাওয়া গেল। এই; কি নাম রে তোর?"

'জয়ন্ত মু—'

ধমক দিয়ে জয়ন্তকে থামিয়ে যুবক বলল ঐ জয়ন্তই যথেষ্ট, আমার কাছে। ওসব মু-টু-এ আমার শ্রদ্ধাভক্তি নেই, বুঝলি? আমিও আগে আমার নাম বলতাম শ্রীদেবরঞ্জন অগ্রবাল ঐ তোরা যাকে আগরওয়ালা বলিস। এখন শুধুই দেবদাস। কেমন লাগছে নামটা বল্‌তো?'

'ভাল। কিন্তু, দেবরঞ্জন দেবদাস হয় কেমন করে?'

'যেমন করে এখনই তোর জয়ন্ত নাম জয় হয়ে যাবে আমার জিভে, আর , আমি হয়ে যাবো দেবুদা তোর কাছে। যেদিন জগন্নাথদেবের রত্নবেদীতে মাথা ঠেকালাম প্রথম, সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল এক আশ্চর্য্য আনন্দের আবেগে। সেদিন থেকেই আমি জগন্নাথদেবের দাসে পরিণত এখন আমার দেবদাস ছাড়া অন্য কোন পরিচয়

নেই, জানিস?' এই বলে একটু থেমে, সে পুনশ্চ জিজ্ঞেসা করলো তখন তুই তোর নাম বলতে গিয়ে মু মু করছিলি, জাতে বামুন বুঝি?'

জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে জানালো—হ্যাঁ।

'দূর গাধা, ওসব মুখুজ্যে ফুকুজ্যের কোন মূল্য নেই জগবন্ধুর রাজত্বে, তুই বুঝি জানিসনে?'

বিস্মিত কিশোর প্রশ্ন করলো, 'সে কি কথা? বামুন, কায়েত, মুচী, ম্যাথরে তফাৎ নেই?'

'কেমন করে থাকবে? জগন্নাথের নিজেরই কি জাত আছে? হিন্দুরা বলে জগন্নাথ হিন্দুদের দেবতা বলে না, জগন্নাথ বৌদ্ধদের আরাধ্য এমনিভাবে জৈন দাবী করে জগন্নাথ তাদের, দাবী করে শিখরাও। পৃথিবীতে এমন আর একটি দেবতা দেখাতে পারিস—যার এতগুলি ধর্মের অনুসারীরা একই সঙ্গে এমনিভাবে জানায়?

সীমিত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারের মধ্যে অনেক অনুসন্ধান করেও যখন জয়ন্ত সত্যিসত্যিই আর একটি দেব-দেবীর নাম এমন পেলো না যাঁকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ এতগুলি ধর্ম এমনিভাবে তাদের পুজনীয় বলে ঘোষণা করতে গৌরব অনুভব করে তখন, হঠাৎ কেন জানি মনে হল তার—ঠিক এমন করে কেউ তো কখনো জগন্নাথ সম্বন্ধে চিন্তা করায়নি তাকে এর আগে। বড়দাণ্ডের ওপরে বড় দেউল। সেই বড় দেউলের মণিকোঠায় মস্ত বড় রত্নবেদীর ওপর বিরাজ করছেন যে পুরুষোত্তম জগদ্বন্ধু—তাঁকে এতগুলি ধর্মের মানুষ দাবী করছে তাদের নিজেদের উপাস্য বলে, এ কি এক বিস্ময়কর রহস্য! এসব রহস্যেরই জাল ছিন্নভিন্ন করে সত্যকে টেনে বের করে আনতে চায় বুঝি এই আস্কন্ধলম্বিত কেশ পেশীদৃঢ় রুপাবান যুবকটি?'

এই সময় শ্মশানের দিক থেকে বহুকণ্ঠের ধ্বনি উঠল, 'রাম নাম সত্য হ্যায়', 'রাম নাম সত্য হ্যায়'। কাণে এই ধ্বনি পৌছনো মাত্র দুই হাত তুলে প্রণামের ভঙ্গীতে কপালে ঠেকিয়ে বৃদ্ধ বলে উঠলেন 'জয় বাবা জগদ্বন্ধু , জয় বাবা অন্নদাঠাকুর।' বলেই দুই চক্ষু নিমীলিত করে শিরদাঁড়া সোজা করে বসলেন বৃদ্ধা। দেবদাস বলল 'এই শুরু হ'ল।' কি দাদা?'

'মায়ের ধ্যান। যখনই কোন মৃতদেহ নিয়ে কোন দল এসে ঢুকছে শ্মশানে, দেখেছি মায়ের এমনি অবস্থা। পাকা দুই তিন ঘন্টা বসে থাকবে ঠিক অমনভাবে। এ-অবস্থায় একে ফেলে যাই কেমন করে বলতো। গা ভর্তি গয়না।'

'সত্যি দেবুদা, আমিও আজ কয়দিন ধরেই ভাবছি—সাধুমা এত গয়না পরে কেন?'

'মায়ের স্বামীর দেওয়া গয়না তো! তাই ওগুলো সব সময় গায়ে পরে থাকে। সতীলক্ষী মা যে আমাদের।'

'কানে নাকে, গলায়, হাতে—এত সোনা, এতে বিপদও তো হতে পারে!'

তা তো পারেই। কিন্তু মাকে যে অন্নদাঠাকুর স্বয়ং স্বপ্ন দিয়ে এখানে টেনে এনেছেন, তিনিই দেখবেন মাকে।'

'অন্নদাঠাকুর? আদ্যাপীঠের অন্নদাঠাকুর?'

'হ্যাঁরে! এই যে শ্মশানভূমির বালুকাস্তুপের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ছোট্ট সমাধি মন্দিরটা, এটা তো আদ্যামায়ের আদরের দুলাল অন্নদা ঠাকুরেরই দেহভস্মের ওপর তৈরী। মাঝ রাতে একদিন স্বপ্নে আদেশ দিয়েছিলেন সেই অন্নদাঠাকুর—বড় অবহেলায় অযত্নে পড়ে আছে আমার সমাধিক্ষেত্র। তুমি যাও মা। সেখানে গিয়ে নিত্য সকাল-সন্ধ্যায় ধূপ ধুনো জ্বেলে আমার পূজো করো, শান্তি পাবে, সিদ্ধি পাবে জীবনে। তাই রায় মা একদিন স্বামী সন্তান, সংসার সব পেছনে ফেলে রেখে, নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করে সোজা এসে এই সমাধি সেবার দায়িত্ব ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। বিরাট বড়লোকের ঘরের বউ তো গায়ের ভারী ভারী গয়নাগুলো দেখেই তো বোঝা যায় সেটা।'

'কোথায় থাকেন সাধু-মা'র স্বামী?'

'বালেশ্বরে। বালেশ্বরের রায় মহাশয়দের খুব নাম ডাক। সেই পরিবারে এক নামজাদা অ্যাডভোকেটের ঘরণী হয়ে রায় মা একদিন ঢুকেছিলেন মাথায় সোহাগ সিঁদুর দিয়ে, হাতে শাঁখা নোয়া পরে। আজ দেখছিস, মাথার একটি চুলও আর কালো নেই। অথচ বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে কী খাটনিটাই না খাটছেন সারাদিন। ব্যাটা ভণ্ড তপস্বীকে একদিন পাচ্ছি না সামনাসামনি। পেলে ওর দুই ঠ্যাং ধরে চিরে ফেলতাম একেবারে। মা'র বয়সী এই সম্ভ্রান্ত ঘরের সাধিকাকে দিয়ে ব্যাটা তার এঁটো বাসন মাজায়? পরনের কাপড় ধোয়ায়?'

'সে আবার কে?'

'কে জানে কি নাম তার। তবে জানতে পেরেছি, আদ্যাপীঠ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে ঐ লোকটাকে ওর দুষ্টু বুদ্ধির জন্যে। এখন এখানে এসে তীর্থযাত্রীদের ভড়কি দিয়ে চাঁদা আদায় করছে। বলছে, অন্নদাঠাকুরের সমাধিমন্দির অনেক উঁচু করে তৈরী করা হবে। আর তার পাশে ফুলের বাগান থাকবে। নিত্য ভোগ পূজো হবে। অতএব চাঁদা দাও। আদ্যাপীঠের নামে রসীদও ছাপিয়েছে শুনতে পাচ্ছি।'

'আদ্যাপীঠ লোকটাকে মানা করছে না?'

'যাকে তাড়িয়েই দিয়েছে তাকে মানা করলে সে শুনবে কেন? ব্যাটা চাঁদা তুলছে আর নবাবী করছে।'

'তা সাধুমা ঐরকম একটা খারাপ লোকের বাসন ধোন কেন কাপড় কাচেন কেন?'

'কেন আবার? ভক্তিমতী সরলা মেয়েছেলে পেয়ে ঐ শয়তানটা বুঝিয়েছে যে, কেবল সমাধি দেখাশোনা করলেই হবে না, অন্নদাঠাকুরের আদ্যাপীঠের যে শিষ্য এসেছে অন্নদাঠাকুরের স্মৃতি মন্দিরকে নতুন করে তৈরী করবার ব্রত নিয়ে, তার সেবাও করা চাই। নইলে অন্নদাঠাকুরের দয়া কখনই পাওয়া যাবে না। শিশুর মত মন নিয়ে, চিরদিন দাসদাসীর সেবা নিতে অভ্যস্ত রায়-মা, আজ ঐ ভয়ঙ্কর লোকটার কথাকে বিশ্বাস করে, এই বার্দ্ধক্যে, দাসীবৃত্তি করছেন পরমানন্দে। অন্তরে কোন ক্ষোভ নেই; সংশয় নেই। কিন্তু এই দৃশ্য আর আমি সইতে পারছি না ভাই।' বলতে বলতে দেবদাসের পদ্মপলাশ লোচনের সুকৃষ্ণ নেত্রপল্লব মুহূর্তে সিক্ত হয়ে উঠল উদ্‌গত অশ্রুতে। কিন্তু পরক্ষণেই হাত দিয়ে সে অশ্রু মুছে ফেলে, ফিক্ করে হেসে ফেলল আবার সদানন্দময় দেবদাস। বলল— 'খুব বেশি ভাবপ্রবণ ভাবতে শুরু করেছিস তো আমাকে? আরে দূর দূর রায় মা'র ধারে কাছে আর থাকবো না। যে দিকে দুই চোখ যায় চলে যাবো। দরকার নেই আর জগন্নাথের রূপ রহস্য উদ্‌ঘাটনে। যে আমার কথা শোনে না, তার জন্যে আমি চিন্তা করে মরতে যাবো কেন, তুই বল?'

'তোমার কোন্ কথা শোনেন, সাধু মা?'

'কত বলি মা ঐ আদ্যাপীঠ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া ভণ্ড তপস্বীর নজর কিন্তু তোমার গয়নার দিকে, খুব সাবধান। কখন একা পেয়ে তোমার গলা টিপে শেষ করে ভেগে পড়বে ঐ শেয়ালট। যদি ভাল চাও তো কালই গহনাগুলো বালেশ্বরে গিয়ে স্বামীর কাছে রেখে এসো। তা শুনছে আমার কথা?

'সাধু-মা বালেশ্বরে স্বামীর কাছে যান নাকি?'

'তা যাবে না কেন? তবে খুব কম। স্বামীও তো আসেন ওঁর কাছে, টাকাও পাঠান মাঝে মাঝে। কিন্তু এসবে কিছুই হবে না। অন্নদাঠাকুর স্বপ্নে ডেকে এনেছেন। রায় মা তার চরণ আর ছাড়বেন না, এখানে মরবেন—তাও ভাল। তা মরবে তো মরো না বাবা আমায় মারছো কেন?'

'সেকি? সাধু মা তোমাকে মারছেন?'

'মারছে না? এই যে 'রাম নাম সত্য হ্যায়' শুনে মা চোখ বন্ধ করে বসলো ধ্যানে, উঠবে কখন তার ঠিক আছে? কে ওর গহনা পাহারা দেবে বলতো? সে কর্মটা তো আমাকেই করতে হবে। এখন কত রাত পর্য্যন্ত ঠায় এখানে বসে থাকতে হবে, কে জানে। একে মেরে ফেলা বলবি নাতো বলবি কাকে? উঃ, ঢের হয়েছে, আর নয়। আজ মা চোখ মেললেই, সোজা সেই যে সরে পড়বো, কোনদিন আর এমুখো হচ্ছি নে। এই আমার সিধা সাফ কথা, বুঝলি?'

'তাহলে সাধু মা'র কি হবে?

'মরবে। সর্ব্বাঙ্গে ঝলমলে সোনা নিয়ে উনি এসেছেন বিদেশ বিভুঁই এর এক

শ্মশানে জনহীন সমাধি মন্দির রক্ষা করতে। গায়ে চড়িয়েছেন গেরুয়া, সারা দিনে এত কম খান যে, একটা পাঁচ বছরের বাচ্চাও অতটুকু খেলে প্রাণে বাঁচতে পারে না। রাতে শোয় স্রেফ মাদুরের ওপর একটা বস্তা বিছিয়ে। অথচ, বালেশ্বরে মার রান্নাঘরে রাঁধুনে বামুন, বাক্সভরা দামী দামী সিল্ক-জর্জেটের শাড়ী, মেহগিনি কাঠের কারুকাজ করা পালঙ্কে গদীর ওপরে নরম বিছানা, বাড়ী, ফ্যান, ফোন। ভেবে দ্যাখ্ একবার। কী বিরাট ত্যাগ আর সেই মা-ই কিনা শুধু একরাশ গয়না গায়ে চাপিয়ে বেঘোরে বদ্‌মাইসদের হাতে প্রাণ দেবেন? এসব কথা ভাবতেও বুকের ভেতরটা কেমন করে বলতো?'

সমাধি মন্দিরের ভেতরটায় কোনমতে একটি মানুষ বসতে পারে, এত নীচু ছাত। সমুদ্রের বদ্‌মেজাজি হাওয়ায় প্রদীপ-মোমবাতি অকেজো হয়ে যায় দেখেই হয়তো বৃদ্ধা সঙ্গে একটি লন্ঠন নিয়ে আসেন রোজ সেই লন্ঠনের আলোতেই ধ্যানমগ্না পলিতকেশা মহিলাটির দিকে একবার পরম শ্রদ্ধা ভরে তাকালো জয়ন্ত। বার্দ্ধক্যেও দেহের বর্ণ অমলিন আজও সিঁথিতে জ্বল জ্বল করছে পতিভাগ্যে ভাগ্যবতীর সিন্দুর স্বাক্ষর। পরম শান্তি আর নিশ্চিন্ততার দীপ্তি ছড়িয়ে আছে সারা মুখে। কিসের শক্তিতে শক্তিমতী হয়ে, নারী হয়েও এমন ভয়লেশহীন হতে পেরেছেন ভদ্রমহিলা? অন্তরের কোন সে ব্যগ্রতা তাঁকে অট্টালিকা, দাস-দাসী, আরাম বিলাস ও স্বামী-সন্তানের আকর্ষণ থেকে এমন অনায়াসে ঠেলে এনে ফেলতে পেরেছে এই ত্যাগের আগুনের ভয়াবহতার মধ্যে? জয়ন্ত—ভাবল।

দেবদাসের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলো, সেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বৃদ্ধারই পানে।

'এই সাধুমাকে ছেড়ে তুমি কাল চলে যাবে, দাদা?'

চকিতে মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল যুবক 'না গিয়ে উপায় নেই। আমি অবাধ্য মার বাধ্য ছেলে হয়ে থাকতে পারবো না!'

'কাল সকালেই যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'আমার সঙ্গে তাহলে তোমার আর দেখা হবে না?'

'কেনরে? ভালবেসে ফেললি নাকি আমাকে? এই গেঁজেল, মাতাল, ভাঙখোর লম্পট বাউণ্ডুলে কে? খুব সাবধান! আমার ধারে কাছে বেশিক্ষণ থাকবি না লোক তোকে ছি ছি করবে। শুনলি না, একটু আগে রায় মা আমায় মারাত্মক লোক বলল।

কিন্তু সেতো বলেছেন—তুমি ঐ জগন্নাথের রহস্য ভেদ করতে চাচ্ছ বলে।' তুই আচ্ছা বোকা তো! তুই একটা নতুন মানুষ এসেছিস, তোর সাম্নে আমায় মারাত্মক লোক বলে ডেকে ফেলেই মা বুঝলো, নতুন লোকের সাম্নে এমনটি বলা ঠিক হয় নি। তাই, তাড়াতাড়ি ঐ জগন্নাথের রহস্যভেদের কথা বলে ঐ মারাত্মক লোকের

মারাত্মকতাটাকে কিছুটা কমিয়ে দিল আর কি বুঝলি?' এই পর্য্যন্ত বলার পর, হঠাৎ ট্যাঁক থেকে দুটো লাড্ডু বের করে, একটি লাড্ডু জয়ন্তের দিকে এগিয়ে ধরে বলল 'এই নে, খা। তুই একটা, আমি একটা।' বলেই নিজের মুখে গোটা একটা লাড্ডু পুরে দিয়ে, ফোলা গালে চিবোতে লাগল কচ্‌মচ্ করে। জয়ন্তকে খেতেই হল লাড্ডু।

দেবদাস পুনশ্চ শুধালো 'কিন্তু আমার সঙ্গে আবার দেখা হোক, এটা তুই চাচ্ছিস্ কেন—তা তো বললি নে।'

'জগন্নাথদেবকে নিয়ে তোমার মনে যা যা প্রশ্ন উঠেছে জগদ্বন্ধুকে ঘিরে যুগ যুগ ধরে যে রহস্যের জাল ছড়িয়ে আছে ঐ বিরাট মন্দির, মণিকোঠা আর রত্নবেদীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে, তাদের সমাধান, তাদের রহস্যভেদ তুমি কেমন করে করো, তা দেখবার জানবার আগ্রহ তুমিই তো প্রথম আমার মধ্যে জাগিয়ে দিলে আজ, দেবুদা। তাই, যতদিন থাকবো এখানে, তোমার সঙ্গ তো ছাড়তে পারবো না কিছুতেই।' 'বলিস কিরে?' হঠাৎ উত্তেজিত—উল্লাস যেন উছলে পড়তে চাইল যুবকের দুই পদ্ম আঁখি থেকে, 'তোর মনেও বিঁধেছে তাহলে হস্তপদহীন অদ্ভুৎ দর্শন অথচ লক্ষকোটী ভক্তের প্রাণের পরমধন ঐ জগন্নাথের রহস্যের কাঁটা? কিন্তু মনে রাখিস্—এ কাঁটা বিষম কাঁটা। মনে বিঁধলে একে ছাড়ানো দায়।' বলে, মুহূর্তের জন্যে কি ভেবে নিয়ে, আবার বলল সে কিছুটা যেন নিম্নস্বরেই, 'কিন্তু আমার মত একটা দুশ্চরিত্র নেশাখোরের সঙ্গে তুই ঘুরবি, সেটা কি ভাল হবে রে? আরও কত দিন থাকবি এখানে?

কুড়ি দিন বাকী আছে ছুটী শেষ হতে।'

'উঠেছিস কোথায়?'

'কাছেই, গৌর বাটসাহিতেই।'

'ঠিক আছে। রায়মার কাছে না আসলেও তোর সঙ্গে কোথাও না কোথাও দেখা হবে নিশ্চয়ই, তুই নিশ্চিন্ত থাক।'

'সাধুমার কাছে এখন তুমি থাকবে বোধহয়!'

'তা তো থাকতে হবেই। উনি না হয় জ্ঞানগম্যি গুলিয়ে ধ্যানে বসেছেন, আমি তো অজ্ঞান হইনি এখনও। গায়ের ঐ সোনাগুলোকে পাহারা দেবে কে? তবে হ্যাঁ, খুব শিক্ষা হয়েছে। কাল থেকে আর রায় মার ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াবো না, দেখিস্।' 'উনি এখন কতক্ষণ এমনি অবস্থায় থাকবেন?'

'কেমন করে বলবো? কখনো দেখেছি এক দু ঘন্টাতে জ্ঞান ফিরেছে কখনো আবার আট দশ ঘন্টার পরেও দেখেছি এমনি অবস্থায় বসে থাকতে। কি কাণ্ড বলতো?'

'তবে আমি এখন যাই দেবুদা! বেশি রাত করলে এখনই আশুদা খুঁজতে বেরুবে।'

'আশুদাটি আবার কে?'

বাসার চাপরাশী ছিল এক কালে। চাকরী ছাড়ার পরেও আমার টানে আমাদের বাড়ীতেই রয়ে গেছে অকৃতদার ঐ মানুষটি। আমার ছেলেবেলা থেকে আমাকে দেখাশোনা করছে তো?'

এবার একটু হেসে বলল দেবদাস এখন তোর তবে কোন বেলারে জয়? বুড়ো বেলা? বয়েস কত হবে? খুব জোর তেরো কি দৌদ্দ?' 'একেবারে ঠিক বলেছ তো দাদা। আমার বয়েস ঠিক তেরোই তো বটে।' হঠাৎ কেমন যেন একটু ভাবান্তর ঘটল এই সময়ে যুবকের। কি যেন ভাবতে লাগল সে আপন মনে।

'কি ভাবছ এত?' কিশোরের প্রশ্ন।

অদ্ভুৎ এক গাঢ় স্বরে এবার কথা কইল দেবদাস—ভাবছি, এতটুকু বয়েস তোর মনেতেও টান্ দিয়েছেন ঐ রহস্যে ঘেরা জগন্নাথ! সারা পৃথিবীর কত তীর্থেই তো ঘুরলাম আমার এই সাতাশ বছরের জীবনে! আমেরিকা, ইউরোপ, আরবদুনিয়া, দক্ষিণপূর্ণ এশিয়া—এসব জায়গায় প্রায় সব তীর্থেই একবার না একবার টুঁ মেরে এসেছি এরই মধ্যে কিন্তু এই সাগর-তীর্থে অবিশ্বাস্য রকমের প্রশ্নবোধক এক মূর্তি ধারণ করে বসে আছেন যে জগন্নাথ, তাঁর মত আকৃষ্ট অন্য কোন তীর্থদেবতাই তো করতে পারেন নি আমাকে এর আগে।'

'তুমি ইউরোপ আমেরিকায় গেছ?' প্রশ্ন করল কিশোর একটু বিস্মিত কণ্ঠেই।

'বাউণ্ডুলেরা অমন ঘুরেই থাকে যত্রতত্র।'

'কেন গিয়েছিলে?'

'পড়বার নাম করে। যদিও বিদ্যার ঘরে অষ্টরম্ভা। তবে, দেখে নিয়েছি খুব। কিন্তু আমার কথা এখন থাক। তোর কথাই এখন ভাবতে দে আমাকে কেমন করে ঐ অদ্ভুৎ রূপী দারুব্রহ্ম তোকেও এতটা আকৃষ্ট করতে পারলো, তাই ভাবছি দ্যাখ-খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে যখন এই ভারতের বুক থেকে তখনকার অধঃপতিত জরাগ্রস্ত বৌদ্ধধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার দুরন্ত সংকল্প বুকে নিয়ে আদি শঙ্করাচার্য্য গৃহত্যাহ করে পথে বেরিয়ে ছিলেন একা, তখন এ দেশে তাঁর বিরোধীপক্ষ এতই প্রবল ছিল যে, রাজা সুধন্বা তাঁকে একা যেতে দেন নি। শঙ্কাচার্য্যের বিপদাশঙ্কা করে রাজা একদল সৈন্য দিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে (উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত হিন্দুসমাজের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৭)। তবু, সেই বিপদসঙ্কুল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতেই শঙ্কর অনুভব করলেন নীলাদ্রি শিখরবাসী এই জগন্নাথদেবের দুর্বার আহ্বান। ছুটে এলেন সর্ব্বাগ্রে এই জগন্নাথতীর্থেই 'জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভব তু মে, ভব তু মে' বলতে বলতে। এসে, প্রতিষ্ঠা করলেন গোবর্ধন মঠ। তাঁর আগে, সেই মহাভারতের যুগেরও কত আগে থেকে—কত যুগন্ধর মহাপুরুষ যে এই দারুব্রহ্মেরই অপ্রতিরোধ্য টানে অরণ্য নদ-পর্ব্বতের বাধা তুচ্ছ করে বার বার এসে উপস্থিত হয়েছেন ঐ বড়

দেউলেরই রত্নবেদীর মূলে—তার কতটুকু হিসাব দিতে পারবে বল আজকের ইতিহাস? দেবতনু বিষ্ণুস্বামী, যমুনাচার্য, রামানুজাচার্য, শ্রীমন্মধ্বাচার্য, শ্রীরামানন্দ, কবীর নানক, চৈতন্য—এঁরা তো সব সেদিনের মানুষ! তবু তা বুঝতে পারছিস্ এই সব মহান আর বিরাট ধর্ম প্রচারকদেরও কেউই রক্ষা পাননি জগবন্ধুর প্রেমের টান থেকে। আজ তোর মতন একটা কচি কিশোরের প্রাণেও এসে লাগলো সেই রশির টানেরই ধাক্কা! আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছিরে। আমার মুখ থেকে সামান্য দুই চারটে কথা মাত্র শুনে তুইও ব্যাকুল হচ্ছিস জগন্নাথের রূপ-সাগরে ডুব দিতে অরূপ রতন পাওয়ার আশায়!'

জয়ন্ত জানালো—'কোনো আশা আমার নেই দেবুদা। কেবলই আগ্রহ।' এতক্ষণ পরে, হঠাৎ ঝপ করে জয়ন্তের পাশে বসে পড়ে প্রায় ফিস ফিস করে বলল যুবক—'আগ্রহ চরিতার্থ করতে গিয়ে যদি কিছু নিগ্রহ ভোগ করতে হয়, রাজী আছিস তাতে?'

'নিগ্রহ?'

হ্যাঁরে! ও নিগ্রহ মানে বুঝি বুঝিছিস নে? তুই তো একটা লুপ্ত অথবা গুপ্ত ইতিহাসের আসল রূপটা, কয়েক হাজার বছর ধরে জমে ওঠা আচার বিচার আর সংস্কারের আকাশছোঁয়া স্তূপের নীচ থেকে টেনে বের করে আনতে চাচ্ছিস সত্য সূর্যের আলোতে। তাতে সংস্কারাচ্ছন্ন আজকের কিছু মানুষ যদি বিদ্বেষে ফেটে পড়ে কোন ক্ষতি করতে উদ্যত হয় তোর, পারবি সেই উদ্যত ফণাকে তাচ্ছিল্য ভরে পাশ কাটিয়ে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে?'

'এগিয়ে যেতে পারবো কিনা জানি না, তবে সেই ফণাকে ভয় পাবো না নিশ্চয়, তোমাকে কথা দিলাম।' প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল জয়ন্ত।

ভীষণ রকম উত্তেজিত দুই হাতে জয়ন্তের দুই কাঁধ চেপে ধরে চিৎকার করে উঠল দেবদাস 'বলিস কিরে? কথা দিলি? তবে তো আর তোকে চেলা না করে উপায় নেই।'

এই সময়ে কোথা থেকে টলতে টলতে এসে হাজির হল এক মাতাল। ডান হাতে একটা সদ্য শূন্য হওয়া বিলিতি মদের বোতল, বাঁ হাতে ধরা কোঁচার খুঁট। উঁচু নীচু বালির ছোট ঢিবিগুলো ডিঙিয়ে একেবারে জয়ন্তের সামনে এসে জড়িত জিহ্বায় শুধালো—'আচ্ছা, স্যার এই শ্মশানের নামটি রাখা হয়েছে স্বর্গদ্বার, তাই তো?'

জয়ন্তের পরিবর্তে উত্তর দিল দেবদাস—'তা তো রাখা হয়েইছে।

'কিন্তু এমন নাম রাখার উদ্দেশ্য?' মাতালের পুনপ্রশ্ন। 'উদ্দেশ্য আর কি হতে পারে? মনে হয়, এখানে যাঁদের দেহ দাহ হবে, তাঁরা সবাই স্বর্গে যাবেন ভেবেই এই শ্মশানের নাম রাখা হয়েছিল স্বর্গদ্বার।'

'বাঃ, বাঃ, চমৎকার! গড় গড় করে বলে গেলেন তো মশাই। তো মশাই স্বর্গদ্বারের নামের ব্যাখ্যা। এখন আমার কি হবে, তাই বলুন শুনি!'

'কেন, আপনার আবার কি হবে?'

'কি হবে? কী হবে? এর পরেও জিজ্ঞেসা করতে পারছেন আমার কি হবে? এমন লোভনীয় শ্মশান! হু হু করছে সমুদ্রের হাওয়া! থৈ থৈ করছে হলদে বালি! ভেবেছিলাম—এই সুন্দর শ্মশানটাতে আমাকে চান্স নিতে হবে যেমন করেই হোক। কিন্তু ফোক্কা! আপনার ঐ ভয়ঙ্কর স্বার্থপর ব্যাখ্যায় আমার সব চান্স কর্পূর হয়ে উঠে গেল, স্যার।' 'সে কি কথা আপনার চান্স উঠে গেল মানে?'

'তা গেল না? আপনি এখনই ব্যাখ্যা করে বললেন না এ শ্মশানে যাকে দাহ করা হবে, সে নির্ঘাৎ স্বর্গে যাবে? অর্থাৎ কেবল স্বর্গে যাওয়ার মত সুকর্ম করেছে যারা, তাদের দেহেরই অধিকার আছে স্বর্গদ্বারে পুড়ে ছাই হওয়ার। ঠিক তো? এমন কথাই তো বলেছিলেন আপনি?'

'হ্যাঁ, তা তো বলেছিলেন!'

'তবে এ শ্মশানে আমার দেহ দাহ হবার চান্স কি আর রইল? আমি যে পুণ্য কিছু করি নি, স্যার! কেবলি পাপ, শুধু পাপেই ভর্তি হয়েছে আমার পরমায়ুর ঝুলি। তাই, আমার দেহের শেষ আশ্রয়—নরকের দ্বার। স্বর্গদ্বারে I am the most unwanted stranger!' এই বলে, বাঁ হাতে ধরা কোঁচার খুঁটটা দিয়ে বার বার চোখ মুছতে লাগলো মাতালটা। জয়ন্ত এবার লণ্ঠনের আলোতেই ভাল ভাবে লক্ষ্য করে দেখল—সত্যি সত্যিই লোকটার দুই চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। 'আপনি নিজেকে পাপী ভাবছেন কেন? মহাপুরুষরা বলে গেছেন—নিজেকে পাপী ভাবাটাও একটা পাপ।'

'মহাপুরুষদের চরণকমলে শতকোটী প্রণাম। কিন্তু মহাপুরুষরা তো জানেন না কি মারাত্মক পাপ আমি করে চলেছি রোজ! দেবুদাও তো মহাপুরুষ! আমি যে তাকে প্রতারণা করছি। সে আমায় মদ খেতে মানা করেছিল, কিন্তু আমি তাকে লুকিয়ে নিত্য গলায় ঢালছি এই বিষ! এই সাংঘাতিক বিশ্বাসঘাতকতা যদি পাপ না হবে, তো পাপ আর বলবেন কাকে বলুন তো মশাই!'

মাতালটার মুখে দেবুদার নাম শুনেই চমকে একবার তাকিয়েছিল জয়ন্ত দেবদাসের চোখের দিকে। দেবদাস ইশারায় তাকে নীরব থাকতে বলায় সে আরও বেশি বিস্মিত হল। লোকটা কি তবে অন্য কোন দেবুদার কথা বলছে?

দেবদাস বলল, 'বেশ তো, হঠাৎ যদি মদ না ছাড়তে পারেন, আস্তে আস্তে নেশা করাটা কমিয়ে আনতে পারেন তো!'

পারি না। দাদা, পারি না। আমার সীতা যে চিতায় শুয়েছে, আমি সেই চিতায় শুতে চাই তাড়াতাড়ি, পারলে এখনই। কিন্তু উপায় কই? সে ছিল.পূণ্যবতী, তাই স্বর্গদ্বারে শোবার অনুমতী পেয়েছে সে। আর আমি? আমি যে দেবুদার মত দেবতুল্য মানুষকে ঠকিয়ে পাপের গরলে ডুবে যাচ্ছি ক্রমে, স্বর্গদ্বারে আমায় কি শুতে দেবে কোনো

চিত্রগুপ্ত, স্যার? Impossible কারণ তা দিলে, বেচারা চিত্রগুপ্তেরই নোকরী খতম হবে, I am sure । অতএব, ঠিক আছে, now I shall have to take some other decision।' এই পর্য্যন্ত বলার পর হঠাৎ জড়িত কণ্ঠে গান শুরু করলো মাতালটা 'Meum est propositum in taberna mori' (বড় ইচ্ছা যেন মরি কোনো পানশালাতেই আমি। গাইতে গাইতে টলতে টলতে চলে গেল সে অচিরেই শ্মশানের সেই দিকটায়, যেখানে কিছুক্ষণ আগে মৃতদেহ এনে নামিয়ে রেখে, চিতার কাঠ সাজাতে ব্যস্ত মৃতের আত্মীয় পরিজনবর্গ।

মাতাল অদৃশ্য হতেই, জয়ন্ত জিজ্ঞেসা করলো— লোকটা বার বার দেবুদা—দেবুদা বলছিল। এ দেবুদা কে?

এতক্ষণে গভীর সহানুভূতিতে ছল ছল করা দেবদাসের চোখেমুখে আবার হাসির আভাস ফুটে উঠল। সে শুধালো—'তোর কি মনে হয়?'

'প্রথমে তো ভেবেছিলাম তুমিই বুঝি। তারপরে মনে হল, তুমি তো সাম্নেই রেয়েছো তোমার সাম্নে তোমার নাম ও করবে কেন এতবার।' দেবদাস বলল 'ভীষণ নেশা করে প্রায় অজ্ঞান হয়ে আছে তো! তাই, লণ্ঠনের এই কম আলোতে ও চিনতে পারেনি আমাকে। ওর নাম নন্দদুলাল নন্দ। ইংরেজীতে এম এ পাশ করেছিল কলকাতা থেকে। বাড়ীর অবস্থা খুব ভাল। তবু মধ্যপ্রদেশের কোন এক কলেজে লেকচারার হয়ে গিয়েছিল। শ্বশুরবাড়ী সম্বলপুরে। নিজের বাড়ী যাদবপুরের কাছাকাছি কোথায় যেন বলেছিল। বিয়ে হবার দেড় বছর পরে, পুরীতে রথ দেখতে এসে, মাত্র তিন দিনের প্রবল জ্বরে বৌটা মরে গেল। সে আর্জ চার বছর আগেকার কথা। সেই থেকে চাকরী বাকরী ছেড়ে দিয়ে কটকেই থাকে। মাসে পাঁচ ছয়বার আসে এখানে। এই শ্মশানেই ওর স্ত্রী শেষ শয্যা পেতেছিল কি না।'

বলছো, ইংরেজী নিয়ে এম এ পাশ করেছে, আবার নাকি কলেজেও পড়াতো, তবে মদ খায় কেন?'

'ঐখানেই নন্দদুলাল ভুল করে ফেলেছে, তুই ঠিকই ধরেছিস্-রে! মদ খেয়ে কি কারুর স্মৃতি ভোলা যায় কখনো? বরং নেশার ঘোরে সে স্মৃতি আরও জাগিয়েই ওঠে। কিন্তু কি করা যাবে, এক ব্যাটা তান্ত্রিক ওকে মদ ধরিয়েছে, ওর ঘাড় ভেঙ্গে নিজে রোজ মদ খাবার মৎলবে। আসলে এই মানুষটা কিন্তু দারুণ সাচ্চা! কখনো মিথ্যে বলে না, কখনো কোনও মানুষকে ঠকায় না।'

'মিথ্যে বলে না?'

'না।'

'ও তোমাকে যে মহাপুরুষ বলল দেবতুল্য বলল?'

'তাতে কি হয়েছে?'

'কিন্তু, তুমি যে একটু আগে বললে তুমি একটা গেঁজেল, মাতাল, ভাঙখোর, লম্পট, বাউণ্ডুলে?

'ও, এই কথা?' বলে, একটুখানি ভেবে নিয়ে, উত্তর দিল যুবক আবার, বুঝলি নে, ও যে মাতাল! মাতালরা যে ভুল বকে, বুঝি তাও জানিসনে? আরে, আমিই যখন গাঁজা, মদ, ভাঙ, চরস—এই সব খাই, তখন আমিও কি কম ভুল বকি?' 'কিন্তু, কেন খাও?'

'মারাত্মক লোক বলে! শুনলিনে, রায় মা যে একটু আগেই বলল—আমি একজন মারাত্মক লোক! খারাপ সব মেয়েছেলেদের সঙ্গে ঘুরি তো! ওদের সঙ্গ করতে গেলে, নেশা না করলে চলবে কেমন করে?'

'তুমি ভালো হতে পারো না, দেবুদা?'

'ভালো? হাঃ হাঃ হাঃ।' হঠাৎ অট্টহাসির হট্টগোলে কেঁপে উঠল মহাশ্মশানের আকাশ-বাতাস। 'এ জীবনে আর ভালো হওয়ার কোন আশাই নেইরে আমার, জয়!'

রাত প্রায় সাড়ে আটটা। এত বেশি দেরী করে জয়ন্ত কোনদিন ঘরে ফেরে না। শান্ত, সমাহিত সাধুমার উদ্দেশে, শ্রদ্ধাভরে, সান্ বাঁধানো ছোট্ট জায়গাটায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে, জয়ন্ত উঠে দাঁড়ালো এবার।

'আমি তাহলে এখন যাই, দাদা!'

'নিশ্চয় যাবি।'

'জগন্নাথদেবের সম্বন্ধে সব কথা আমাকে তুমি বলবে কিন্তু।'

আগে নিজে জেনে নিই, তারপরে তো তোকে জানাবো!'

'আচ্ছা।'

শ্মশানের পশ্চিম প্রান্তে যেখানে শ্মশানাগত শবানুগামীদের বিশ্রামের জন্য প্রায় দোতলার সমান উঁচু করে নির্মিত হয়েছে বিশ্রামাগার সেখান দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ পেছন থেকে কার যেন ডাক শুনতে পেলো জয়ন্ত—'এই যে হে ছোক্‌রা, কোথায় যাওয়া হয়েছিল?'

পেছনে তাকিয়ে দেখে, পাঞ্জাবী পায়জামা পরিহিত কে যেন একজন হন্‌হন্ করে এগিয়ে আসছে তারই দিকে।

থম্‌কে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত জানতে চাইল—ভদ্রলোক তাকেই ডাকছেন কিনা। লোকটা জয়ন্তের একেবারে কাছে এসে প্রশ্ন করলো—'ওদিকে কোথায় গিয়েছিল?'

'সাধু মার কাছে। কেন?'

'ক'দিন হ'ল এখানে আসা-যাওয়া?'

'তা পাঁচ সাত দিন হবে।'

'গাঁজা ভাঙ কিছু দেয় নাকি খেতে ওখানে? কিসের লোভে যাওয়া হয়?'

'এমনি, সাধুমাকে দেখতে যাই। খুব ভাল মানুষ তো?'

এইবার হঠাৎ কানের পাশে মুখটা নামিয়ে এনে অনুচ্চস্বরে বলে পুনশ্চ শুধালো লোকটা—'অগ্রবাল কিছু করতে বলে নাকি তোমাকে? ওর দৃষ্টি পড়েছে বুড়ীর গা-ভর্তি গয়নার দিকে, সেটা তো খুব ভাল ভাবেই জানি।'

'অগ্রবাল!'

'ঐ যে, ইয়া ভাগ্‌রা যোয়ান মরদটা। মেয়েদের মত সুন্দর মুখখানা কিনা ওর, তাই বুড়ী ভুলে গেছে ওর রায়-মা রায়-মা ডাকে। মরবে একদিন ওরই হাতে ঐ বুড়ী এই আমি বলে দিলাম। একদিন বিষটিষ কিছু খাইয়ে শেষ করে, বুড়ির সব গয়না নিয়ে পালিয়ে যাবে ঐ ফর্সা ফুট্‌ফুটে মেয়েলি মুখো অগ্রবাল।'

ত্রয়োদশ বর্ষীয় জয়ন্তের বিস্ময়ের আর সীমা পরিসীমা রইল না এই সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকটার অদ্ভুৎ কথাবার্তায়। কি যাতা সব বলছে ও দেবুদার সম্পর্কে? ধ্যানমগ্না গৈরিক-ধারিণী বৃদ্ধার বিপদাশঙ্কায় যে মানুষটি অচঞ্চল মনে বসে পাহারা দিচ্ছে ক্ষুদ্র, ভগ্নপ্রায়, হতশ্রী ঐ সমাধি মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে বসে তারই নাকি লুব্ধ দৃষ্টি কেবল বৃদ্ধার ঐ স্বর্ণালংকারেরই ওপর! এও কি সম্ভব?

'আরে তোমার তো এখনও গোঁফই বেরোয়নি মনে হচ্ছে। অগ্রবালের মনের প্যাঁচ তুমি বুঝবে কেমন করে? লোকটা বলেই চলল, 'তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, তাই তোমাকে সাবধান করে দিলাম। কবে দেখবে গয়না গাটি নিয়ে ও কেটে পড়বে, আর পুলিশ এসে হাজতে পূরবে 'তোমাকে।' এই বলেই লোকটা চলে গেল আবার সেদিকেই যেদিক থেকে সে এসেছিল কিছুক্ষণ আগে।

বঙ্গোপসাগরের নৈশ বায়ুও হঠাৎ যেন বড় গরম বলে মনে হল জয়ন্তের কাছে। হঠাৎ যেন মনে হ'ল, শ্মশানভূমি শব্দহীন হয়ে গেছে। অন্ধকার যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছে চারদিকে।

দেবদাস তবে কি সত্যি কথাই বলেছিল নিজের সম্বন্ধে? সত্যিই কি তবে সে মারাত্মক লোক? সে গাঁজাখোর, ভাঙ্‌খোর, মদখোর, লম্পট, পরস্বাপহারী?

।। দুই।।

জয়ন্তের মুখে গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা শুনে আশুদা গর্জে উঠল—'ফের যদি তুমি ঐ বুড়ীর ধারেকাছে গেছ শুনতে পাই, আমি নিশ্চয়ই সব ফাঁস করে দেবো মারাণী আর সাহেবের কাছে। তাঁরা তোমার মা বাপ, তাঁদের সম্মানটি থাকবে কোথায়, যখন তোমার কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ টেনে নিয়ে যাবে হাজতে ঐ বুড়ীর গয়না চুরির দায়ে?'

'আঃ, আস্তে আস্তে কথা বলো আশুদা! মা যে শুনতে পাবে।' অত্যন্ত নীচু স্বরে

মিনতি জানালো জয়ন্ত। কিন্তু মাথা ভর্তি টাক্ আর ধবধবে পাকা গোঁফজোড়া নিয়ে আশু পুনর্বার উচ্চগ্রামেই ঘর্ঘর করলো—'আমি আস্তে কথা বললে, তোমায় সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাবে কে?' এই বলে, কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর সহসা গলার স্বর বেশ কিছুটা নামিয়ে নিয়েই পুনরায় কথা বলল সে, 'নাঃ এসব আমার একেবারেই ভালো ঠেকছে না, দাদাভাই। তোমার যখন চার বছর বয়েস, তখন মারাণী তোমায় আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন—জয়ন্তকে তুমি এত ভালোবাসো আশু, এখন থেকে কেবল তুমিই ওকে বেড়াতে নিয়ে যাবে। তোমার কাছে জয়ন্ত যতক্ষণ থাকে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকি। সেকি আজকের কথা? সাহেব তখন বর্ধমানের হাকিম। প্রায় আট-নয় বছর কেটে গেছে তারপর। কিন্তু আজও মারাণী আমারই ওপর সব ছেড়ে দিয়ে বসে থাকেন তোমার ব্যাপারে। এখন সত্যিই যদি কোন অঘটন ঘটে যায় এখানে, তাহলে তাঁর কাছে আমি মুখ দেখাবো কেমন করে বলো তো? না দাদাভাই, তুমি আমায় কথা দাও, আর তুমি কখনো যাবে না ঐ বুড়ীর আড্ডায়। ঐ পাঞ্জাবী পায়জামা পরা লোকটি মনে হয় সত্যিকারেরই ভদ্রলোক। তাই তোমাকে সাবধান করে দিয়েছেন অমনভাবে! অতএব নিরুপায় জয়ন্তের শ্মশানে যাওয়া বন্ধ হল বেশ কিছুদিনের জন্যে ও এখন এই মহাতীর্থের এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায় আপনমনে প্রত্যহ দুইবেলা। কিন্তু, প্রতিরাত্রেই হঠাৎ মনে পড়ে যায় তার—অলংকার-ভূষিতা, শাঁখা-সিঁদুর সজ্জিতা, গেরুয়া-পরিহিতা বৃদ্ধার আশ্চর্য স্নেহ ঢলোঢল চোখ দুটিকে। কী এক সম্মোহনী শক্তি আছে যেন ঐ চোখে। আর, তারই সঙ্গে কানে ভেসে আসে—সদানন্দময় দৃপ্তদেহী এক যুবকের কণ্ঠস্বর—'বলিস কিরে? তোর মনেও বিঁধেছে তাহলে হস্তপদহীন অদ্ভুৎ দর্শন, অথচ লক্ষ কোটি ভক্তের প্রাণের পর মদন ঐ জগন্নাথের রহস্যের কাঁটা? কিন্তু মনে রাখিস এ কাঁটা বিষম কাঁটা। মনে বিঁধলে একে ছাড়ানো দায়।'

সেদিন সন্ধ্যায় জগন্নাথ রহস্যের প্রশ্ন কাঁটাগুলি তার কিশোর মনে বিঁধিয়েছিল যে, তাকে কোথায় পাবে জয়ন্ত এই এত বড় শহরে? অন্নদাঠাকুরের সমাধিসৌধে আর কি কোনদিন যাওয়া হবে তার? গেলে, আশুদা যে বলে দেবে মাকে সব কথা। বাবা হয়তো তখনই বলবেন—'পুরীতে আর নয়, চলো ফিরে' —তখন? জগন্নাথের পশ্চাৎপটে যে যুগ যুগ সঞ্চিত ইতিহাস আজও নাকি রহস্যাবৃত হয়ে রয়েছে আত্মগোপন করে, তা তো আর জানা হবে না কখনো।

জগন্নাথ মন্দিরের পশ্চিমদিকে অবস্থিত বাসেলিসাহি পল্লীর মধ্যে দিয়ে পথ চলতে চলতে এইসব কথাই ভাবছিল জয়ন্ত। হঠাৎ তার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো একটি কূয়োর ওপরে। সিমেন্ট দিয়ে অনেকখানি বাঁধানো চারদিকে। সেখানে বসে দশ-বারো জন সাধু খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্তন করছেন। এবং তাঁদেরই অদূরে একটি বছর চল্লিশের বিধবা মহিলা বসে নয়ন মুদ্রিতাবস্থায় মালা জপ করছেন নিবিষ্ট চিত্তে। সাধুরা গাইছেন—

জয় জয় গৌর হরি
তৃষিতের তৃষা হরি'
শূন্যে কূপে দিলে ভরি'
নব গঙ্গা নীরে।
পরমানন্দ পুরী কাঁদে
গৌর চরণ বুকে বাঁধে
কহে, একি প্রেমের ফাঁদে
ফেল্‌লে পৃথিবীরে।।

কীর্তনান্তে সাধুর দল, স্থান ত্যাগ করার আগে অনেকগুলি তাম্রকলসী ঐ কূয়োর জলে পরম শ্রদ্ধাভরে পূর্ণ করে নিয়ে গেলেন—জয়ন্ত লক্ষ্য করলো তা। কিন্তু পরক্ষণেই আরও যে একটি ব্যাপার নজরে পড়লো তার, সেটি এই যে, সাধুরা চলে যাওয়ার অনেক পরেও, বিধবা মহিলা কিন্তু হাতে মালা নিয়েই দুই চোখ বুজে, সাধুদের গাওয়া ঐ গানের কলিগুলিই গেয়ে চললেন গানের তালে তালে দুলতে দুলতে। কী অপূর্ব ওঁর কণ্ঠের সুর। আধ-ময়লা থান কাপড় পরনে। গায়ের রং শ্যামলাঙ্গ সর্বাঙ্গে কঠিন বৈধব্য পালনের সুস্পষ্ট ছাপ।

প্রায় চল্লিশ মিনিট এইভাবে গান করার পর, চোখ মেললেন বিধবা। সামনে এক অপরিচিত কিশোরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই বোধহয় তাড়াতাড়ি হাতের মালাখানি কপালে একবার ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কূয়ো দেখতে এসেছো বুঝি বাবা?'

জয়ন্ত পালটা প্রশ্ন করে বসল—'এ কূয়োর জল বুঝি খুব ভাল?'

'খুব ভাল। কত সাধু, বৈষ্ণব, মহান্ত কত সময় ঢোল-বাঁশি বাজিয়ে এসে রূপো আর সোনার কলসে জল ভরে নিয়ে যান এখান থেকে।'

'কেন?' জয়ন্ত আরও জানতে চাইল, 'এ শহরে তো আরও অনেক কূয়োই আছে। তবে, কেন বিশেষ করে এই কূয়োর জল নিতেই এত মানুষ আসে খোল-করতাল, ঢোল-বাঁশি বাজিয়ে?'

'ও মা, এ যে পরমানন্দ পুরী গোস্বামীর কূয়ো গো, তুমি বুঝি তাও জানো না?'

'পরমানন্দ পুরী গোস্বামী আবার কে?'

'মাধবেন্দ্র পুরীর নাম শুনেছ? তাঁর শিষ্য ছিলেন ঈশ্বরপুরী—। পরমানন্দ পুরী ছিলেন সেই ঈশ্বর পুরীরই সতীর্থ। উনি ছিলেন ত্রিহুতের লোক। সন্ন্যাসীদের মধ্যে স্বরূপ দামোদর আর পরমানন্দ পুরীর মত প্রিয়পাত্র নীলাচলে অন্য আর কেউ ছিলেন না আমাদের গৌরসুন্দরের। এই যে দেখছ কূয়োটা, এটা ছিল পরমানন্দ পুরীর মঠের সংলগ্ন একটি কূয়ো। আজ শুধু কূয়োটাই আছে, পুরীগোঁসাই-এর মঠের চিহ্নও কোথাও

নেই।' বলে, একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিধবা মহিলা। তারপর বললেন—'এই কূয়োর জলের মধ্যে যে আমাদের মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের লীলামাহাত্ম্য লুকিয়ে রয়েছে।'

'না। ভুল বললেন দিদি!' এক সুবেশ, সুকেশ, সম্ভ্রান্ত যুবক তার সাইকেলটা সানবাঁধানো চত্বরের প্রান্তবর্তী একটি গাছে হেলান দিয়ে রাখতে রাখতে বলল—'এ কূয়োর জল যাঁর লীলামৃত বুকে নিয়ে আজও তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে, তিনি আপনাদের মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নন, আমাদের মহাপ্রভু জগন্নাথদেব।'

যুবকের দিকে তাকাতেই জয়ন্তের কিন্তু মনে পড়ে গেল—এ সেই শ্মশানে দেখা মাতালটা। কিন্তু মুখখানা একরকম হলেও, এ মানুষ আর সেই মানুষে কতই না পার্থক্য। সেদিন লণ্ঠনের অপ্রতুল আলোকে নেশাবিধ্বস্ত জড়িতকণ্ঠ, টলটলে যে মদ্যপের রূপ ফুটে উঠেছিল জয়ন্তের বিস্মিত সন্ত্রস্ত চোখের সামনে, এ যেন সে নয়, অন্য আর কেউ। আদ্দির পাঞ্জাবীতে সোনার চেন দেওয়া সোনার বোতাম, হাতে সোনার ব্যান্ডে সোনার ঘড়ি। আঙুলে সোনার আংটি চক্‌চক্‌ করছে। ধুতিটা পারর ঢং-এও সুরুচির প্রকাশ। পায়ে পরিচ্ছন্ন পাম সু। জরির ধাক্কা দেওয়া ধুতির সূক্ষ্মতার মধ্যে দিয়ে—অন্তর্বাসটি দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।

খুশির হাসিতে মুখ ভরিয়ে, বিধবা উৎফুল্ল স্বরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন নন্দদুলাল নন্দকে—'আরে এসো এসো দুলালবাবু। দিদিকে দেখলেই বুঝি কেবল ঝগড়া করতে ইচ্ছে হয়?'

'তা হবে না কেন? ঝগড়ার মত কাজ করলে ঝগড়া তো করতেই হবে! যে কূয়োর আজ এত খ্যাতি মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের কৃপালাভের ফলেই, তাকে যদি আপনি প্রচার করতে চান আপনাদের মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের লীলাস্থল বলে, তাহলে তা প্রদিবাদ আমাকে করতেই হবে!'

'তুমি কি তবে জানো না এ কূয়োর ইতিহাস?' মহিলার প্রশ্ন।

'বেশ তো, আপনিই বলুন না, শুনি!'

আগেই তো বলেছি, এটা ছিল পরমানন্দ পুরী গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত মঠের লাগোয়া একটা কূয়ো। এ কূয়োর জল ছিল ভয়ানক রকম কর্দ্দমাক্ত যার জন্যে এ কূয়ো ব্যবহার করতে পারতো না কেউই বলো, আমি ঠিক বলছি কিনা।' 'এখন পর্যন্ত বেঠিক কিছু বলেননি। কিন্তু তারপর?'

'একদিন কথায় কথায় এই কূয়ার কথা উঠতেই, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব জানতে চাইলেন, এ কুয়োর জল কেমন? আক্ষেপ করে উত্তর দিলেন পরমানন্দপুরী—এ কূয়োর জল এতই কর্দমাক্ত যে, এটা প্রায় অব্যবহৃত হয়েই পড়ে আছে দীর্ঘদিন। শুনে, প্রেমময় গৌরাঙ্গসুন্দর উঠে দাঁড়ালেন। আজানুলম্বিত দুই বাহু উর্ধে তুলে ব্যাকুল কণ্ঠে প্রার্থনা জানালেন—হে জগন্নাথ জগবন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে! তোমার ভক্তোত্তম এই

পরমানন্দ গোস্বামীপাদ। তার জলকষ্ট তুমি দূর করে দাও, প্রভু! পূর্ণ করে দাও ঐ কর্দমাক্ত জলাকীর্ণ কূয়োকে গঙ্গাবারির মত পবিত্র সুস্বাদু জলে। এই বলে, শ্রীচৈতন্য প্রত্যাবর্তন করলেন তাঁর নিজের আবাসে সেদিন সন্ধ্যায়। পরদিন প্রভাতে, ভক্তবৃন্ত দলে দলে এসে সেই কূয়োর জল দেখে তো বিস্ময়ে হতবাক। এও কি সম্ভব? কোথায় কূয়োর সেই কাদাঘোলা জল। সমস্ত কূয়ো পূর্ণ হয়ে গেছে সত্যি সত্যিই নির্মল স্বচ্ছ জলে।'

'এখন আপনিই বলুন দিদি লীলামাহাত্ম্যটা এক্ষেত্রে তাহলে কার হল? চৈতন্যের না জগবন্ধুর? চৈতন্য প্রার্থনাই কেবল জানালেন জগবন্ধুর কাছে। কিন্তু ময়লা, নোংরা কূয়োর জলকে পরিষ্কার পানীয় জলে রূপন্তরিত করলেন যিনি, তিনি আমাদের ভক্তবৎসল জগন্নাথ মহাপ্রভু ছাড়া তো আর কেউ নন! তবে?'

'তবে আর কি?' সহাস্য মুখেই বললেন মহিলা, দিদি হেরে গেল ভাই-এর কাছে, হল তো?'

'এত তাড়াতাড়ি হার স্বীকার করে নিলেন? নাঃ, ঝগড়াটা আজ আর জমল না।'

'কিন্তু চৈতন্যঠাকুর প্রার্থনা না করে, অন্য কেউ যদি ঐ প্রার্থনা জানাতো জগন্নাথকে, জগন্নাথ কি তার কথা শুনতেন?' হঠাৎ দুম্ করে শুধিয়ে বসল জয়ন্ত। প্রশ্ন শুনে বিধবা এবং নন্দ দুজনেই বিস্মিত। এই আচমকা প্রশ্নের উত্তরে কি যে বলা উচিত, উভয়ের কেউই যেন ভেবে পেলো না ঠিক সেই মুহূর্তে। জয়ন্ত পুনশ্চ বলল, 'তাই যদি শুনতেন, তাহলে অত বড় সাধু পরমানন্দ পুরীজীর জলকষ্ট তো অনেক আগেই ঘুচে যেত। তিনি এবং তাঁর অনুরক্তরা নিশ্চয় চৈতন্যঠাকুরের আগে এবং অনেকে ঠিক অমনভাবেই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন জগবন্ধুর শ্রীচরণে। কিন্তু, কই, তাঁদের প্রার্থনাতে তো ময়লা-ঘোলা জল স্ফটিকের মত নির্মল, পরিষ্কার হয়ে যায়নি। তাহলে? তাহলে এই অবিশ্বাস্য কূপ-বারি-লীলাতে চৈতন্যঠাকুরের মাহাত্ম্যকেও স্বীকার করে নিতে হবে বৈকি কিছুটা!' কিছুক্ষণ একভাবে জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে থেকে নন্দদুলাল জিজ্ঞাসা করলো—'ছেলেটা কে দিদি?'

বিধবা বললেন, 'আমি তো ওর পরিচয় এখনও জানতে পারিনি, ভাই। কি সুন্দর যুক্তি দেখিয়ে কথা বলতে পারে ছেলেটা! কি গো বাবা, তোমার নাম কি? দুলালদাদার সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করে এই পঙ্কজিনীকে তো জিতিয়ে দিলে। এখন নিজের পরিচয়টুকু না জানালে চলবে কেন?'

'আমার নাম জয়ন্ত। এখানে চেঞ্জে এসেছি বাবা-মা'র সঙ্গে।'

নন্দ বলল, 'ব্যাস্ ঐটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট। তোমার আসল পরিচয় তো পেয়েই গিয়েছি আগে।'

'কোন্ পরিচয়?'

'তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। ভক্তের মাহাত্ম্য যে ভগবানেরও ওপরে, সেইটেই তুমি বুঝিয়ে দিলে কত সহজভাবে। সত্যি তো! যে প্রার্থনা করে, তার ঐশীশক্তি আর চিত্তশুদ্ধতা না থাকলে ঈশ্বর কি শোনেন তাঁর কথা' এই বলে, বিধবা মহিলার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে সে পুনশ্চ কথা কইল হেসে, 'আমাদের সবার প্রিয় এই দিদিটিকে এইরকম দু-চারটে কথা বলে মাঝে মাঝে একটু রাগিয়ে দিই, বুঝলে ভাই। জগন্নাথ আর চৈতন্য এই দুটিকে বুকে আঁকড়ে রেখেই তো বেঁচে আছেন আমাদের এই পঙ্কজিনী দিদি।'

'আরে না, না। ওসব দিদিটিদি আমি কিছুই নই। আমি কেবলই কাঙালিনী, দুখিনী, অভাগিনী, পাগলিনী পঙ্কজিনী, বুঝলে বাবা। আমার এক ছেল, এক মেয়ে। মেয়ের নাম মরণী, আর ছেলেকে ডাকি দাশু বলে। মেয়েটাকে জন্মের পরেই বিয়ে দিয়েছিলাম বাবা ভোলানাথের হাতে। বাবা ভোলানাথকে জানো তো?'

জয়ন্ত বলল—'কে? মহাদেব?'

'হ্যাঁ, তা মহাদেবও বলতে পারো! সাক্ষাৎ দুর্গা যে মা আনন্দময়ী! তাঁর স্বামী তো মহাদেবই।

'কোন্ মা আনন্দময়ী? ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী তলার?'

'নাম শুনেছো তাঁর তুমি?'

'শুধু নাম শুনবো কেন? আমি যে দেখেওছি তাঁকে মা-বাবার সঙ্গে গিয়ে ডেরাডুনে। তখন আমার সাত বছর বয়েস তারপর অবশ্য কলকাতাতেও দেখেছি কয়েকবার।'

এইবার নন্দদুলাল বলল—'বাঃ, তবে তুমি তো খুব ভাগ্যবান, ভাই! এরই মধ্যে কয়েকবার দর্শন পেয়ে গেছ সেই দেবী প্রতিমার—মাত্র একবার যাঁকে কাশীতে দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম আমি! আমাদের এই দিদিটি হচ্ছেন সেই জগদ্ধাত্রী মা আনন্দময়ীর খুব নিকট আত্মীয়া। ইনি থাকেন স্বর্গদ্বার শ্মশানের ঠিক পাশেই একখানি ঘরে—একা। রোজ সকালে এসে বসেন এই পুরী গোস্বামীর কূয়োর ধারে, আর বিকালে যান জগন্নাথের মন্দিরে ষড়ভূজ গৌরাঙ্গের সামনে। গিয়ে হাতে তালি দিয়ে নামকীর্তন করেন আপনমনে, একধারে বসে। এই এঁর জীবন।' সশ্রদ্ধ দৃষ্টি একবার ভাল করে বুলিয়ে নিল জয়ন্ত। এবার আধময়লা মোটা থানকাপড় পরিহিতা কাঙালিনী, দুখিনী, অভাগিনী, পাগলিনী পঙ্কজিনীর আপাদমস্তকে। দোহারা চেহারার বিধবাটির সর্বাঙ্গে নিজের প্রতি অবহেলা আর ঔদাসীন্যের ছাপ সহজেই নজরে পড়ে। সুকঠিন কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্যে দিয়ে বৈধব্য জীবন অতিবাহিত করেও, কেমনভাবে যে এমন হাসিখুশি থাকেন ইনি সর্বদা ভাবতে গেলেও আশ্চর্য লাগে।

'মা আনন্দময়ী আমায় বড় আনন্দে রেখেছেন বাবা এই শ্রীক্ষেত্রে। যেদিকে তাকাও

সব জগবন্ধুময়। এখানে বয়স্করা কাজ করে দিনের শুরুতে জগন্নাথের নাম স্মরণ করে। অল্পবয়সীরা পরীক্ষা পাশের জন্যে প্রার্থনা জানায় জগন্নাথের কাছে। শিশুরা ঘরে ঘরে মেলা থেকে আনা পুতুল জগন্নাথের পূজো করে খেলার ছলে। ছোট ছোট রথ বানিয়ে, সেই পুতুল জগন্নাথকে তাতে বসিয়ে, দড়ি দিয়ে টেনে, রথযাত্রার উৎসব করে। এখানকার ছোট-বড় সর্বশ্রেণীর লোক—অন্নপ্রাশনে, উপনয়নে, বিয়েতে, শ্রাদ্ধে—সবার আগে দাঁড়ায় গিয়ে ঐ বড়দেউলের নাটমন্দিরে জগবন্ধুরই কৃপা ভিক্ষা করতে। এদের আনন্দে জগন্নাথ, দুঃখে জগন্নাথ, শোকে জগন্নাথ। স্নানযাত্রা-রথযাত্রায় যখন জগতের পতি বাইরে আসেন মণিকোঠা থেকে, তখন এখানকার মানুষ তাঁর বুকে নিজের বুক ঠেকিয়ে জড়িয়ে ধরে, প্রেমাবেশে অশ্রু বিসর্জন করে, আনন্দের সাগরে ডুবে যায়। বুঝলে বাবা, সেই জগবন্ধুর পাদপদ্মে নিজেকে আমি সঁপে দিয়েছি শ্রীক্ষেত্রে এসে। যাঁকে প্রথমে একবার মাত্র দেখে, আমাদের নদীয়ার চাঁদও জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন ঐ মন্দিরের পাথরের মেঝেতে, সেই জগন্নাথের মহিমা আর মাহাত্ম্য কি বর্ণনাও করতে পারে কেউ?'

'কিন্তু দিদি! ময়লা কুয়োর জল এক রাত্তিরে পরিস্কার ঝক্‌ঝকে জল হয়ে গেল, এও কি সম্ভব?'

এক মুহূর্তও কোন চিন্তা না করে পঙ্কজিনী সহজ সুরেই উত্তর দিলেন, 'এত বড় একটা পৃথিবীকে মহাশূন্যে যিনি শেকল বা দড়ির বাঁধন ছাড়াই এমন কোটি কোটি বছর একইভাবে ঝুলিয়ে রাখতে পেরেছেন, সেই মহাশক্তির অসাধ্য কি কিছু আছে?'

বেলা বেড়ে যাচ্ছে। সেই কারণেই বোধহয় যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হলেন বিধবা। নন্দ বলল, 'এই কূয়োর মধ্যে পাথরে যা লেখা আছে তার কথা তো কিছু বললেন না দিদি জয়ন্তকে!'

'কি লেখা আছে?' কিশোরের কৌতূহল।

পঙ্কজিনী বললেন—'লেখা আছে, পুরী গোস্বামীর কূপ। বর্ণিত—চৈঃ ৩২, চৈঃ ৪১৮, সংস্কর্ত্রী দাসী মৃণালিনী।'

নন্দ পরিষ্কার করে দিল অর্থটা, 'মানে এই পুরী গোস্বামীর কূয়ো যখন খোঁড়া হয়েছিল, তখন ছিল চৈতন্যাব্দের বত্রিশ বছর। আর, চৈতন্যাব্দের চারশো আঠেরোতে এই কূয়োর সংস্কার করিয়েছিলেন কোনো এক ভক্তিপ্রাণা মহিলা, তাঁর নাম শ্রীমতী মৃণালিনী দাসী। অবশ্য যে কথাটা এখানে লেখা নেই, অথচ, সকলেরই জানা দরকার যে কথাটা, সেটা হচ্ছে এই যে, প্রথম কূপ খনন হওয়ার ৩৮৬ বছর পরে যে অসাধারণ চৈতন্যপ্রেমী এবং কর্মকুশলী মানুষটির সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে এই কূয়োটি আবার সংস্কার করা সম্ভব হয়েছিল তিনি হচ্ছেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা আজও যাঁর

নাম শুনলে ভক্তিভরে মাথা ঠেকায় মাটিতে।' এই পর্যন্ত বলার পরে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে নীরব থেকে পঙ্কজিনীকে উদ্দেশ্য করে পুনর্বার বলল সে—'কাল আমি কিন্তু আসতে পারছি নে, দিদি। আজই ওবেলায় ভুবনেশ্বর যাবো।'

'কেন? ওখানে আবার কি আছে?'

'প্রফেসর বড়ুয়া এসেছেন কলম্বোর এক বৌদ্ধ পণ্ডিতকে সঙ্গে করে। ওদের দুজনার কথাবার্তা শোনবার খুবই ইচ্ছা। ডঃ বড়ুয়া হচ্ছেন পালি ভাষায় বিশেষ পারঙ্গম।' কলম্বো তো সিলোনের রাজধানী? সেখান থেকে এসেছেন বুঝি বৌদ্ধ পণ্ডিত? আমাকে নিয়ে যাবেন সঙ্গে?

'তোমায় যেতে দেবেন তোমার বাবা-মা?'

'আশুদাকে সঙ্গে নিলে ওঁরা আপত্তি করবেন না।'

'আমি কেমন করে জানবো—তুমি অনুমতি পেলে কিনা?'

'এখনই চলুন না আমার সঙ্গে আমাদের বাসায়, আমি মাকে জিজ্ঞাসা করে আপনাকে বলে দেবো?'

'কিন্তু আমার পরিচয় তো তোমার মা জানেন না!'

'আমি তো জানি!'

'জানো? সেকি? আমাকে তুমি জানলে কেমন করে?'

'সেটা আজ বলতে পারবো না, আমায় ক্ষমা করুন। আপনি ইংরেজীতে এম.এ. পাশ করেছেন কলকাতা থেকে। মস্ত বড়লোকের ছেলে আপনি। বাড়ি আপনার যাজপুরের কাছে কোথায় যেন। মধ্যপ্রদেশের কোনো এক কলেজে আপনি লেকচারার ছিলেন। শ্বশুরবাড়ি সম্বলপুরে......'

'কী কাণ্ড! দুলালের সম্বন্ধে এত কথা তো আমিও জানি নে, বাবা! তুমি জানলে কোথা থেকে?' পঙ্কজিনী বিস্ময় প্রকাশ করলেন। কেমন করে বলবে জয়ন্ত সম্ভ্রান্ত, সংস্কৃতিবান, বিদ্বান এই যুবককে সেদিন রাত্রে শ্মশানে কী রূপে দেখেছিল সে!

তাই, সে নীরবে কেবল পদস্পর্শ করে প্রণাম করলো এ যুগের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা মানবপ্রেমী মহাসাধিকা মা আনন্দময়ীর নিকটাত্মীয়া, কঠোর বৈধব্যব্রতী পঙ্কজিনীকে।

।। তিন ।।

'স্বর্ণাদ্রিমহোদয়', 'একাম্রপুরাণ', 'একাম্রচন্দ্রিকা', 'কপিলসংহিতা', 'ব্রহ্মপুরাণ', 'স্কন্ধপুরাণ' প্রভৃতি সংস্কৃত পুরাণগ্রন্থে যে স্থানটির নাম বলা হয়েছে একাম্রক্ষেত্র, 'হেমাচল' বা স্বর্ণাদ্রিক্ষেত্র, তারই সর্বজন পরিচিত নাম ভুবনেশ্বর। সেই ভুবনেশ্বরের বিন্দু সরোবরের পূর্বতটে অবিস্মরণীয় পুরাকীর্তি অনন্তবাসুদেবের যে কারুকার্যমণ্ডিত, নয়ননন্দন মন্দিরটি আছে, তারই অদূরস্থ পাথর বাঁধানোর ঘাটের চত্বরে বসেছিলেন

অধ্যাপক বড়ুয়া এবং সিংহলের সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধপণ্ডিত ডঃ রেবত। উভয়েই বয়সে প্রবীণ। বড়ুয়ার অনেকটা সৌম্য 'শান্তভাব' কিন্তু রেবত সেই অনুপাতে কিছুটা যেন অসহিষ্ণু, অস্থির। ডঃ নাগ কিছুদিন পূর্বে কলকাতা থেকে একটি বিশেষ কাজে এসেছিলেন ভুবনেশ্বরে, তাঁর বন্ধু অধ্যাপক বড়ুয়ার সান্নিধ্য লাভের লোভেই হয়তো তাঁকেও দেখা গেল বৌদ্ধপণ্ডিতের পাশে বসে থাকতে। চত্বরে আরও বেশকিছু বিদগ্ধজন উপবিষ্ট তাদের মধ্যে আমরা যাদের ইতিপূর্বে এই কাহিনীর পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পেয়েছি, তারা হল নন্দদুলাল নন্দ, জয়ন্ত, আর এমন একজন—যাকে দেখে জয়ন্তের কচি মন একইসঙ্গে আনন্দ ও উত্তেজনায় মুহূর্তে চঞ্চল না হয়ে পারেনি। সে কিন্তু জয়ন্তের ঠিক পাশটিতেই এসে বসে, সস্নেহে তার ঘাড়ে হাত রেখে বলল—'আমি আগেই খবর পেয়েছি তুই আজ এখানে আসবি।'

'কেমন করে জানলে?'

'পঙ্কজিনী দিদি বলল। তার মুখে তোর চেহারার বর্ণনা শুনেই ধরে নিয়েছিলাম, এ তুই ছাড়া আর কেউ নয়। কখন এলি?'

'আজই। একটু আগে। নন্দদুলালবাবু তো গতকালই এখানে চলে এসেছেন। আমায় বলে এসেছিলেন বিকেল ৩-টেতে যেন অনন্তবাসুদেবের মন্দিরের কাছে আসি। তাই আশুদার সঙ্গে চলে এলাম।'

'খুব ভাল করেছিস। তা, নন্দকে সেদিন রাত্তিরের কথা কিছু বলিস্‌নি তো?'

'না। কেবল বলে ফেলেছিলাম—আমি ওঁর পরিচয় জানি! উনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন করে জানলে? উত্তরে আমি বলেছিলাম—আমায় ক্ষমা করুন তা বলতে পারবো না।

'বাঃ, তুই তো বেশ বুদ্ধিমান রে!' এই বলে, ঝট করে আর একটা প্রশ্ন করে বসল জয়ন্তকে—'তোর ঘেন্না করলো না একটা মদোমাতালের সঙ্গে মিশতে!'

'কেন ঘেন্না করবে? তুমি যে সেদিন বলেছিলে—ইনি মদ খান কেবল ওঁর স্ত্রীর স্মৃতিকে ভুলে থাকতে! তাছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীতে এম.এ. কলেজে প্রফেসারি করতেন এমন অমায়িক, এত ভদ্র ব্যবহার!' 'নাঃ, তোকে আমার চেলা করতেই হবে দেখছি। এইরকম উদার মনের ছেলে না হলে কি আমার ধারেকাছে টিকতে পারে বেশিক্ষণ?' তা হ্যাঁরে, রায় মা'র কাছে যাসনি যে বড়?'

'তুমি যে বললে সেদিন—আর কখনো যাবে না সাধুমার কাছে।'

'তাতে তোর কি? আমি যদি নাই যাঁই, তারজন্যে তুই যাবি না কেন? জানিস, দুদিন রায় মা তোর কথা জিজ্ঞেস করেছিল?'

'তুমি তাহলে গিয়েছিলে রায়মা'র কাছে আবার?'

'আবার মানে? রোজ একবার মাকে না দেখলে ঘুমোতে পারবো? ফিক্ করে

হেসে ফেলল জয়ন্ত। 'তবে যে বলেছিলে—আর কখনো যাবে না? সাধুমাকে তুমি খুব ভালবাসো, না দেবুদা?'

হঠাৎ গলার স্বরের একটু পরিবর্তন ঘটল দেবদাসের। কিছুটা যেন গম্ভীরভাবেই কথা বলল সে এবার—'আমার জগন্নাথ রহস্যের অনুসন্ধনে—রায়মা-ই যে আমার প্রেরণার উৎস রে। ওঁর আসল নাম কি জানিস তো? শান্তশীলা রায়। আমি বলি তুমি শান্তশীলা নও, মা, তুমি অন্তঃসলিলা। দীর্ঘদিনের সাধনায় পাওয়া বিভূতি তুমি লুকিয়ে রেখেছে তোমার মহাসাগরের মত অতলস্পর্শী হৃদয়ে, অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত। তোমার বিভূতির একটি কণা তুমি আমাকে ভিক্ষা দিও, মা। তাহলেই আমি এ ভবপারাবারে পাড়ি জমাতে পারবো।'

জয়ন্ত ভাবল—তবে ঐ পায়জামা-পাঞ্জাবী পরা লোকটা কেন বলল সেদিন—দেবুদা সাধুমার গয়না চুরি করে নেবার মতলবে সাধুমার কাছে যাতায়াত করে? দেবুদা নিজেও তো নিজেকে মারাত্মক লোকই বলেছে! অথচ নেশার ঘোরে সেই রাত্রেই আবার নন্দদুলালও যে বলেছিল একবার—দেবদাও তো মহাপুরুষ, সেকথাও তো স্পষ্ট মনে আছে আজও জয়ন্তের। তবে? আসলে এই অপরূপ স্বাস্থ্য এবং অনন্য রূপলাবণ্যের অধিকারী, কটীদেশে এক ফালি মাত্র পীতবসনসার যুবকটি তাহলে কি?

এই সময় জয়ন্ত দেখতে পেলো, অনন্তবাসুদেবের মন্দিরের পাশ থেকে একটি বাইশ-তেইশ বছরের যুবতী ধীর পদক্ষেপে চারিধার দেখতে দেখতে এই দিকেই আসছে। কাশ্মীরিদের মত গায়ের রং। পরিধানে টকটকে টাইট ট্রাউজার আর চাপা হাওয়াই শার্ট। কাঁধে ঝোলানো সাইড ব্যাগ আর ক্যামেরা। চোখ ঢাকা রয়েছে কালো চশমায়। বোধহয় পাথর বাঁধানো ঘাটের এই চত্বরটায় এতগুলি মানুষের একত্রে বসা দেখেই কৌতূহল বশে এগিয়ে এলো সে। 'কি আশ্চর্য! রোহিণী না? এখানে এলো কোথা থেকে!' মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করলো আবার দেবদাস।

'উনি কে?' জয়ন্ত শুধালো।

'আমেরিকায় দেখা হয়েছিল। নেপালী মেয়ে। কিন্তু খুব বিদুষী। ওর বাবা কলকাতায় কস্তুরী নাভীর ব্যবসা করতো। টিবি হয়ে মারা গেছে। এদিকে ড. বড়ুয়া তখন ডঃ নাগের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করছেন অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরের ইতিহাস নিয়ে। কে নির্মাণ করেছিল ভারতীয় স্থপতিবিদ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই—মনোহারী মন্দির?

ডঃ নাগের বক্তব্য, ওড়িশার শ্রীপরমানন্দ আচার্য, শ্রীচিন্তামণি আচার্য প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিশ্বাস—অনন্তবাসুদেবের মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন অনঙ্গভীমদেবের কন্যা ও হৈহয় রাজকুমার পরমর্দীর (বা পরমাদির) পত্নী চন্দ্রিকা দেবী বা চন্দ্রাদেবীই। তাঁর শিলালিপি বর্তমান লণ্ডনস্থিত রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ গ্রেটব্রিটেন অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড নামের যে প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্থা সেখানে রক্ষিত আছে (Bhubaneswar

Inscription in the Royal Asiatic Society by Lionel D. Barnett in 'Epigraphia Indica', Vol. XIII, 1915, 16, Pp. 150–55 শ্রীচিন্তামণি আচার্যের 'ভুবনেশ্বর', পরিশিষ্ট, ১৬১ পৃঃ)। অবশ্য শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, এই অনঙ্গভীমদেব হচ্ছেন দ্বিতীয় অনঙ্গভীমদেব বা অনিয়ঙ্ক ভীম যার রাজত্বকাল ছিল ১১৯০ থেকে ১১৯৮ পর্যন্ত History of Orissa, Vol. I, Pp. 225, 267).

সিংহলী পণ্ডিত জানতে চাইলেন, ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসুদেব মন্দিরের শিলালিপি একেবারে লণ্ডনে চলে গেল কেমন করে?

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন মেজর চার্লস স্টুয়ার্ট। প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক হিসাবেও এর খ্যাতি ছিল যথেষ্ট— ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ভুবনেশ্বরের কয়েকটি মন্দিরগাত্রের শিলালিপি খুলে নিয়ে, তার মধ্য থেকে দুইটি ফলক তার এশিয়াটিক সোসাইটিকে দান করেন মেজর স্টুয়ার্ট। এবং বাকিগুলির মধ্য থেকে ঐ চন্দ্রিকাদেবীর শিলালিপিটি যে কোনরকমেই হোক লণ্ডনে গিয়ে আশ্রয়লাভ করে। অন্ততঃ ওড়িশার প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের ধারণা অনেকটা এইরকমই' ডঃ নাগ বললেন। 'তা ঐ শিলালিপিতে এই মন্দির নির্মাণের কোনো তারিখের কি উল্লেখ ছিল না?' ডঃ বড়ুয়া শুধালেন।

ডঃ নাগ উত্তর দিলেন—'চন্দ্রিকাদেবীর শিলালিপিতে 'ব্যোমবিয়ৎ ফণীন্দ্ররসনা চন্দ্র'—এই সময়কাল অঙ্কিত আছে। Dr. Lionel D. Barnett এর অর্থ করে বলেছেন—এ মন্দিরের নির্মাণকাল ছিল ১২০০ শকাব্দ বা ১২৭৮ খৃষ্টাব্দ।'

'আর কি লেখা আছে ঐ শিলালিপিতে আপনার জানা আছে ডঃ নাগ?' রেবতজী প্রশ্ন করলেন।

জয়ন্ত লক্ষ্য করছে, এইসব কথাবার্তা যখন চলছে দুই ডক্টরেট এবং একজন বৌদ্ধপণ্ডিতের মধ্যে, তখন, কিন্তু সেই বাইশ-তেইশ বছরের মেয়েটি এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে একেবারে চত্বরের ওপরেই। কিন্তু সে অন্য সকলের মত বসছে না। দাঁড়িয়েই সব শুনছে অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে, কোমরের দুই পাশে দুই হাত দিয়ে।

ডঃ নাগ উত্তর দিলেন—'সবটা জানা না থাকলেও কিছুটা আরও জানি। শিবভক্ত কবি উমাপতি ঐ শিলালিপির পদ্যসমূহ রচনা করেছিলেন। ওতে উৎকলদেশ, একাম্রক্ষেত্র, বিন্দুসরঃ—এইসব জায়গার বর্ণনা আছে। তারই সঙ্গে এও লেখা আছে যে, বিন্দুসরোবরের তীরে হরির নিমিত্ত নির্মিত প্রাসাদ অর্থাৎ মন্দিরে কৃষ্ণ বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি বিরাজিত! সুতরাং এই শিলালিপিকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করলে, আমাদের মেনে নিতেই হবে যে, অনন্তবাসুদেবের মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন চন্দ্রিকাদেবীই।'

'কিন্তু আপনার এ সিদ্ধান্ত যে ত্রুটীহীন একথা মেনে নিতে সকলে যদি রাজী না হয়

ডঃ নাগ?' এতক্ষণের নীরব শ্রোতা-যুবতীর এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে সকলেই যেন হকচকিয়ে গেল্ প্রথমটায় কিছুটা। যেমন ভদ্র ইংরেজী, তেমনি অবিকৃত উচ্চারণ। ডঃ নাগ দৃষ্টি ফিরিয়ে তার দিকে তাকাতেই সে আবার বলল—ঐ শিলালিপি থেকে আমরা কেবল এইটুকুই জানতে পারি যে, দ্বিতীয় অনঙ্গভীমদেব কন্যা চন্দ্রিকাদেবী ভুবনেশ্বরে একটা বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করিয়ে ছিলেন। কিন্তু সেটা যে অনন্তবাসুদেবের মন্দির কিংবা অন্য কোন বিষ্ণু মন্দির তার উল্লেখ কিন্তু ঐ প্রস্তর লিপির কোথাও নেই।'

'কিন্তু সেই শিলালিপিতে কৃষ্ণ-বলরাম এবং সুভদ্রার মূর্তির কথা উল্লেখ আছে।' ডঃ বড়ুয়া ডঃ নাগের পক্ষ হয়ে যুক্তি দেখালেন।

'ঐরকম তিনটি মূর্তি তো আমরা এই ভুবনেশ্বরেরই লিঙ্গরাজ মন্দিরের দক্ষিণ দিকের ঐ 'অনন্তেশ্বর' মন্দিরেও দেখতে পাই, তাই নয় কি? অনন্তবাসুদেবের মন্দিরের ঐ ত্রিমূর্তির মধ্যে বাসুদেব বলে যে মূর্তিটি দেখিয়ে থাকেন এখান কার পাণ্ডা এবং গাইডরা, আমি যদি বলি ওটি বাসুদেবের মূর্তিই নয়, তাহলে সেটা কি খুবই ধৃষ্টতা হবে, ডঃ নাগ?'

কথা বলতে বলতে যুবতী আরও এগিয়ে এসে এবার আসন গ্রহণ করলো চত্বরের এক প্রান্তে।

'বলছে কি মেয়েটা ডঃ বড়ুয়া? অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে বাসুদেবের মূর্তি নাকি বাসুদেবেরই মূর্তি নয়।' স্বভাবতঃ একটু অসহিষ্ণু রেবতজী শ্লেষের সুরেই বললেন, 'আমরা কোনো অসুস্থ মস্তিষ্কার সঙ্গে বাক্ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছি না তো বড়ুয়া সাহেব?'

'না, সে ভয় নেই মিঃ—' মেয়েটি একটু থামল। সিংহলীর নামটি তার জানা নেই। কলকাতার মেয়ে, ডঃ নাগকে সে দেখেছে নানা অনুষ্ঠানে। ড. বড়ুয়ার মুখখানিও অপরিচিত নয়। কিন্তু বিরলকেশ মোটা ঠোঁট, ভোঁতা নাক এই হলদে আলখাল্লা পরা মেদবহুল ভদ্রলোককে ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও দেখে নি সে। সিংহলী তাড়াতাড়ি নিজের পরিচয় প্রদান করলেন—আমি রেভারেণ্ড জি বি রেবত, শ্রীলঙ্কার একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত।'

অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে আপনার পরিচয় জানার সুযোগ দেবার জন্যে। হ্যাঁ, যেকথা বলতে যাচ্ছিলাম। আপনার আশংকার কারণ নেই রেভা রেণ্ড্র আমি প্রকৃতিস্থ অবস্থাতেই সব কথা বলছি; আমি খুব জোরের সঙ্গেই বলছি অনন্তবাসুদেবের মন্দিরে বাসুদেবের মূর্তি বলা হচ্ছে যাকে, সেটা বাসুদেব বিগ্রহই নয়।'

তবে ওটা কিসের বিগ্রহ বলে আপনার মনে হয় মিস্.....রেভারেণ্ড যেন কোন উন্মাদ বা বাতুলের সঙ্গে কথা বলছেন—এমন সুর ওঁর কণ্ঠে। হাসতে হাসতেই জবাব দিল মেয়েটি—'না, না, আমাকে মিসটিস বলার দরকার নেই। আমি শুধুই রোহিনী।

যদিও কলেজের খাতায় নাম ছিল রোহিনী থাপা।' এই বলে, ডঃ নাগের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে পুনশ্চ বলল, 'স্যার আপনার পাণ্ডিত্যের কাছে আমি সামান্য উই পোকাও নই, তা জানি। তবু অনুরোধ করবো, অনন্তবাসুদেব মন্দিরের বাসুদেব মূর্তিটি একবার ভাল করে দেখবেন দয়া করে। আমার দেখা আর আপনার দেখায় আকাশপাতাল তফাৎ হবে নিশ্চয়ই।'

'ওসব আগড়ম বাগড়ম ছেড়ে, আসল কথাটা বলে ফেললে ভাল হয় না? ওটা বাসুদেবের মূর্তি নয় তো কার মূর্তি?' রেবতজীর প্রশ্নে অধীরতার খোঁচা। 'ঐ বিগ্রহটি বাসুদেব বিগ্রহ নয়, অধোক্ষজ বিগ্রহ। অবশ্য একথা আমি বলছি হরিভক্তি বিলাস এবং চৈতন্যচরিতামৃত উদ্ধৃত সিদ্ধার্থ-সংহিতা গ্রন্থের প্রমাণ অনুযায়ী।' মেয়েটী বলল।

ড. নাগ বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন এবার, তাঁর কথার সুরেই তা বোঝা গেল। তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন—'তাই না কি, মা? হরিভক্তি বিলাস আর চৈতন্যচরিতামৃতে বাসুদেব বিগ্রহ সম্পর্কে কিছু পেয়েছো বুঝি তুমি?' 'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার। শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামী সম্পাদিত হরিভক্তি বিলাসের ৫।২৭৭, ২৭৯ এবং ২৮৯ শ্লোকে বলা হয়েছে—'বাসুদেবো গদা শঙ্খ-চক্র-পদ্ম ধরো মতঃ'; পদ্মং কৌমোদকীং শঙ্খং চক্রং ধত্তেই প্যধোক্ষজ' এবং এতাশ্চ মূর্তয়ো জ্ঞেয়া দক্ষিণাধঃকর ক্রমাৎ'। ঐ হরিবিলাস গ্রন্থেরই ৫/২৮৯ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দিগ্‌দর্শিনী' টীকা বলছে 'দক্ষিণে যোহধ স্থিতকর স্তৎক্রমাদিত্যে বমাদৌ অধস্তনো দক্ষিণকরঃ পশ্চা-দূর্ধ্ব দক্ষিণ করঃ, ততো বামোর্ধ্ব করঃ, ততো বামার্ধ্ব করঃ, ততো বামাধস্তন কর ইতি ক্রমঃ'। আবার ঐ হরিভক্তি বিলাসের মতই 'সিদ্ধার্থসংহিতা' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছে চৈতন্য চরিতামৃতও। তাতে বলা হয়েছে—'বাসুদেব গদাশঙ্খ-চক্রপদ্মধর।' আর অধোক্ষজ পদ্মদাশঙ্খচক্রধর'। চৈতন্য চরিতা মৃত, মধ্যলীলা, ২০।২২৪, ২৩৬) এখন আপনাদের কাছে আমার সবিনয় অনুরোধ, স্যার একবার ভাল ভাবে লক্ষ্য করে দেখুন অনন্ত বাসুদেব-মন্দিরের ঐ অপরূপ বিগ্রহটিকে যেটিকে বলা হচ্ছে বাসুদেব বিগ্রহ।' ডঃ বড়ুয়া এবং ডঃ নাগ উভয়ে একযোগে বলে উঠলেন, Very Interesting। মূর্তিটিকে নিশ্চয় দেখতে হবে আর একবার ভাল করে।

'আরও দুইটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, স্যার।' রোহিনী আবেদন জানালো।

'বেশ তো, বলো না!' ডঃ নাগের কৌতূহল মিশ্রিত সম্মতি।

'একাম্রচন্দ্রিক, কপিলসংহিতা, স্বর্ণাদ্রিমহোদয়, একাম্র পুরাণ—এইসব উপপুরাণে অনন্তবাসুদেবের কথা আমরা, পাচ্ছি, একথা ঠিক। কিন্তু, কেন ব্রহ্মপুরাণের মত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের একাম্রক্ষেত্র সম্পর্কিত একচল্লিশতম অধ্যায়ে (বঙ্গবাসী সংস্করণ)

বিন্দুসরোবর (৪১।৫১-৫৪), ভাস্করেশ্বর লিঙ্গ (৪১।৭৬), কপিল তীর্থ (৪১।৯১) প্রভৃতির কথা থাকলেও, অনন্ত বাসুদেবের কোন উল্লেখই নেই?

ব্রহ্মপুরাণের একোনষষ্ঠিতম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে—অনন্ত খ্যং বাসুদেবং দৃষ্টা ভক্ত্যা প্রণমা চ বলা হয়েছে বটে কিন্তু ঐ অনন্তবাসুদেব একাম্রক্ষে বা ভুবনেশ্বরেই যে অবস্থিত একথা একবারও তো বলা হয় নি! উপরন্তু ঐ গ্রন্থেরই ১৭৬ তম অধ্যায়ে অনন্ত বাসুদেবের প্রাচীন ইতিহাস আর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যে গুহ্য বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে তাতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, অনন্তবাসুদেবের শ্রীমূর্তিটি সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়ে বর্তমানে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে (পুরীতে) বিরাজ করছেন (ব্রহ্মপুরাণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৭৬।৫৪-৫৬)।'

মুহূর্তের বিরতির পর মেয়েটি পুনরায় সবাক হ'ল, 'দ্বিতীয় যে ব্যাপারটির প্রতি আপনাদের মত জগদ্বরেণ্য সত্যানুসন্ধানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি আমি সেটা হচ্ছে এই যে, বৃন্দাবন দাস রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতে (অন্ত্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়) শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল গমনের যে বর্ণনা আছে, তা থেকে আমরা জানতে পারি চৈতন্যদেব বিন্দুসরোবরে স্নানান্তে ভুবনেশ্বর মহাদেবের অভিষেক দর্শন করে লিঙ্গ রাজের সামে নৃত্য ও কীর্ত্তন করলেন, এবং তারপর ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে ভুবনেশ্বরের আরও বহু শিবলিঙ্গ এবং দেবালয় দর্শন করলেন ঘুরে ঘুরে। কিন্তু ভুবনেশ্বরের সব দেবালয় দর্শন করলেও অনন্তবাসুদেব মন্দিরের কোন উল্লেখই নেই কেন চৈতন্য ভাগবতের বর্ণনায়? এটা কি একটা বিশেষ লক্ষ্যণীয় ব্যাপার নয়?

'কিন্তু এখন তবে আরও একটা প্রশ্ন আমি তুলছি ডঃ নাগ। অনন্তবাসুদেব মন্দিরের পশ্চিম দিকের প্রাচীরগাত্রে ভট্টভবদেবের প্রশান্তর একটি শিলালিপি আমি দেখেছি। এক অধ্যাপক আমায় জানালেন, ভট্টভবদেবই নাকি অনন্তবাসুদেব মন্দির তৈরী করিয়েছিলেন এবং তার উল্লেখও নাকি আছে ঐ শিলালিপিতেই। তাহলে আপনি যে চন্দ্রিকাদেবীর কথা বলছিলেন—'

ডঃ নাগ কিছু বলার পূর্ব্বেই রোহিনী বলে উঠল—'আজ্ঞে হ্যাঁ ঐ শিলালিপিটাই এতদিন অনেক ঐতিহাসিকের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি করে আসছিল। কিন্তু ভট্টভবদেবের প্রশস্তিতে ঐ শিলালিপি কি বলছে, একটু যত্ন নিয়ে তা পড়লেই তো সব প্রশ্নের সমাধান হয়ে যায়। ঐ প্রশস্তিতে বলা হয়েছে, ভট্টভবদেব একটি মন্দির নির্মাণ করিয়ে, ঐ মন্দিরের গর্ভগৃহে শ্রীনারায়ণ, শ্রীঅনন্ত এবং শ্রীনৃসিংহদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিন্তু অনন্তবাসুদেবের মন্দিরে নৃসিংহ কোথায়? নৃসিংহদেবের পরিবর্তে যে মূর্তিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি—পাণ্ডারা বলেন, সেটি হচ্ছেন সুভদ্রাদেবী। সুতরাং প্রশস্তি লিপি বর্ণিত তিনমূর্তি এবং বাসুদেবমন্দিরে দৃষ্ট ত্রিমূর্তি যে এক নয়, সেটুকু বুঝতে তো কষ্ট হওয়া উচিৎ নয় কারও। আর, কেবল এই পার্থক্যই নয়। বিশেষ লক্ষ্যণীয় আরও

আছে ঐ শিলালিপিতে। প্রশস্তিতে উৎকলের কোন স্থানের নামও উল্লেখ করা হয়নি। উল্লেখ করা হয় নি। ভট্টভবদেব মন্দিরটি কোথায় প্রতিষ্ঠা করলেন, সে জায়গার নামও। অতএব, ভট্টভবদেব যে ভুবনেশ্বরেই তাঁর মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন, এমন প্রমাণও নেই ঐ শিলালিপিতে।' 'তাহলে ঐ শিলালিপিটা মন্দিরের গায়ে এলো কোথা থেকে? আকাশ থেকে? মুখবিকৃত করে, নিজের প্রশ্নটি ছুঁড়ে মারলেন রেবতজী এবার' মেয়েটির দিকে। 'আজ্ঞে না, কলকাতা থেকে।' দুষ্ট হাসি ঠোঁটে নিয়ে উত্তর দিল রোহিনী।

ভালোরকম রুষ্ট হয়ে চিৎকার করে উঠলেন সিংহলী পণ্ডিত—'তার মানে? উৎকলের ভুবনেশ্বরে অনন্তবাসুদেব মন্দির প্রাচীরে যে শিলালিপি গাঁথা আছে তা এসেছে কলকাতা থেকে? আমার সঙ্গে ঠাট্টা হচ্ছে? জানো—আমি রেভারেণ্ড—'

'আজ্ঞে তাতো জানিই। জানি আপনি রেভারেণ্ড জি, বি, রেবত এবং সেই কারণেই আপনি আমার শ্রদ্ধেয়ও বটে। কিন্তু একথাও তো জানি রেভারেণ্ড যে, ঐ শিলালিপিটি যখন অনন্তবাসুদেবের মন্দিরগাত্রে গ্রথিত হয়, তখন সেটি এসেছিল কলকাতা থেকেই ডঃ বড়ুয়া সংশয়প্রকাশ করলেন তা কেমন করে হবে? ভুবনেশ্বরে অবস্থিত এই প্রাচীন মন্দিরের শিলালিপি কলকাতা থেকে আসতে যাবে কেন, তাতো বুঝতে পারছি নে!'

দয়া করে আমায় দুই মিনিট সময় দিন স্যার, আমি সব বুঝিয়ে বলছি।' রোহিনী বলে চলল ওই যে শ্রদ্ধেয় ডঃ নাগ একটু আগে নাম করলেন Major Charles Stewart-এর যিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেনাবিভাগের একজন যে কেবল উচ্চপদস্থ কর্মচারীই ছিলেন, তা নয়, প্রত্নতত্ত্ববিদ হিসেবেও তাঁর নামডাক কম ছিল না। তিনিই, ডঃ নাগ ঠিকই বলেছেন, ভুবনেশ্বরের বেশ কয়েকটি মন্দিরের গা থেকে অনেক গুলি প্রাচীন শিলালিপি সযত্নে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ১৯১০ খৃষ্টাব্দে। তারপর ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে, বঙ্গদেশের এসিয়াটিক সোসাইটীর তখনকার গ্রন্থাগারিক Lieutenant Markhaun Kittoe যখন ভুবনেশ্বরে আসেন, তখন এখানকার স্থানীয় অধিবাসী এবং পাণ্ডাবৃন্দ একযোগে তাঁকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন যে, ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলি থেকে যে সব শিলালিপি মেজর ষ্টুয়ার্ট বেপরোয়ার মত অবৈধভাবে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেগুলি যেন অনতিবিলম্বে ভুবনেশ্বরেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ওড়িশাবাসীদের এই অত্যন্ত ন্যায্য আবেদনকে তুচ্ছ করতে পারেন নি লেফটেন্যান্ট কিটো। এশিয়াটিকে সোসাইটীর পরিচালকবর্গকে অনেক বুঝিয়ে, শেষে ১৮৩৭-এ তিনি কলকাতা থেকে দুইটী শিলালিপি ভুবনেশ্বরে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই শিলালিপি দুইটীর একটি হচ্ছে এই ভট্টদেবের প্রশস্তি, অপরটি ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরের শিলালিপি (Journal of the Asiatic Society of Bengal—Edited by James Prinsep. F. R. S., Vol. VII, Part I June, 1938 pp. 557-

562) সেই দুইটি শিলালিপিই তখন কিন্তু সংলগ্ন করা হয় অনন্তবাসুদেব মন্দিরের পশ্চিমদিকের ঐ প্রাচীরের গায়ে। সেই সময় থেকে আজ অবধি ভট্টাভবদেবের শিলালিপিটি ঐ স্থানেই আছে।'

ব্রহ্মেশ্বরের শিলালিপিটা গেল কোথায়? তার কি ডানা, গজালো?' মোটা দুটো ঠোঁট নেড়ে গজ গজ করলেন রেবত।

'ঠিক বলতে পারবো না, রেভারেণ্ড ঐ শিলালিপিটা কেমন করে উধাও হ'ল অনন্তবাসুদেবের মন্দির থেকে, অথবা কোথায় গেল। তবে, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর Antiquities of Orisaa. Vol. II গ্রন্থে লিখেছেন তিনি ভট্টভবদেবের এবং ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরের দুটি শিলালিপিই দেখতে পেয়েছিলেন অনন্তবাসুদেব মন্দিরের ঐ প্রাচীর গাত্রে (R.L. Mitra Antiquities of Orissa, Vol. II, 1980, P-P 87-89)।

'কিন্তু আমার যেন মনে পড়ছে—এবার আমি ঐ ভট্টভবদেবের শিলালিপি ছাড়াও, আরো একটি শিলালিপি দেখেছি অনন্তবাসুদেব মন্দিরের ঐ প্রাচীরের গায়েই—ডঃ নাগ বললেন।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, স্যার। আর একটি শিলালিপিও ওখানে আছে বটে। তবে সেটা ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরের শিলালিপি নয়। স্বপ্নেশ্বর দেবের মেঘেশ্বর—মন্দিরের শিলালিপি (James Princep in Journal of Asiatic Society of Bengal, Vol,-VI, 1837 PP, 278-88; Kielhorn in'Epigraphia Indica Vol. VI 1900-9001 PP. 198-203) যাইহোক এইসব কারণেই আমার মনে হয়, স্যার, অনন্তবাসুদেব মন্দিরের নির্ম্মাণ কর্ত্রী হিসাবে চন্দ্রিকাদেবীর নাম ঘোষণা করার আগে অনিসন্ধিৎসুগবেষকের উচিৎ হবে? এ মন্দিরের ইতিবৃত্ত নিয়ে আরো ভালভাবে নেড়ে চেড়ে দেখা।'

—o—